জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

অনুবাদ - মুহিউদ্দীন খান

জীবন-সায়াহ্নে মানবতার রূপ

রচনা
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

অনুবাদ
মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০, শাখা ঃ ৫৫/বি পুরানা পল্টন (দোতলা), ঢাকা-১০০

জীবন-সায়াহ্নে মানবতার রূপ

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

প্রকাশক

মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে

মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ

রমযান ১৩৭৮ হিজরী

৫ই এপ্রিল ১৯৫৭ ইংরেজী

২৫তম সংস্করণ

জমাদিউস সানী-১৪২৯

জুন- ২০০৮ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ

বিশ্বাস কম্পিউটার্স

৩৮/২-খ, বাংলাবাজার

ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মদীনা প্রিন্টার্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৯৫ টাকা মাত্র

ISBN - 984-8367-93-4

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَّيَبْقٰى
وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

"এই বিশ্ব-চরাচরে যাহা কিছু আছে
সবকিছুই ধ্বংসশীল– একমাত্র তোমার
মহামহিমান্বিত প্রভুর অস্তিত্বই
চিরস্থায়ী।"– (আল-কোরআন)

মৃত্যুশয্যায়ও আমার স্নেহময়ী আম্মার তাকিদ ছিল, যেন নিজেকে মানুষরূপে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করি। আম্মার সেই তাকিদই আমাকে আজকের এই সাধনা-পথে প্রেরণা দিয়াছে। আজ নগণ্য এই কর্মপ্রচেষ্টার সওগাতটুকু তাঁহারই জান্নাতী রূহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি।

–অনুবাদক

রেহলাতে রসূল (সা.)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ-وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِى دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا-فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"যখন আল্লাহর সাহায্য আসিল এবং বিজয়; এবং তুমি দেখিলে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করিতেছে। এখন তুমি আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ কর এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তিনিই তওবা কবুল করেন।"

বিদায় হজ্বের প্রস্তুতি

উপরোক্ত সূরা নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানবতার নবী হযরত রসূলে খোদা (সা.) অনুমান করিতে পারিলেন, শেষ বিদায়ের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইতিপূর্বে তিনি আল্লাহর ঘর পবিত্র করার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন, আগামীতে আর কোন মোশরেক আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কোন ব্যক্তিকে উলঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর ঘর তোয়াফ করিতেও দেওয়া হইবে না।

হযরত রসূলে খোদা (সা.) হিজরতের পর আর হজ্ব পালন করার সুযোগ পান নাই। হিজরী দশ সনে আগ্রহ জন্মিয়াছিল, আখেরাতের পথে রওনা হওয়ার পূর্বে সমস্ত উম্মতের সহিত মিলিত হইয়া শেষবারের মত হজ্ব করিয়া নিবেন। বিপুলভাবে আয়োজন করা হইল যেন কোন ভক্তই এই পবিত্র সফরে সাহচর্যের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত না হয়। হযরত আলী (রা.)কে ইয়ামান হইতে ডাকিয়া আনা হইল। আশেপাশের সকল জনপদে লোক প্রেরণ করিয়া এই পবিত্র ইরাদার কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল। উম্মুল মোমেনীনদের সকলকে সঙ্গে চলার সুখবর দেওয়া হইল। হযরত ফাতেমা (রা.)ও প্রস্তুতির নির্দেশ পাইলেন।

২৫শে জিলক্বদ মসজিদে নববীতে জুমার নামায হইল। এই জামাতেই ২৬ তারিখ রওয়ানা হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। ২৬ তারিখের সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়তুল্লার পথে যাত্রার খুশীতে রসূলে খোদার (সা.) পবিত্র চেহারা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গোসল শেষ করিয়া নূতন পোশাক পরিধান করিলেন এবং জোহরের নামায পড়ার পর আল্লাহর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে মদীনা হইতে বাহির হইলেন। হাজার হাজার

আত্মত্যাগী উম্মত প্রিয়নবী (সা.)এর সঙ্গে চলিলেন। এই পবিত্র কাফেলা মদীনা হইতে ছয় মাইল দূরে যুলহোলায়ফা নামক স্থানে আসিয়া প্রথম মঞ্জিল করিল।

পরদিন সকালে আল্লাহর রসূল (সা.) পুনরায় গোসল করিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) নিজ হাতে তাঁহার পবিত্র বদনে আতর মাখিয়া দিলেন। দ্বিতীয় বার রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আর একবার আল্লাহর প্রিয় নবী আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইলেন এবং নেহায়েত কাতরভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর সোয়ারীর উপর আরোহণ করতঃ এহরাম বাঁধিলেন এবং আল্লাহর মহিমা কীর্তনসূচক 'লাব্বাইক' তারানা শুরু করিলেন ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ .

পবিত্র মুখের মহিমা গানের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার খোদা-পুরস্তের মুখে উহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। আকাশের মহাশূন্য আল্লাহর মহিমা কীর্তনে ভরিয়া উঠিল। পাহাড়-প্রান্তর তওহীদের তারানায় মুখরিত হইয়া উঠিল। হযরত জাবের (রা.) বলেন, হুজুর সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অগ্রে-পশ্চাতে, দক্ষিণে-বামে, যে পর্যন্ত দৃষ্টি যাইত, কেবলমাত্র মানুষই দেখা যাইতেছিল। যখন হযরতের উষ্ট্র কোন উচ্চ টিলার উপর আরোহরণ করিত, তখন তিনি তিন বার উচ্চ কণ্ঠে তকবীর ধ্বনি করিতেন। পবিত্র কণ্ঠের তকবীরের সঙ্গে সঙ্গে অগণিত কণ্ঠে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়া এই পবিত্র কাফেলার মধ্যে যেন আল্লাহর মহিমা কীর্তনের প্লাবন বহাইয়া যাইত। দীর্ঘ নয় দিন এই পবিত্র কাফেলার যাত্রা চলিল।

জিলহজ্ব মাসের চতুর্থ দিবসের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মক্কার ঘর-বাড়ী দেখা যাইতেছিল। হাশেমী খান্দানের ছোট ছোট শিশুরা তাহাদের মহান স্বজনের আগমনবার্তা শুনিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। নিষ্পাপ শিশুরা যেন রসূলে খোদার পবিত্র মুখের মধুর হাসির সহিত মিলাইয়া যাওয়ার জন্য আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে আল্লাহর রসূলও যেন স্নেহ-প্রীতির এক জীবন্ত তসবীর হইয়া উঠিতেছিলেন। কচি শিশুদের দেখিবামাত্র বাহন হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাহাকেও বা উটের অগ্রে এবং কাহাকেও বা পশ্চাতে বসাইয়া লইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই পবিত্র খানায়ে কাবা চোখে পড়িল। কাবার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর রসূল বলিতে লাগিলেন, "আয় আল্লাহ, কাবার মর্যাদা আরও বাড়াইয়া দাও।"

সর্বপ্রথম তিনি কাবা শরীফ তোয়াফ করিলেন। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমে গমন করতঃ শোকরানা আদায় করিলেন। এই সময় পবিত্র মুখে আল্লাহর কালাম- وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى এবং মাকামে ইব্রাহীমকে সেজদার স্থান নির্দিষ্ট কর, — উচ্চারিত হইতেছিল। কাবা যিয়ারতের পর সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। সাফা প্রান্ত হইতে কাবা গৃহ চোখে পড়িলে পবিত্র মুখে জলদগম্ভীর স্বরে তকবীর ও তওহীদের কলেমা উচ্চারিত হইতে লাগিল—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ .

তরজমা— "আল্লাহ, এবং কেবল আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। কেহ তাঁহার শরীক নাই। সমস্ত রাজ্য তাঁহার, প্রশংসা তাঁহারই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি সকল কিছুর উপরই সর্বশক্তিমান। তিনি ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই। তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন— তিনি তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন— এবং তিনি একাই সকল আক্রমণকারীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন।"

আল্লাহর রসূল (সা.) অতঃপর ৮ই জিলহজ্ব মিনাতে অবস্থান করিলেন। ৯ই জিলহজ্ব ফজরের নামায শেষ করতঃ তথা হইতে রওয়ানা হইয়া ওয়াদিয়ে নামেরা নামক স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। দিনের শেষভাগে আসিয়া আরাফাতের ময়দানে পদার্পণ করিলেন। আরাফাতে তখন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার খোদাপুরস্ত মানব সন্তানের তকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতেছিল। আল্লাহর রসূল (সা.) একটি উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রভাতী সূর্যের ন্যায় আরাফাতের পর্বত চূড়ায় উদিত হইলেন। পর্বত প্রান্তরে হযরত বেলাল, সমস্ত আস্‌হাবে ছুফফা, আশারা-মোবাশশারা ও সহস্র সহস্র উম্মত অবস্থান করিতেছিলেন। তখনকার দৃশ্য দেখিয়া মনে হইতেছিল, উম্মতের অভিভাবক যেন তাঁহার উম্মতকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন এবং প্রকৃত মোহাফেজ আল্লাহর হাতে তাঁহার দায়িত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন।

শেষ খুৎবা

এই উম্মতের জন্য আল্লাহর রসূলের শেষ যে অশ্রুবিন্দু প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা বিদায় হজ্বের খুৎবায় পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই সময় রাজ্য ও সম্পদ প্লাবনের মত

মুসলমানদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। রসূলুল্লাহর (সা.) ভাবনা ছিল, সম্পদের এই প্রাচুর্য তাঁহার অবর্তমানে উম্মতের ঐক্যবন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে। এই জন্য উম্মতের ঐক্যবন্ধন সম্পর্কেই আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। নবীসুলভ সবটুকু আবেগ যেন ইহার উপরই ব্যয় করিলেন। প্রথমতঃ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ঐক্য কায়েম রাখার আবেদন জানাইলেন। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, "দুর্বল শ্রেণীকে অভিযোগ করার সুযোগ দিও না, যেন ইসলামের এই প্রাচীরে কোন প্রকার ফাটল সৃষ্টি হইতে না পারে।" তৎপর মোনাফেকী তথা পরস্পরের মন কষাকষির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতঃ তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকার বাস্তব পথ নির্দেশ করিলেন। তারপর উম্মতের ঐক্য বন্ধনের মূল ভিত্তিবস্তু কি, তাহাও ভালভাবে বলিয়া দিলেন। শেষ অসিয়ত করিলেন— এই বাণী এবং শিক্ষা যেন পরবর্তী যুগের মানুষের নিকট প্রচার করার সুব্যবস্থা করা হয়। খুৎবা শেষ করিয়া আল্লাহর রসূল (সা.) তাঁহার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপস্থিত লোকজনের নিকট সাক্ষ্য গ্রহণ করতঃ আল্লাহকে এমনভাবে ডাকিতে শুরু করিলেন যে, উপস্থিত সকলের অন্তর গলিয়া গেল। চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর বন্যা বহিল, দেহের পিঞ্জরে আত্মা যেন ছটফট করিয়া শান্তির জন্য কাতর স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল।

আল্লাহর মহিমা কীর্তনের পর খুৎবার সর্বপ্রথম হৃদয়স্পর্শী কথা ছিল ঃ

"লোকসকল, আমার ধারণা, আজকের পর আমি এবং তোমরা এইরূপ জামায়াতে আর কখনও একত্রিত হইব না।"

এতটুকু শুনিয়াই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অতঃপর যাঁহারা এই নিদারুণ বাণী শুনিলেন, তাঁহাদের সকলের অন্তরই কাঁপিয়া উঠিল। এইবার আসল কথা শুরু করিলেন–

"লোকসকল! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মানসম্ভ্রম পরস্পরের নিকট ততটুকুই পবিত্র, যতটুকু পবিত্র আজকের এই (জুমার) দিন, আজকের এই (জিলহজ্জ) মাস এবং এই (মক্কা) শহর!"

আর একটু জোর দিয়া তিনি বলিলেন,

"লোকসকল, শেষ পর্যন্ত একদিন না একদিন তোমাদিগকে আল্লাহ সর্বশক্তিমানের দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে তোমাদের কৃতকর্মের হিসাব করা হইবে। সাবধান! আমার পর ভ্রান্ত হইয়া একে অপরের মস্তক কর্তন করিতে শুরু করিও না!"

রসূলে পাকের (সা.) বেদনা-বিধুর অসিয়তের প্রতিটি কথা তাঁহার পবিত্র জবান হইতে বাহির হইয়া শ্রোতাদের অন্তর ছেদন করিয়া গেল। অতঃপর তিনি উম্মতের মজবুত

প্রাচীরে ভবিষ্যতে যে ছিদ্রপথ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। অর্থাৎ ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ ভূলিয়া হয়ত সবল কর্তৃক দুর্বল ও অসহায় শ্রেণীর উপর নির্যাতন হইতে পারিত। এদিক লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিলেন—

"লোকসকল, স্ত্রীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় করিও। তোমরা আল্লাহর নামের শপথ করিয়া তাহাদিগকে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছ এবং আল্লাহর নাম লইয়া তাহাদের দেহ নিজেদের জন্য হালাল করিয়াছ। স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার,—তাহারা অপরকে সঙ্গসুখ প্রদান করিতে পারিবে না। যদি তাহারা এইরূপ করে, তবে তাহাদিগকে এমন শাস্তি প্রদান করিতে পার যাহা প্রকাশ না পায়। আর তোমাদের উপর স্ত্রীলোকের অধিকার হইতেছে, তাহাদিগকে তোমরা যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত খাইতে ও পরিতে দিবে।"

"হে লোকসকল, তোমাদের দাস-দাসী! তোমাদের দাস-দাসী!! যাহা নিজে খাইবে তাহাই তাহাদিগকেও খাইতে দিবে। যাহা নিজে পরিধান করিবে, তাহাই তাহাদিগকে পরাইবে।"

আরবে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূল কারণ ছিল দুইটি। ঋণের বিপুল পরিমাণ সুদ আদায়ের পীড়াপীড়ি ও কোন নিহত ব্যক্তির রক্তের প্রতিশোধস্পৃহা। একে অপরের নিকট পুরুষানুক্রমিক সুদের দাবী করিত এবং সেই সূত্রেই ঝগড়া শুরু হইয়া রক্তের দরিয়া প্রবাহিত হইত। একে হয়ত অপরকে হত্যা করিত, আর এই হত্যার প্রতিশোধস্পৃহা বংশ পরম্পরায় বিস্তৃতি লাভ করিত। আল্লাহর রসূল (সা.) এই দুইটি ঝগড়ার সূত্রেরই অবসান ঘোষণা করিলেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলিলেন ঃ

"লোকসকল, আজ আমি বর্বর যুগের সকল প্রথা পদদলিত করিতেছি। গত যুগের সকল হত্যা সম্পর্কিত ঝগড়ার সমাপ্তি ঘোষণা করিতেছি। সর্বপ্রথম আমি আমার স্বগোত্রীয় নিহত ব্যক্তি রবিয়া ইবনে হারেস,– যাহাকে হোযায়ল গোত্র হত্যা করিয়াছিল, তাহা ক্ষমা করিয়া দিতেছি! জাহেলিয়াত যুগের সকল সুদের দাবী বাতিল ঘোষণা করিতেছি এবং সর্বপ্রথম আমার সগোত্রের হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেবের প্রাপ্য সকল সুদের দাবী পরিত্যাগ করিতেছি।

সুদ ও রক্তের দাবী সম্পর্কিত প্রথার অবসান ঘোষণা করিয়া পারস্পরিক সম্পর্কের দুর্বল আর একটি দিকের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং উত্তরাধিকার, বংশ পরিচয়, জামানত প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ঝগড়ার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

স্বয়ং আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারীদের কাহারও সম্পর্কে কোন প্রকার অসিয়ত করার আর কোন প্রয়োজন নাই। সন্তান যাহার ঔরস হইতে জন্ম লাভ করে, তাহার অধিকার তাহাকেই দিতে হইবে। ব্যভিচারীর জন্য রহিয়াছে প্রস্তরের শাস্তি। আর তাহার জওয়াবদিহি করিতে হইবে আল্লাহর নিকট। যে সন্তান পিতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি নিজের বংশ পরিচয় সংযুক্ত করে এবং যে গোলাম স্বীয় মনিব ব্যতীত অন্য লোকের সহিত মালিকানার পরিচয় দেয়, তাহাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। স্ত্রীরা যেন স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর সম্পদ ব্যয় না করে। ঋণ সর্বাবস্থায়ই পরিশোধ্য। ধার করা বস্তু ফেরত দিতে হইবে। উপহারের প্রতিদান দেওয়া উচিত। জরিমানার জন্য জামিনদার দায়ী হইবে।"

আরববাসীদের ঝগড়া-বিবাদ ও তাহার সকল উৎসমূল চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আল্লাহর রসূল (সা.) শতাব্দী পর আরব-অনারব, গোরা-কালো, শ্বেত, কৃষ্ণ প্রভৃতি যে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষের সম্ভাবনা ছিল, সেই দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন ঃ

"লোকসকল, তোমাদের সকলের খোদা এক, তোমাদের সকলের আদি পিতাও এক ব্যক্তি। সুতরাং কোন আরবের অনারবের উপর; কোন কৃষ্ণের সাদার উপর, অথবা কোন সাদার কৃষ্ণের উপর কোন প্রকার জন্মগত প্রাধান্য নাই। সম্মানী সেই ব্যক্তি, যিনি খোদাভীরু। প্রত্যেক মুসলিম একে অন্যের ভাই। আর বিশ্ব-মুসলিম মিলিয়া এক জাতি।"

অতঃপর ইসলামী ঐক্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন— "লোকসকল, আমি তোমাদের জন্য এমন একটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি, যদি তাহা তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখ, তবে তোমরা কখনও বিভ্রান্ত হইবে না। ঐ বস্তুটি হইতেছে আল্লাহর কোরআন।"

উম্মতের ভবিষ্যত ঐক্য বন্ধনের বাস্তব কর্মপন্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন—

"শোন, আমার পর আর কোন নবী আসিবেন না। না অন্য কোন নূতন উম্মতের সৃষ্টি হইবে। সুতরাং তোমরা সকলে মিলিয়া আল্লাহর এবাদত করিও। পাঁচ ওয়াক্তের নামায সম্পর্কে দৃঢ় থাকিও। রমযানের রোযা রাখিও। হৃষ্টচিত্তে সম্পদের যাকাত আদায় করিও। আল্লাহর ঘরে হজ্ব করিও। তোমাদের শাসকর্তাদের নির্দেশ মান্য করিও এবং আল্লাহর বেহেশতে স্থান গ্রহণ করিও।" সর্বশেষ বলিলেন—

اَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ

– "তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। তখন তোমরা কি বলিবে?"

প্রত্যুত্তরে জনতার মধ্য হইতে আবেগপূর্ণ আওয়াজ উঠিল : انك قد بلغت হে আল্লাহর রসূল, আপনি সকল হুকুমই পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

وادیت এবং আপনি রেসালাতের সকল দায়িত্ব পূর্ণ করিয়াছেন।

ونصحت—এবং হে আল্লাহর রসূল, আপনি ভাল-মন্দ সব পৃথক করিয়া দিয়াছেন।

এই সময় হযরতের পবিত্র অঙ্গুলি আকাশের দিকে উত্থিত হইল। একবার অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠাইতেছিলেন এবং অন্যবার জনতার দিকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছিলেন :

اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ – اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ– اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ

হে আল্লাহ, মানুষের সাক্ষ্য শোন!

হে আল্লাহ, তোমার সৃষ্ট জীবদের স্বীকৃতি শোন!

হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক!!

অতঃপর বলিলেন : "যাহারা উপস্থিত আছে তাহারা যেন যাহারা উপস্থিত নাই তাহাদের নিকট আমার এই বাণী পৌঁছাইয়া দেয়। হয়ত বা আজকের উপস্থিত শ্রোতাদের চাইতেও অধিক সংখ্যক লোক এই বাণীর প্রতি অধিকতর আগ্রহী হইবে।"

দ্বীনের পূর্ণতা

আল্লাহর রসূল (সা.) খুৎবা সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত জিবরীল (আ.) দ্বীন ইসলামের পূর্ণতার মুকুট লইয়া আসিলেন। কোরআনের আয়াত নাযিল হইল :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

– "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করিয়া দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং দ্বীন ইসলামের উপর আমার সন্তুষ্টির সীলমোহর দিয়া দিলাম।

সরওয়ারে কায়েনাত আল্লাহর প্রিয় রসূল (সা.) যখন জনতার সম্মুখে দ্বীন ও আল্লাহর নেয়ামতের পূর্ণতার কথা ঘোষণা করেন, তখন তাঁহার নিজের সোয়ারিটির মূল্য এক হাজার টাকার অধিক ছিল না। খুৎবা শেষ হওয়ার পর হযরত বেলাল আজান দিলেন এবং

হুজুর (সা.) জোহর ও আসরের নামায একত্রিত করিয়া আদায় করিলেন। নামাযান্তে তথা হইতে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আল্লাহর দরবারে দো'য়া করিতে লাগিলেন। সূর্যাস্তের একটু পূর্বে রসূলে খোদার (সা.) উট যখন জনতার মধ্য দিয়া পথ কাটিয়া চলিতেছিল, তখন তাঁহার সহিত খাদেম হযরত উসামা একই উটে আরোহী ছিলেন। ভীড়ের চাপে জনতার মধ্যে চাপা অস্বস্তির সৃষ্টি হইতেছিল। এই সময় রসূলে খোদা (সা.) নিজ হাতে উটের লাগাম টানিয়া লোকদিগকে বলিতেছিলেন,—

ওগো, আরামের সহিত

ওগো, শান্তির সহিত

মুজদালাফায় আসিয়া মাগরিবের নামায সমাপ্ত করিলেন এবং বিশ্রামের জন্য সকল বাহনের উট ইত্যাদি ছাড়িয়া দিলেন। এশার নামায শেষ করিয়া আরামের সহিত শুইয়া পড়িলেন। মোহাদ্দেসগণ বর্ণনা করেন, — "সমগ্র জীবনে এই একদিনই আল্লাহর রসূল তাহাজ্জুদের নামায পড়েন নাই।"

১০ই জিলহজ্জ শনিবার দিবস তিনি জামরার দিকে রওয়ানা হইলেন। এই সময় সঙ্গে ছিলেন তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র হযরত ফজল ইবনে আব্বাস (রা.)। তাঁহার উট এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। চারিদিকে জনতার বিপুল ভীড়। জনসাধারণ বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, আর তিনি ধীরে শান্ত স্বরে ঐগুলির জওয়াব দিয়া চলিতেছিলেন! জামরার নিকটে আসিয়া হযরত ফজল কতিপয় কংকর তুলিয়া দিলেন; রসূলে খোদা উহাই নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন : লোকসকল, ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না। তোমাদের পূর্বেকার বহু জাতি এইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পর পর যেন তাঁহার উম্মতের নিকট হইতে আসন্ন বিরহ-ব্যথার বেদনা ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই সময় তিনি বলিতেছিলেন ঃ "এই সময় হজ্বের মাসআলা শিক্ষা করিয়া লও। অতঃপর আর হজ্বের সুযোগ আসিবে কিনা সেই কথা আমি বলিতে পারি না।"

মিনার ময়দান

প্রস্তর নিক্ষেপের পর রসূলে খোদা (সা.) মিনার ময়দানে চলিয়া গেলেন। তিনি একটি উষ্ট্রীর উপর সোয়ার ছিলেন। হযরত বেলালের হাতে ছিল উহার লাগাম। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ একখণ্ড কাপড় উড়াইয়া তাঁহার উপর ছায়া দিতেছিলেন। অগ্রে-পশ্চাতে, দক্ষিণে-বামে মোহাজের, আনসার, কোরায়শ ও অন্যান্য কবিলার অগণিত

লোকের কান্নার দরিয়ার মত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছিল; আর রসূলে খোদার উষ্ট্রটি যেন নূহের কিশতির মত নাজাতের সেতারার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছিল। এমন মনে হইতেছিল যে, প্রকৃতির মহান বাগবান কোরআনের জ্যোতিঃ সিঞ্চন করিয়া সত্য ও নিষ্ঠার যে নূতন দুনিয়া আবাদ করিয়াছিলেন, তাহা এতদিনে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আল্লাহর রসূল এই নতুন দিনের কথা উল্লেখ করিয়াই বলিলেন— "আজকালের বিবর্তন দুনিয়াকে আবারও ঐ বিন্দুতে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, যেখান হইতে দুনিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল।" অতঃপর জিলকদ, জিলহজ্ব, মহররম ও রজব মাসের মর্যাদার কথা উল্লেখ করতঃ জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

মানবতার নবী– আজ কোন্ দিন?

মুসলিম জনতা– আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলই ভাল বলিতে পারেন।

মানবতার নবী– (কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর) আজ কোরবানীর দিন নয় কি?

মুসলিম জনতা– নিঃসন্দেহে আজ কোরবানীর দিন।

মানবতার নবী– ইহা কোন্ মাস?

মুসলিম জনতা– আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলই ভাল বলিতে পারেন।

মানবতার নবী– (সামান্য নীরবতার পর) ইহা কি জিলহজ্ব মাস নয় কি?

মুসলিম জনতা– নিশ্চয়ই জিলহজ্ব মাস।

মানবতার নবী– ইহা কোন্ শহর?

মুসলিম জনতা– আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলই ভাল বলিতে পরেন।

মানবতার নবী– (দীর্ঘ নীরবতার পর) ইহা সম্মানিত শহর নয় কি?

অতঃপর বলিলেন ঃ—

মুসলমানগণ, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান তদ্রূপই পবিত্র, যেরূপ পবিত্র আজকের এই দিন, বর্তমান এই মাস এবং আজকের এই শহর। তোমরা আমার পর ভ্রান্ত হইয়া একে অপরের মস্তক কর্তন করিতে শুরু করিও না। লোকসকল, তোমাদিগকে আল্লাহর দরবারে হাজির হইতে হইবে। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। যদি কেহ অপরাধ করে তবে সে নিজেই সেই অপরাধের জন্য দায়ী হইবে। পুত্রের অপরাধের জন্য পিতার এবং পিতার অপরাধের জন্য পুত্রের কোনই দায়িত্ব নাই। তোমাদের এই শহরে ভবিষ্যতে কখনও শয়তানের পূজা হইবে, এই ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তবে তোমরা অবশ্য ছোট ছোট ব্যাপারে যদি তাহার অনুসরণ করিতে থাক তবে সে আনন্দিত হইবে।

লোকসকল, তওহীদ, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্বই হইতেছে বেহেশতে প্রবেশের উপায়। আমি তোমাদিগকে সত্যবাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি। এখন এখানকার উপস্থিত লোকেরা, যাহারা এখানে উপস্থিত নাই, তাহাদের পর্যন্ত এই বাণী পৌছাইতে থাকিবে।

বক্তৃতা শেষ করিয়া আল্লাহর রসূল (সা.) মিনার ময়দান হইতে কোরবানীর স্থানে তশরিফ আনিলেন। নিজ হাতে ২২টি উট কোরবানী করিলেন এবং হযরত আলীর দ্বারা আরও ৩৭টি কোরবানী করাইলেন। কোরবানীকৃত সবগুলি পশুর গোশত ও চামড়া লোকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। মুণ্ডিত সমস্ত চুল উপস্থিত জনসাধারণ পবিত্র স্মৃতি হিসাবে বন্টন করিয়া নিলেন। সেখান হইতে উঠিয়া খানায়ে কা'বায় চলিয়া গেলেন এবং তোয়াফ করিলেন। যমযমের পানি পান করিলেন এবং মিনার ময়দানে ফিরিয়া আসিলেন। জিলহজ্বের ১২ তারিখ পর্যন্ত মিনার ময়দানে অবস্থান করিলেন। ১৩ জিলহজ্ব শেষ তোয়াফ করিয়া আনসার-মোহাজের সমভিব্যহারে মদীনার পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথিমধ্যে ওয়াদিয়ে খোম নামক স্থানে পৌঁছিয়া সাহাবীগণকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

"লোকসকল, আমিও মানুষ। হইতে পারে শীঘ্রই আল্লাহর ডাক আসিয়া পড়িবে এবং আমাকেও তাহা কবুল করিতে হইবে। আমি তোমাদের জন্য দুইটি দৃঢ় ভিত্তি রাখিয়া যাইতেছি। একটি আল্লাহর কিতাব, যাহাতে হেদায়েত ও আলো রহিয়াছে। উহা দৃঢ়তার সহিত আকর্ষণ কর। দ্বিতীয় ভিত্তিটি হইতেছে আমার আহলে বায়ত বা বংশধরগণ। আমি আমার আহলে বায়ত সম্পর্কে তোমাদিগকে খোদার ভয় পোষণ করিতে উপদেশ দিয়া যাইতেছি।"

এই উপদেশে যেন আল্লাহর রসূলের বংশধর সম্পর্কে তিনি উম্মতকে পথ প্রদর্শন করিতেছিলেন। যেন কোন সাধারণ ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া কেহ রসূলের অতি ছোট বংশধরের সহিতও কোন প্রকার অশোভন আচরণ করিতে উদ্যত না হয়।

মদীনার নিকটবর্তী হইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল-হোলায়ফা নামক স্থানে অবস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিন সহিসালামতে মদীনায় প্রবেশ করেন।

পরপারের প্রস্তুতি

মদীনায় পৌঁছিয়া আল্লাহর রসূল (সা.) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. এই আয়াতের উপর আমল করিতে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার ঔৎসুক্য যেন দিন দিনই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। সকাল সন্ধ্যা কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণে কাটাইয়া দেওয়ার অতৃপ্ত বাসনা যেন আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল।

পবিত্র রমযানে তিনি সবসময়ই দশ দিনের এতেকাফ করিতেন! হিজরী দশ সনে বিশ দিনের এতেকাফ করিলেন। একদিন হযরত ফাতেমা জাহরা (রা.) আগমন করিলে তাঁহাকে বলিলেন, "প্রিয় বৎস, আমার শেষ দিন নিকটবর্তী বলিয়া মনে হইতেছে।"

এই সময় ওহুদের ময়দানের শহীদগণের মর্মান্তিক শাহাদাত এবং বীরত্বব্যঞ্জক আত্মত্যাগের কথা স্মরণ হইলে পর শহীদানের মাজারে গমন করিলেন। নিতান্ত আবেগের সহিত তাঁহাদের জন্য দোয়া করিলেন। পুনরায় জানাজার নামায পড়িলেন। শেষে শহীদদের নিকট হইতে এমনভাবে বিদায় চাহিতে লাগিলেন যেমন কোন স্নেহময় মুরব্বী স্নেহের শিশুদিগকে আদর করিয়া বিদায় নেন। শহীদানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মসজিদে নববীর মিম্বরে উপবেশন করিলেন এবং সাহাবীগণকে উদ্দেশ করিয়া বেদনাবিধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ঃ

"বন্ধুগণ, এখন আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া আখেরাতের মনজিলে চলিয়া যাইতেছি, যেন আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য সাক্ষ্য দিতে পারি। আল্লাহর শপথ, এখান হইতে আমি আমার হাউজ দেখিতে পাইতেছি। যার বিস্তৃতি 'আয়লা' হইতে 'হায়ফা' পর্যন্ত। আমাকে সমগ্র দুনিয়ার ধনভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হইয়াছে। এখন আর আমি এই ভয় করিতেছি যে, তোমরা দুনিয়ায় অত্যধিক লিপ্ত হইয়া না যাও এবং এই জন্য পরস্পর খুনাখুনি শুরু না কর। এমতাবস্থায় তোমরাও তদ্রূপই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে, যদ্রূপ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

কিছুক্ষণ পর পবিত্র অন্তরের মধ্যে হযরত যায়েদ বিন হারেসার স্মরণ আসিল! তাঁহাকে সিরিয়া সীমান্তের আরবগণ শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল। আল্লাহর রসূল বলিলেন, উসামা ইবনে যায়েদ যেন সৈন্যসহ যাইয়া পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এই সময়টিতে সাধারণতঃ জীবনসঙ্গী শহীদদের কথাই তাঁহার বেশী করিয়া স্মরণে আসিত।

এক রাত্রে জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থদের কথা স্মরণ হইল। উহা সাধারণ মুসলমানদের সমাধিভূমি ছিল। পরলোকগত সাথীদের প্রতি হৃদয়ের টানে অর্ধেক রাতের সময়ই জান্নাতুল বাকীতে চলিয়া গেলেন এবং তথায় শায়িতদের জন্য নিতান্ত দরদের সহিত দোয়া করিলেন। সাথীদের উদ্দেশে বলিলেন, "আমিও শীঘ্রই তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি।"

আর একদিন মুসলমানদিগকে মসজিদে নববীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সম্মিলিত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

মুসলমানগণ, তোমরা আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অফুরন্ত নেয়ামত নাজিল করুন। তোমাদিগকে সম্মান ও উন্নতি প্রদান করুন। তোমাদের জন্য শান্তি সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিন। এখন হইতে একমাত্র আল্লাহই তোমাদের রক্ষক ও পরিচালক। আমি তোমাদিগকে তাঁহার প্রতি ভয় পোষণ করার আবেদন জানাইতেছি। দেখিও, আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে অহংকার এবং প্রাধান্যের বড়াই করিও না। আল্লাহর এই বাণী তোমরা সর্বাবস্থায়ই স্মরণ রাখিও—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

– "উহা আখেরাতের আশ্রয়স্থল। আমি উহা তাহাদিগকেই দান করি যাহারা দুনিয়াতে অহংকার ও বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা না করে। আখেরাতের কামিয়াবী কেবলমাত্র খোদাভীরুদের জন্য।"

অতঃপর বলিলেন— اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

'অহংকারীদের আশ্রয় কি দোযখে নহে'। সর্বশেষ বলিলেন, তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক এবং তাহাদের সকলের উপর যাহারা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আমার উম্মতে আসিয়া শামিল হইবে।

রোগের সূচনা

২৯শে সফর সোমবার দিন কোন এক জানাযা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মাথা ব্যথার মধ্য দিয়া রোগের সূচনা হয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলে খোদার (সা.) মাথায় একটি রুমাল বাঁধা ছিল। আমি উহার উপর হাত রাখিলাম; মাথা এত বেশী উত্তপ্ত হইয়াছিল যে, হাতে তাহা সহ্য হইতেছিল না। দ্বিতীয় দিবসেই রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য মুসলিম জননীগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে হযরত আয়েশার ঘরে অবস্থানের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু শরীর এত দুর্বল হইয়া গিয়াছিল যে, স্বয়ং হযরত আয়েশার ঘর পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হইলেন না। হযরত আলী এবং হযরত আব্বাস (রা.) মিলিয়া দুই বাহু ধরিয়া অত্যন্ত কষ্টের সাথে তাঁহাকে হযরত আয়েশার ঘর পর্যন্ত লইয়া আসিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আল্লাহর রসূল (সা.) কখনও অসুস্থ হইলে এই দোয়া পড়িয়া হাতে দম করতঃ সর্বশরীরে হাত মুছিয়া দিতেন।

اذهب الباس رب الناس واشف انت الشا فى لا شفاء الا
شفائك لايغادر سقما .

– "হে মানুষের প্রভু, সংকট দূর করিয়া দাও। হে আরোগ্যদাতা, আরোগ্য করিয়া দাও। তুমি যাহাকে নিরাময় কর সেই আরোগ্য লাভ করিতে পারে। এমন নিরাময় করিয়া দাও যাহাতে আর কোন কষ্ট অবশিষ্ট না থাকে।"

এইবারও আমি উক্ত দোয়া পাঠ করিয়া রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে ফুঁক দিয়া সেই হাত শরীরের সর্বত্র ফিরাইয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি হাত টানিয়া নিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

– "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর এবং তোমার সান্নিধ্য দান কর।"

শেষ বিদায়ের পাঁচ দিন পূর্বে

শেষ বিদায়ের পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার দিবস পাথরের একটি জলপাত্রে উপবেশন করতঃ মাথায় সাত মশক পানি ঢালিতে বলিলেন। ইহাতে শরীর কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে চলিয়া আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন ঃ "মুসলমানগণ, তোমাদের পূর্বে এমন সব জাতি অতিবাহিত হইয়াছে, যাহারা তাহাদের পয়গম্বর ও সৎ ব্যক্তিদের কবরকে সেজদার স্থানে পরিণত করিয়াছিল। তোমরা কখনও এইরূপ করিও না।" পুনরায় বলিলেন, "ঐ সমস্ত ইহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, যাহারা তাহাদের পয়গম্বরদের কবরকে সেজদার স্থানে পরিণত করিয়াছে। আমার পর আমার কবরকে এইরূপ করিও না যাহাতে পূজা শুরু হইবে। মুসলমানগণ, ঐ জাতি আল্লাহর অভিশাপে পতিত হয়, যাহারা নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করে। দেখ, আমি তাহাদিগকে এইরূপ করিতে বারণ করিতেছি। দেখ, পুনরায় আমি সেই কথাই বলিতেছি!! হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকিও! হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকিও!!

আল্লাহ তাঁহার এক বান্দাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল সম্পদ অথবা আখেরাত কবুল করার এখতিয়ার দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বান্দা কেবলমাত্র আখেরাত কবুল করিয়া লইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদিতে শুরু করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ

সবকিছু আপনার জন্য উৎসর্গ হউক! লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া হযরত আবু বকরকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, আল্লাহর রসূল এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, ইহার মধ্যে আবার রোদনের কি কারণ ঘটিল? কিন্তু এই কথা তিনিই বুঝিয়াছিলেন, শুনিবা মাত্রই যাঁহার চক্ষু অশ্রু প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

হযরত সিদ্দিকের এই আন্তরিকতা দেখিয়া আল্লাহর রসূলের (সা.) অন্তরে অন্য কথা উদিত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তির সম্পদ ও সাহচর্যে আমি সবচাইতে বেশী কৃতজ্ঞ, তিনি আবু বকর। আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাহাকেও যদি বন্ধুত্বের জন্যে নির্বাচিত করিতে পারিতাম, তবে তিনি হইতেন আবু বকর, কিন্তু কেবলমাত্র ইসলামের বন্ধনই আমার বন্ধুত্বের মাপকাঠি এবং উহাই আমি যথেষ্ট মনে করি। মসজিদের সহিত সংযুক্ত যত রাস্তা আছে, একমাত্র আবু বকরের রাস্তা ব্যতীত আর কাহারও রাস্তা অবশিষ্ট রাখিও না।

আল্লাহর রসূল (সা.) রুগ্ন হওয়ার পর মদীনার আনসারগণ সকলেই রোদন করিতেছিলেন। হযরত আবু বকর ও হযরত আব্বাস (রা.) পথ দিয়া যাওয়ার সময় আনসারগণকে রোদন করিতে দেখিলেন। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করার পর তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর রসূলের (সা.) সাহচর্যের স্মৃতি আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। আনসারদের এই অবস্থা আল্লাহর রসূলের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, লোকসকল, আমি আমার আনসারদের সম্পর্কে তোমাদিগকে অন্তিম উপদেশ দিতেছি। সাধারণ মুসলমান দিন দিনই বর্ধিত হইবে, কিন্তু আমার আনসারগণ থাকিবেন নিতান্ত অল্প। ইহারা আমার শরীরের আচ্ছাদন এবং জীবন-পথের অবলম্বন। তাহারা তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের প্রাপ্য বাকী রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উম্মতের ভাল-মন্দের জন্য দায়ী হইবেন, তাঁহার কর্তব্য হইবে আনসারদের যথার্থ মর্যাদা দান করা এবং যদি কোন আনসার দ্বারা কোন ভুল সংঘটিত হয় তবে তাহাকে ক্ষমা করা।

আল্লাহর রসূল (সা.) নির্দেশ দিয়াছিলেন, হযরত উসামা যেন সৈন্য সহকারে সিরিয়া সীমান্তে যাইয়া স্বীয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই নির্দেশ শুনিয়া মোনাফেকরা বলিতে লাগিল, একজন সাধারণ যুবককে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সাম্যের নবী বলিতে লাগিলেন—

"আজ উসামার নেতৃত্বে তোমাদের আপত্তি দেখা দিয়াছে। কাল তাহার পিতা যায়েদের নেতৃত্বেও তোমরা আপত্তি করিয়াছিলে। আল্লাহর শপথ, সেও এই পদের জন্য যোগ্য ছিল, এও এই পদের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। সেও আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র

ছিল, এও আমার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র।" অতঃপর বলিলেন—

"হালাল ও হারাম নির্দেশ করার ব্যাপারে আমার বরাত দিও না। আমি ঐ সমস্ত বস্তুই হারাম করিয়াছি, স্বয়ং আল্লাহ্ যে সমস্ত বস্তু হারাম করিয়াছেন।"

অতঃপর তিনি আহলে বায়তের প্রতি মনোযোগ দিলেন, যেন নবী-বংশের অহমিকায় পতিত হইয়া তাঁহারা আমল ও পরিশ্রমবিমুখ হইয়া না যান। তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "হে রসূল-কন্যা ফাতেমা; হে রসূলে খোদার ফুফী সাফিয়া, কিছু পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লও। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি হইতে বাঁচাইতে পারিব না।"

এই হৃদয়-বিদারী খুৎবাই আল্লাহর রসূলের শেষ খুৎবা। মসজিদে নববীর সমাবেশে অতঃপর আর তিনি কোন খুৎবা দিতে উঠেন নাই। খুৎবা শেষ হওয়ার পর আল্লাহর রসূল (সা.) হযরত আয়েশার হুজরায় তশরীফ আনিলেন। রোগযন্ত্রণা তখন এমন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, অস্থিরভাবে পবিত্র চেহারা চাদর দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিতেছিলেন, কখনও বা চাদর সরাইয়া দিতেছিলেন। এই অস্থির অবস্থার মধ্যেই হযরত আয়েশা (রা.) তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইতে শোনেন — "ইহুদী ও খৃস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হউক; উহারা পয়গম্বরগণের সমাধিকে উপাসনা মন্দিরে পরিণত করিয়াছে।"

শেষ বিদায়ের চার দিন পূর্বে

ওফাতের চার দিন পূর্বে শুক্রবার দিন আল্লাহর রসূল (সা.) হযরত আয়েশাকে তাঁহার পিতা হযরত আবু বকর (রা.) ও ভ্রাতা আবদুর রহমানকে ডাকিয়া আনিতে নির্দেশ দিলেন। এই সময়ই বলিতে লাগিলেন ঃ "দোয়াত-কলম নিয়া আস। আমি তোমাদিগকে এমন এক ফরমান লিখিয়া দিব, যাহার পর আর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না।" ব্যাধির তীব্রতার দরুনই আল্লাহর রসূলের (সা.) অন্তরে এইরূপ খেয়াল উদয় হইয়াছিল। হযরত ওমর ফারুক (রা.) এই সময় মত প্রকাশ করিলেন; এমতাবস্থায় আল্লাহর রসূলকে অধিক কষ্ট দেওয়া সমীচীন হইবে না। শরীয়তের এমন কোন দিক নাই, যাহার উপর কোরআন পাক পূর্ণভাবে আলোকপাত না করিয়াছে। কোন কোন সাহাবী ওমরের (রা.) এই মতের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বিতর্ক শুরু করিলেন। এমতাবস্থায় শোরগোল যখন বাড়িয়া চলিল, তখন কেহ বলিলেন, এই ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া প্রয়োজন! এই সময় রসূলুল্লাহ (সা.) বলিতে লাগিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমি এখন যেখানে অবস্থান করিতেছি তাহা তোমরা আমাকে যেখানে আহ্বান করিতেছ তাহা হইতে শ্রেয়।" এই দিনই আরও তিনটি অন্তিম নির্দেশ দিলেন ঃ

১. আরবে যেন কোন অংশীবাদী অবস্থান না করে।

২. রাষ্ট্রদূত ও পররাজ্যের প্রতিনিধিবর্গের যেন যথাযোগ্য মর্যাদা ও যত্ন করা হয়।

৩. কোরআন সম্পর্কেও কিছু বলিয়াছিলেন, কিন্তু উহা বর্ণনাকারী ভুলিয়া যান।

তীব্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ এগারো দিন পর্যন্ত মসজিদে রীতিমতই আগমন করিতেছিলেন। বৃহস্পতিবার দিন মাগরিবের নামাযও স্বয়ং পড়াইলেন। এই নামাযে 'সূরা মুরসালাত' তেলাওয়াত করিয়াছিলেন। এশার সময় একটু হুশ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামায শেষ হইয়াছে কি? বলা হইল, না। মুসলমানগণ আপনার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। এমতাবস্থায় পানি উঠাইয়া গোসল করিলেন এবং নামাযে শামিল হইবার জন্য রওয়ানা হইলেন, কিন্তু এর মধ্যেই তিনি বেহুশ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর আবার চক্ষু খুলিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামায হইয়া গিয়াছে কি? নিবেদন করা হইল, "ইয়া রসূলাল্লাহ, মুসলমানগণ আপনার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।" এই কথা শুনিয়া তিনি আবার উঠিতে চাহিলেন, কিন্তু পুনরায় বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর চক্ষু খুলিলে সেই একই প্রশ্ন করিলেন। জওয়াব দেওয়া হইল : মুসলমানগণ হুজুরের অপেক্ষা করিতেছেন। এই বার উঠিয়া শরীরে পানি দিলেন, কিন্তু উঠিতে যাইয়াই আবার বেহুশ হইয়া গেলেন। হুশ হইলে নির্দেশ দিলেন, আবু বকর নামায পড়াইয়া দিন। হযরত আয়েশা বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আবু বকর অত্যন্ত কোমল অন্তরের লোক। আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া হয়ত স্থির থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) আবার নির্দেশ দিলেন, আবু বকরই নামায পড়াইবেন। হযরত আয়েশার ধারণা ছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্থানে এখন যিনি ইমাম হইবেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরলোকে তাঁহাকে হয়ত অপয়া মনে করিবে। বর্ণিত আছে, এই সময় হযরত আবু বকর (রা.) উপস্থিত না থাকায় কেহ কেহ হযরত ওমরকে সম্মুখে ঠেলিয়া দিতে চাহিলেন। এই কথা জানিতে পারিয়া রসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন, না, না, না, আবু বকরই নামায পড়াইবেন।

আল্লাহর রসূলের (সা.) মিম্বর কিছুদিন পূর্ব হইতেই শূন্য হইয়া গিয়াছিল। আজ জায়নামাযও শূন্য হইয়া গেল। হযরত আবু বকর (রা.) রসূলে খোদার (সা.) স্থানে দণ্ডায়মান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে উপস্থিত সকলের অন্তরে নৈরাশ্যের কালো পর্দা নামিয়া আসিল। সকলের চোখেই সমানভাবে অশ্রুর প্লাবন দেখা দিল। স্বয়ং হযরত আবু বকরের পদযুগল কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু রসূলের নির্দেশ ও আল্লাহর অনুগ্রহ থাকায় কোন প্রকারে তিনি এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এইভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই হযরত আবু বকর (রা.) সতেরো ওয়াক্তের নামাযে ইমামতি করিলেন।

বিদায়ের দুই দিন পূর্বে

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) জোহরের নামায পড়াইতেছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর রসূল (সা.) মসজিদে আসিতে মনস্থ করিলেন এবং হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের (রা.) কাঁধে হাত রাখিয়া জামাতে তশরীফ আনিলেন। উপস্থিত নামাযীগণ অত্যন্ত অস্থিরতার সহিত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) পর্যন্ত ইমামের স্থান হইতে পশ্চাতে সরিয়া আসিতে লাগিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) হাতে ইশারা করিয়া তাঁহাকে সরিয়া আসিতে বারণ করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া নামায আদায় করিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একতেদা করিতেছিলেন; এইভাবেই নামাজ সমাপ্ত হইলে পর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার (রা.) ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

বিদায়ের একদিন পূর্বে

কুল-মানবের জীবন-দিশারী আল্লাহর রসূল (সা.) দুনিয়ার বাঁধন হইতে মুক্ত হইতেছিলেন। সেই দিন সকালে উঠিয়া সর্বপ্রথম সকল ক্রীতদাস-দাসীকে মুক্তি দিলেন। সংখ্যায় ছিল তাহারা চল্লিশ জন। এরপর ঘরের মাল-সামানের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। আল্লাহর নবীর ঘরে তখন সর্বমোট সঞ্চয় ছিল মাত্র সাতটি স্বর্ণমুদ্রা। হযরত আয়েশাকে বলিলেন, এইগুলি গরীবদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। আমার লজ্জা হয়, রসূল তাহার আল্লাহর সহিত মিলিত হইতে যাইবেন আর তাহার ঘরে দুনিয়ার সম্পদ জমা হইয়া থাকিবে! এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকল কিছু নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়া হইল। সেই রাত্রে আল্লাহর রসূলের ঘরে বাতি জ্বালাইবার মত এক ফোঁটা তৈলও আর অবশিষ্ট ছিল না। একজন প্রতিবেশী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সামান্য তৈল ধার করিয়া আনা হইয়াছিল। ঘরে কিছু অস্ত্র পড়িয়াছিল। এইগুলিও মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বর্মটি ত্রিশ সা' গমের মূল্য বাবত এক ইহুদীর ঘরে বন্ধক ছিল।

দুর্বলতা তখন ক্রমশই বর্ধিত হইয়া চলিয়াছিল। কোন কোন দরদমন্দ আসিয়া ঔষধ সেবন করাইতে চাহিলেন, কিন্তু আল্লাহর রসূল (সা.) ঔষধ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। এই সময় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। পরিচর্যাকারীগণ মুখ খুলিয়া কিছু ঔষধ পান করাইয়া দিলেন। হুশ ফিরিয়া আসিলে পর ঔষধের কথা জানিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, "যাহারা ঔষধ পান করাইয়াছে; তাহাদিগকে ধরিয়া এই ঔষধ পান করাইয়া

দাও। কারণ, যাহার জন্য ইহারা এহেন প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল, তিনি তাহার মহান আল্লাহর চূড়ান্ত আহ্বান কবুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন এখানে দাওয়া বা দোয়া প্রয়োগের আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট ছিল না।"

বিদায়ের দিন

৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন শরীর যেন একটু ভাল বলিয়া মনে হইতেছিল। মসজিদে তখন ফজরের নামায হইতেছে। আল্লাহর রসূল হুজরা ও মসজিদের মধ্যবর্তী পর্দা একটু সরাইয়া দিলেন। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ছিল তখন রুকু-সেজদারত নামাযীদের বিস্তৃত কাতার। সরওয়ারে আলম তাঁর জীবন-সাধনার এই পবিত্র দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিলেন। আনন্দাতিশয্যে একটু হাসিয়া উঠিলেন। লোকদের ধারণা হইল, বোধ হয় তিনি মসজিদে তশরীফ আনিতেছেন। সকলেই যেন একটু অধীর হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ নামায ছাড়িয়া পিছাইতে শুরু করিলেন। হুজুর (সা.) হাতে ইশারা দিয়া সকলকে শান্ত করিলেন এবং পবিত্র চেহারার শেষ ঝলক দেখাইয়া হুজরার পর্দা ফেলিয়া দিলেন। মুসলিম জনতার জন্য আল্লাহর রসূলের এই দর্শন ছিল শেষ দর্শন। এই ব্যবস্থা বোধ হয় খোদ বিশ্বনিয়ন্তার পক্ষ হইতেই করা হইয়াছিল, যেন নামাযের সঙ্গী-সাথীগণ দুনিয়ার শেষ দর্শন লাভ করার সুযোগ পান।

৯ই রবিউল আউয়াল সকাল হইতেই আল্লাহর রসূলের অবস্থা আশ্চর্য রকমভাবে পরিবর্তিত হইতেছিল। দিনের সূর্য উর্ধ্বগগনে উদিত হইতেছিল; আর নবুওয়তের সূর্য ধীরে ধীরে অস্তাচলের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। আল্লাহর রসূলের উপর বে-হুশীর কাল মেঘ যেন বার বার আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে বেহুশ হইয়া যাইতেছিলেন আবার সঙ্গে সঙ্গেই হুশ ফিরিয়া আসিতেছিল। আবার বেহুশ হইয়া পড়িতেছিলেন। এই কষ্টের মধ্যে প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমাকে স্মরণ করিলেন। হযরত ফাতেমা পিতার এই অবস্থা দেখিয়া নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। তিনি পিতার শরীর জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কন্যাকে এইভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় বৎস, কাঁদিও না। দুনিয়া হইতে যখন আমি চলিয়া যাইব, তখন ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন বলিও। ইহার মধ্যেই প্রত্যেকের জন্য সান্ত্বনার বাণী নিহিত রহিয়াছে।" হযরত ফাতেমা (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে আপনার কি সান্ত্বনা আসিবে? বলিলেন, হাঁ, ইহাতে আমার সান্ত্বনা নিহিত আছে।

প্রিয় নবীর ব্যাধির তীব্রতা যতই বর্ধিত হইতেছিল, হযরত ফাতেমার অন্তর্দাহ ততই যেন বাড়িয়া উঠিতেছিল। রাহমাতুল লিলআলামীন প্রিয় কন্যার এই অবস্থা অনুভব করিতে

পারিয়া কিছু বলিতে চাহিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) তাঁহার মুখের নিকট কান পাতিলে তিনি বলিতে লাগিলেন— "কন্যা! আমি আজ দুনিয়া ত্যাগ করিতেছি।" এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত ফাতেমা (রা.) কাঁদিয়া উঠিলেন। আল্লাহর রসূল পুনরায় বলিলেন, "আমার আহলে বায়তের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সহিত আসিয়া মিলিত হইবে।" এই কথা শোনামাত্র হযরত ফাতেমা (রা.) হাসিয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, এই বিচ্ছেদ অল্প দিনের।

মানবতার নবীর অবস্থা ক্রমেই নাজুক হইয়া উঠিতেছিল। অবস্থা দেখিয়া হযরত ফাতেমা (রা.) মর্মবিদারী কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হায় আমার পিতার কষ্ট! তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিলেন, ফাতেমা; আজকের দিনের পর আর তোমার পিতা কখনও অস্থির হইবেন না।"

হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.) একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কাছে ডাকিয়া সান্ত্বনা দিলেন, চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাদের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য সকলকে অছিয়ত করিলেন। মুসলিম জননীগণকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাদিগকেও উপদেশ দান করিলেন। এই সময়ই বলিতে লাগিলেন,

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

"তাঁহাদের সহিত যাঁহাদিগকে আল্লাহ নেয়ামত দান করিয়াছেন।"

কখনওবা বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ فَهُوَ الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

হে আল্লাহ, শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

অতঃপর হযরত আলীকে ডাকিলেন। তিনি আসিয়া রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র মস্তক কোলে তুলিয়া লইলেন, তাঁহাকেও নসীহত করিলেন। সর্বশেষ আল্লাহর প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

"নামায, নামায; এবং তোমাদের ক্রীতদাস-দাসীগণ............।"

তখন হইতেই মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হইয়াছিল। হযরত রাহমাতুল লিল্‌আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অর্ধশায়িত অবস্থায় হযরত আয়েশার গায়ে হেলান দিয়া রহিয়াছিলেন। নিকটেই পানির পেয়ালা রাখা ছিল। উহাতে হাত রাখিতেছিলেন এবং পবিত্র চেহারা মুছিয়া দিতেছিলেন। পবিত্র চেহারা কখনও লাল হইয়া উঠিতেছিল, কখনও

ফ্যাকাশে হইয়া যাইতেছিল। যবান মোবারক ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তিনি উচ্চারণ করিতেছিলেন–

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ

– "আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, মৃত্যু সত্য সত্যই কষ্টদায়ক।"

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) একটি তাজা মেসওয়াক লইয়া আসিলে পর রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উহার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বুঝিলেন, মেসওয়াক করার ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি হযরত আবদুর রহমান (রা.) হইতে মেসওয়াকখানা লইয়া নিজ মুখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নরম করিয়া দিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মেসওয়াক করার পর তাঁহার চেহারা উজ্জ্বলতা আরও বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রসূল দুই হাত উর্ধ্বে তুলিলেন। মনে হইল যেন কোথাও রওয়ানা হইয়াছেন। মুখে উচ্চারিত হইল.....

بَلِ الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى - بَلِ الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى - بَلِ الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

"এখন আর কিছুই নহে; শুধু শ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য চাই।" তৃতীয় বার উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হাত নীচে পড়িয়া গেল। চোখের পুত্তলী উপরের দিকে উঠিয়া গেল এবং পবিত্র রূহ চিরতরে এই দুনিয়া ছাড়িয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

উহা ছিল রবিউল আউয়াল মাস। হিজরী ১১ সনের সোমবার দিবস চাশতের সময়। রসূলে করীম (সা.)-এর বয়স হইয়াছিল তখন চান্দ্রমাসের হিসাব মোতাবেক ৬৩ বৎসর ৪ দিন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

শোকের ছায়া

রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাতের খবর শুনিয়া মুসলমানদের যেন কলিজা ফাটিয়া গেল, পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। চেহারার জ্যোতি নিভিয়া গেল। চক্ষু রক্তাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। আকাশে আর মাটিতে যেন ভীতি দেখা দিল। সূর্যের আলো যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। অশ্রুর প্লাবন যেন আর বাঁধ মানিতেছিল না। কয়েকজন

সাহাবী বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া লোকালয় ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ জনশূন্য প্রান্তরের দিকে ছুটিয়া গেলেন। যিনি বসিয়া ছিলেন তিনি বসিয়াই রহিলেন। যিনি দণ্ডায়মান ছিলেন তিনি যেন বসিবার মত শক্তি হারাইয়া ফেলিলেন। মসজিদে নববী কেয়ামতের পূর্বেই যেন কেয়ামতের ভয়ানক রূপ ধারণ করিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তশরীফ আনিলেন এবং চুপচাপ হযরত আয়েশার হুজরায় চলিয়া গেলেন। তথায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের লাশ মোবারক রক্ষিত ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পবিত্র চেহারা হইতে চাদর তুলিয়া কপাল চুম্বন করিলেন। অতঃপর চাদর ফেলিয়া দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,— "হুজুর, আমার পিতামাতা আপনার নামে উৎসর্গ হউন। আপনার জীবন ছিল পবিত্র, আপনার মৃত্যুও তদ্রূপ পবিত্র হইয়াছে। আল্লাহর শপথ, এখন আপনার উপর আর দ্বিতীয় মৃত্যু আসিবে না; আল্লাহ্ আপনার জন্য যে মৃত্যু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার স্বাদ অদ্য আপনি গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আর কোন কালেও মৃত্যু আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

তথা হইতে হযত আবু বকর (রা.) মসজিদে নববীতে তশরীফ আনিলেন। দেখিতে পাইলেন, হযরত ওমর (রা.) অধীর হইয়া ঘোষণা করিতেছেন,— "মোনাফেকরা বলে, হযরত মোহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করিয়াছেন। আল্লাহর শপথ, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি হযরত মূসার ন্যায় আল্লাহর সান্নিধ্যে আহূত হইয়াছেন। হযরত মূসা চল্লিশ দিন অদৃশ্য থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তখনও হযরত মূসা সম্পর্কে এইরূপ প্রচার করা হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আল্লাহর শপথ! মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)ও তাঁহারই ন্যায় পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিবেন এবং যাহারা তাঁহার উপর মৃত্যুর অপবাদ দিতেছে, তাহাদের হাত-পা কাটিয়া শাস্তি দিবেন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ওমর ফারুকের কথা শুনিয়া বলিলেন, ওমর শান্ত হও! চুপ কর, কিন্তু হযরত ওমর (রা.) যখন কেবল বলিয়াই চলিয়াছিলেন, তখন তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত তথা হইতে একটু সরিয়া অন্য জায়গায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুরু করিলেন। উপস্থিত জনসাধারণও একে একে তাঁহার দিকে চলিয়া আসিতে লাগিলেন। তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর মহিমা কীর্তন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

লোকসকল, যাহারা মোহাম্মদ (সা.)-কে পূজা করিতে তাহারা জানিয়া রাখ, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে! আর যাহারা আল্লাহর এবাদত কর তাহারা জানিয়া রাখ ঃ তিনি চির জীবিত, কখনও তাঁহার মৃত্যু হইবে না। এই কথা খোদ কোরআন পাকে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط أَفَإِنْ

مَّاتَ اَوْ اقْتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ .

–"মোহাম্মদ (সা.) রসূল ব্যতীত কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্বেও অনেক রসূল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছেন; তিনি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, অথবা শহীদ হইয়া যান, তবে কি তোমরা আল্লাহর দ্বীন হইতে সরিয়া যাইবে? যে ব্যক্তি সরিয়া দাঁড়াইবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না; আল্লাহ কৃতজ্ঞদের প্রতিফল দান করিবেন।"

কোরআনের এই আয়াত শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ চমকিয়া উঠিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, "আল্লাহর শপথ, আমাদের এমন মনে হইতেছিল যে, এই আয়াত ইতিপূর্বে নাজিলই হয় নাই।" হযরত ওমর (রা.) বলেন, "হযরত আবু বকরের মুখে এই আয়াত শ্রবণ করিয়া আমার পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। দাঁড়াইয়া থাকার শক্তি আমার ছিল না। আমি ঢলিয়া পড়িলাম। আমার বিশ্বাস হইল, সত্যিই আল্লাহর রসূল ইন্তেকাল করিয়াছেন।"

হযরত ফাতেমা (রা.) শোকে অধীর হইয়া বলিতেছিলেন– "প্রিয় পিতা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়া বেহেশ্‌তে চলিয়া গিয়াছেন। হায়! কে আজ জিবরীল আমীনকে এই দুঃখের খবর শুনাইবে।

ইলাহী, ফাতেমার রূহকেও মোহাম্মদ মোস্তফার (সা.) রূহের নিকট পৌঁছাইয়া দাও! ইলাহী, আমাকে রসূলের দীদার সুখ দান কর।

ইলাহী, আমাকেও তাঁহার সাথে যাওয়ার সৌভাগ্য দান কর। ইলাহী, আমাকে রসূলে আমীনের শাফায়াত হইতে বঞ্চিত করিও না।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকার মনে-প্রাণে শোকের ঘনঘটা ছাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখে বিলাপের সুরে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান চরিত্র মাধুর্যের কথা উচ্চারিত হইতেছিল ঃ

"হায় পরিতাপ! সেই নবী, যিনি সম্পদের মধ্যে দারিদ্র্য বাছিয়া লইয়াছিলেন। যিনি প্রাচুর্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া দারিদ্র্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হায়! সেই ধর্মগত-প্রাণ রসূল, যিনি উম্মতের চিন্তায় একটি পূর্ণ রাতও আরামের সাথে শুইতে পারেন নাই।

হায়! সেই মহান চরিত্রের অধিকারী, যিনি অষ্টপ্রহর প্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিয়া গিয়াছেন।

হায়! সেই আল্লাহর নবী, যিনি অবৈধ বস্তুর প্রতি কখনও চোখ তুলিয়া দেখেন নাই।

আহা! সেই রাহমাতুললিল আলামীন, যাঁহার দয়ার দ্বার সর্বক্ষণ দরিদ্রের জন্য খোলা থাকিত। যাঁহার পবিত্র অন্তর কখনও শত্রুকে পর্যন্ত কষ্ট দেওয়ার চিন্তায় মলিন হয় নাই। যাঁহার মতির মত দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পরও তিনি তাহা সহ্য করেন। যাঁহার নূরের পেশানী ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি ক্ষমার হস্ত সংকুচিত করেন নাই।

হায়! আজ আমাদের এই দুনিয়া সেই মহৎ সত্তার অস্তিত্ব হইতেই শূন্য হইয়া গেল।"

দাফন-কাফন

মঙ্গলবার দিন দাফন-কাফনের প্রস্তুতি চলিল। ফজল বিন আব্বাস, উসামা ইবনে যায়েদ পর্দা উঠাইলেন। আনসারগণের একদল দরজার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন,— আমরা হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শেষ সেবায় অংশ দাবী করিতেছি। হযরত আলী (রা.) আওস ইবনে খাওলা আনসারীকে ভিতরে ডাকিয়া নিলেন। তিনি পাত্র ভরিয়া পানি আনিয়া দিতে লাগিলেন। হযরত আলী (রা.) লাশ মোবারক বুকে জড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) লাশ মোবারকের পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছিলেন, হযরত উসামা (রা.) উপর হইতে পানি ঢালিয়া দিতেছিলেন। হযরত আলী (রা.) গোসল দিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন ঃ—

"আমার পিতামাতা কোরবান হউন, আপনার মৃত্যুতে এমন সম্পদ হারাইয়াছি যাহা আর কোন মৃত্যুতেই হয় নাই।"

"অদ্য হইতে নবুওয়ত, গায়েবের খবর এবং ওহী নাযিল হওয়ার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল।"

"আপনার মৃত্যু সমস্ত মানবতার জন্য সমান বেদনাদায়ক বিপদ।"

"আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ না দিতেন এবং ক্রন্দন করিতে বারণ না করিতেন, তবে প্রাণ খুলিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতাম, কিন্তু তবুও এই ব্যথা চিকিৎসাতীত থাকিত। এই আঘাত কিছুই মুছিত না।"

"আমাদের এই ব্যথা অন্তহীন, আমাদের এই বিপদ প্রতিকারের অতীত।"

"আয় হুজুর! আমার পিতামাতা আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ হউন, আপনি যখন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবেন, তখন আমাদের কথা স্মরণ করিবেন। আমাদিগকে ভুলিবেন না।"

গোসলান্তে তিন খণ্ড সূতির সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হইল। যেহেতু অসিয়ত ছিল, তাঁহার কবর যেন এমন স্থানে রচনা করা না হয়, যেখানে ভক্তগণ সেজদা করার

সুযোগ পায়। এই জন্য হযরত আবু বকরের পরামর্শ অনুযায়ী হযরত আয়েশার হুজরায়– যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেখানেই কবর তৈয়ার করা হইল। হযরত তাল্হা (রা.) 'লাহাদ' ধরনের কবর খুঁড়িলেন। মাটি আর্দ্র ছিল। এই জন্য যে বিছানায় তিনি ইন্তেকাল করিয়াছিলেন সেই বিছানাই কবরে বিছাইয়া দেওয়া হইল।

প্রস্তুতি সমাপ্ত হইলে পর মুসলিম জনতা জানাযার জন্য দলে দলে সমবেত হইলেন। লাশ মোবারক হুজরার ভিতর রক্ষিত ছিল। এই জন্য মুসলমানগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জানাযা আদায় করিতে যাইতেছিলেন এবং জানাযা সমাপ্ত করিয়া ফিরিতেছিলেন। এই জানাযার নামাযে কেহ ইমাম ছিলেন না! প্রথম নবী পরিবারের লোকগণ জানাযা পড়িলেন। অতঃপর মোহাজেরীন এবং তৎপর আনসারগণ; স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুগণ পৃথক পৃথকভাবে জানাযা পড়িলেন।

জানাযার ভীড় সারাদিন ও সরারাত্র ধরিয়া চলিল। এই জন্য দাফনের কাজ বুধবার দিন অর্থাৎ ইন্তেকালের ৩৬ ঘন্টা পর সমাপ্ত হইল। পবিত্র লাশ হযরত আলী, হযরত ফযল ইবনে আব্বাস, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) মিলিয়া কবরে নামাইলেন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত এই দুনিয়ার "চাঁদ, দ্বীনের সূর্য এবং কোটি কোটি মানবের হৃদয়ের ধন দুনিয়াবাসীর দৃষ্টিপথ হইতে চিরতরে মাটির আবরণে ঢাকিয়া দেওয়া হইল।" ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

পরিত্যক্ত সম্পদ

সীরাতুন নবীর লিখক কি সুন্দরই না লিখিয়াছেন,— আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জীবৎকালেই বা ঘরে কি রাখিতেন যে, মৃত্যুর পর তাহা পরিত্যক্ত হইবে। পূর্বেই তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন– لا نورث ما تركنا صدقة "আমরা নবীগণের কোন উত্তরাধিকারী নাই। যাহা আমরা ছাড়িয়া যাই তাহা ছদকা বলিয়া গণ্য।"

আমর ইবনে হুয়াইরেস (রা.) হইতে বর্ণিত আছে,— "হুজুর (সা.) মৃত্যুর সময় কোন কিছু ছাড়িয়া যান নাই। স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা, দাস-দাসী ইত্যাদি কিছুই নাই। কেবলমাত্র তাঁহার আরোহণের একটি সাদা খচ্চর, ব্যবহারের অস্ত্র এবং সামান্য ভূমি ছিল, যাহা সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে দান করিয়া দেওয়া হয়।"

কতগুলি স্মরণীয় বস্তু সাহাবীগণ রক্ষা করিয়াছেন। হযরত আবু তালহার নিকট পবিত্র দাড়ির একগুচ্ছ কেশ ছিল। হযরত আনাস ইবনে মালেকের নিকট পবিত্র দাড়ি ব্যতীত একজোড়া জুতা এবং একটি কাঠের ভাঙ্গা পেয়ালা ছিল। তরবারি 'জুলফিকার' হযরত আলীর নিকট রক্ষিত ছিল। হযরত আয়েশার নিকট যে কাপড় পরিধানে থাকা অবস্থায়

রসূলে খোদা (সা.) ইন্তেকাল করিয়াছিলেন তাহা রক্ষিত ছিল। পবিত্র সীলমোহর ও যষ্টি হযরত আবু বকর সিদ্দিকের হাতে সমর্পণ করা হয়।

এ ছাড়া গোটা মানবতার জন্য তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেছে আল্লাহর কিতাব কোরআন পাক। তিনি এরশাদ করেন–

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدى ان اعتصمتم به كتاب الله

– "হে লোকসকল, আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু ছাড়িয়া চলিয়াছি, যদি তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, তবে কখনও তোমরা বিভ্রান্ত হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহর কিতাব কোরআন।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিকের ইন্তেকাল

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রসূলে খোদার (সা.) ইন্তেকালের পর মাত্র দুই বৎসর তিন মাস জীবিত ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরহ-ব্যথা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। দিন দিনই কৃশ-দুর্বল হইয়া যাইতেছিলেন। এইভাবেই তিনি দুনিয়া হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনিই সকলকে সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ অন্তরের দাহ একটুও শান্ত হয় নাই। একদিন বৃক্ষ শাখে একটি পাখীকে নাচিয়া বেড়াইতে দেখিয়া একটু উত্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে বলিতে লাগিলেন, "হে পাখী, কত ভাগ্যবান তুমি। গাছের ফল খাও আর শীতল ছায়ায় আনন্দে কালাতিপাত কর। মৃত্যুর পরও তুমি এমন স্থানে যাইবে, যেখানে কোন প্রকার জবাবদিহির দায়িত্ব নাই। পরিতাপ! আবু বকরও যদি এমন ভাগ্যবান হইত!" কখনও কখনও বলিতেন, "আফসোস! আমি যদি তৃণ হইতাম আর চতুষ্পদ জন্তু আমাকে খাইয়া ফেলিত।" এই সমস্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত উক্তি হইতে অনুমান করা যায়, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চির-বিদায়ের পর হযরত আবু বকরের হৃদয়ের ব্যথা কতটুকু উৎকট হইয়া উঠিয়াছিল।

পীড়ার সূচনা

ইবনে হেশাম বলেন, হযরত সিদ্দিকে আকবরের নিকট কিছু গোশ্‌ত উপহার আসিয়াছিল। তিনি হারেস ইবনে কালদাসহ তাহা খাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় হারেস বলিলেন— "আমীরুল মোমেনীন, আর খাইবেন না। আমার মনে হয় উহাতে বিষ মিশ্রিত

রহিয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু এই দিন হইতেই তাঁহারা উভয়ে পীড়া অনুভব করিতে শুরু করেন। হিজরী ১৩ সালের ৭ই জুমাদাল উখরা সোমবার দিন তিনি গোসল করিয়াছিলেন। ইহাতেই ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর শুরু হইল। এই জ্বর আর সারিল না। শরীরে যে পর্যন্ত শক্তি ছিল রীতিমত মসজিদে আসিয়া নামায পড়াইতে ছিলেন, কিন্তু রোগ যখন তীব্র হইয়া উঠিল, তখন হযরত ওমরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এখন হইতে আপনি নামায পড়াইতে থাকিবেন।"

কোন কোন সাহাবী আসিয়া বলিলেন, "যদি অনুমতি দেন তবে চিকিৎসক ডাকিয়া আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।" জওয়াব দিলেন, চিকিৎসক আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছেন। সাহাবীগণল জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি বলিলেন? হযরত সিদ্দিক বলিলেন,— فعال لما يريد

তিনি বলিয়াছেন, "আমি যাহা চাই তাহাই করি।"— (কোরআন)

হযরত ওমরের নির্বাচন

শরীর যখন খুব বেশী দুর্বল হইয়া গেল, তখন রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খলিফা নির্বাচনের কথা বিশেষভাবে ভাবিতে শুরু করিলেন। তিনি চাইতেন মুসলমানগণ যেন যে কোন প্রকার আত্মকলহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই জন্য তিনি বিশেষ চিন্তাশীল সাহাবীগণের মতামত গ্রহণ করতঃ নিজেই খলিফার নাম প্রস্তাব করার মনস্থ করিলেন। প্রথম তিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমর সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলিলেন, আপনি তাঁহার সম্পর্কে যত ভাল ধারণাই পোষণ করুন না কেন, আমার ধারণা তাহার চাইতেও ভাল। তবে তিনি একটু কঠোর প্রকৃতির লোক। হযরত সিদ্দিক (রা.) বলিলেন, তাঁহার কঠোরতা ছিল এই জন্য যে, আমি ছিলাম কোমল। যখন তাঁহার উপর দায়িত্ব আসিবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি কোমল হইয়া যাইবেন। এই কথা শুনিয়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) চলিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত ওসমানকে ডাকাইয়া মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত ওসমান (রা.) বলিলেন, আপনি আমার চাইতে ভাল জানেন। হযরত সিদ্দিক (রা.) বলিলেন, তবুও আপনার মত কি? জওয়াবে হযরত ওসমান (রা.) বলিলেন, আমি এতটুকু বলিতে পারি, ওমরের বাহিরের চাইতে ভিতর অনেক ভাল এবং তাহার চাইতে যোগ্য ব্যক্তি এখন আমাদের মধ্যে আর কেহ নাই।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ এবং উসাইদ ইবনে হোযাইরের নিকটও অনুরূপভাবে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত উসাইদ (রা.) বলিলেন, "ওমরের অন্তর পবিত্র। তিনি

সৎকর্মশীলদের বন্ধু ও অসৎদের শত্রু। আমি তাঁহার চাইতে শক্ত ও যোগ্য ব্যক্তি আর দেখিতেছি না।"

হযরত সিদ্দিক (রা.) অনুরূপভাবে বহু লোকের নিকট হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করিতেছিলেন। সমগ্র মদীনায় প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে চান। খবর শুনিয়া হযরত তালহা (রা.) তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি জানেন, আপনার জীবদ্দশায়ই ওমর (রা.) লোকদের সহিত কত কঠোর ব্যবহার করেন, আর এখন যদি তিনি খলিফা হইয়া যান তবে না জানি কি করিতে শুরু করেনঃ আপনি আল্লাহর দরবারে চলিয়া যাইতেছেন, ভাবিয়া দেখুন, আপনি আল্লাহর নিকট উহার কি জওয়াব দিবেন। হযরত সিদ্দিক (রা.) বলিলেন, আমি খোদাকে বলিব, "আমি তোমার বান্দাদের উপর ঐ ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।"

অসিয়তনামা

পরামর্শ গ্রহণ শেষ করিয়া তিনি হযরত ওসমানকে ডাকিয়া বলিলেন, "খেলাফতের অসিয়তনামা লিখিয়া ফেলুন।" কতটুকু লেখা হওয়ার পরই হযরত সিদ্দিক (রা.) বেহুশ হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া হযরত ওসমান (রা.) নিজ তরফ হইতেই লিখিয়া দিলেন, "আমি ওমরকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া যাইতেছি।" কিছুক্ষণ পর হুশ হইলে হযরত ওসমানকে বলিলেন, যে পর্যন্ত লেখা হইয়াছে আমাকে পড়িয়া শোনান। হযরত ওসমান (রা.) সবটুকু পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আল্লাহ তোমাদিগকে এর শুভ পরিণাম দান করুন।"– (আল-ফারুক)

অতঃপর অসিয়তনামা হযরত ওসমান এবং একজন আনসারীর হাতে দিয়া দিলেন যেন মসজিদে নববীতে মুসলমানদের মধ্যে পাঠ করিয়া শুনাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর স্বয়ং অত্যধিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ঘরের বারান্দার দিকে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার বিবি হযরত উম্মে রুম্মান তাঁহার দুই হাত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, নীচে লোক সমবেত হইয়াছিল. তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যাঁহাকে আমি খলিফা নির্বাচিত করিব, তাঁহাকে কি তোমরা গ্রহণ করিবে? আল্লাহর শপথ, আমি চিন্তা করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করি নাই। তাহা ছাড়া আমি আমার কোন নিকট-আত্মীয়কেও নির্বাচিত করি নাই। আমি ওমর ইবনে খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত করিতেছি। আমি যাহা করিয়াছি তোমরা তাহা মানিয়া লও।"

অসিয়তনামাটি ছিল নিম্নরূপঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ঃ ইহা আবু বকর

ইবনে আবু কোহাফার অসিয়তনামা; যাহা তিনি শেষ মুহূর্তে যখন দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন এবং আখেরাতের প্রথম মুহূর্তে যখন তিনি পরপারে প্রবেশ করিতে উদ্যত, তখন লিপিবদ্ধ করাইতেছেন। ইহা ঐ সময়কার উপদেশ, যখন অবিশ্বাসীও বিশ্বাস স্থাপন করে, অসদাচারীও সংযত হয় এবং মিথ্যাবাদী পর্যন্ত সত্যের সম্মুখে মাথা ঝুঁকাইয়া দেয়। আমি আমার পরে তোমাদের জন্য ওমর ইবনে খাত্তাবকে আমীর নিযুক্ত করিয়া যাইতেছি! সুতরাং তোমরা তাঁহার নির্দেশ মান্য করিও এবং তাঁহার অনুগত থাকিও। এই ব্যাপারে আমি আল্লাহ, আল্লাহর রসূল, ইসলাম এবং স্বয়ং আমার দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছি, কোন ত্রুটি করি নাই। যাহারা অত্যাচার করিবে তাহারা শীঘ্রই স্বীয় পরিণাম ফল দেখিতে পাইবে। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।"

অন্তিম উপদেশ ও দোয়া

অতঃপর তিনি হযরত ওমরকে নির্জনে ডাকিয়া কতগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন এবং আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

"হে খোদা, আমি এই নির্বাচন এই জন্য করিয়াছি যেন মুসলমানদের মঙ্গল হয়। আমার ভয় ছিল, শেষ পর্যন্ত তাহারা আত্মকলহ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইয়া না যায়! হে প্রভু, আমি যাহা বলিতেছি তুমি তাহা ভালভাবেই জান। আমার চিন্তাভাবনা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্য আমি এমন এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করিয়াছি, যিনি সবচাইতে দৃঢ় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং মুসলমানদের সবচাইতে বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী। আয় আল্লাহ, আমি তোমার নির্দেশেই মর-দুনিয়া ত্যাগ করিতেছি। এখন তোমার বান্দারা তোমার হাতেই সমর্পিত হইতেছে। ইহারা তোমারই বান্দা। ইহাদের ভাগ্যের ডোর তোমারই হাতে। হে আল্লাহ, মুসলমানদের জন্য সৎ শাসনকর্তা দাও। ওমরকে খলিফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত কর এবং তাঁহার প্রজাদিগকে তাঁহার যোগ্যতা দ্বারা উপকৃত কর।"

হযরত আবু বকরের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বেলায়েতের মহৎ গুণেই খেলাফতের এই কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান হইয়া গেল। পূর্বাপর গোটা মুসলিম সমাজের অভিমত, হযরত ওমরকে খেলাফতের জন্য নির্বাচন ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য হযরত আবু বকরের এমন এক বিরাট অবদান, কেয়ামত পর্যন্ত যাহার আর কোন নজির মিলিবে না। হযরত ওমর (রা.) মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই যাহা করিয়াছিলেন, এক কথায় বলিতে গেলে, ইসলামের যে শক্তি ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, সেই সবগুলিকে সংহত করিয়া আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

দুনিয়ার হিসাব নিকাশ

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) আমাকে বাগানের বিশ সের খেজুর দিয়াছিলেন, যখন তাঁহার রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন বলিতে লাগিলেন, প্রিয় বৎস, আমি সর্বাবস্থায়ই তোমাকে সুখী দেখিতে চাই। তোমাদের দারিদ্র্য দেখিয়া আমার দুঃখ হয়। তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দেখিলে আমি আনন্দিত হই। বাগানের যে খেজুর তোমাকে দিয়াছিলাম, যদি তুমি তাহা লইয়া গিয়া থাক তবে ভাল, অন্যথায় আমার মৃত্যুর পরই উহা আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। তোমার আরও দুই ভাই-বোন রহিয়াছে। এমতাবস্থায় এই খেজুরগুলি কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া নিও।

হযরত আয়েশা (রা.) বলিলেন, "মাননীয় পিতা, আমি আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। ইহার চাইতে অধিক সম্পদও যদি হইত, তবুও আপনার নির্দেশমত তাহা আমি ত্যাগ করিতাম।"

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে বলিলেন, "বাইতুল মাল হইতে আমি এই পর্যন্ত যে পরিমাণ বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার হিসাব কর।" হিসাব করার পর জানা গেল, গোটা খেলাফত আমলে মোট ছয় হাজার দেরহাম বা পনের শত টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। বলিলেন, "আমার ভূমি বিক্রয় করিয়া এখনই এই অর্থ পরিশোধ করিয়া দাও।" তৎক্ষণাৎ ভূমি বিক্রয় করতঃ বাইতুল মালের টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইল। এইভাবেই আল্লাহর রসূলের হিজরতের বন্ধুর এক-একটি পশম বাইতুল মালের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করা হইল। বাইতুল মালের টাকা পরিশোধ করার পর বলিলেন, "অনুসন্ধান করিয়া দেখ, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমার সম্পত্তি কোন প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা? অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, খলিফা হওয়ার পর তাঁহার একটি হাবশী ক্রীতদাস, যে শিশুদের দেখাশোনা এবং মুসলিম জনগণের তরবারি পরিষ্কার করার কাজ করিত, পানি আনার একটি উষ্ট্রী এবং এক টাকা চারি আনা মূল্যের একটি চাদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হিসাব শুনিয়া নির্দেশ দিলেন, আমার মৃত্যুর পর এইগুলি পরবর্তী খলিফার নিকট পৌছাইয়া দিও।

ইন্তেকালের পর উপরোক্ত বস্তুগুলি হযরত ওমরের নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "হে আবু বকর, আপনি আপনার স্থলাভিষিক্তদের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন করিয়া গেলেন।"

শেষ নিঃশ্বাসের সময়

হযরত আবু বকরের জীবনের শেষ দিন ইরাকে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সহকারী সেনাপতি মুসান্না মদীনায় পৌছিলেন। এই সময় আমীরুল মোমেনীন মৃত্যু যন্ত্রণার চরম অবস্থা অতিক্রম করিতেছিলেন। মুসান্নার আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুসান্না যুদ্ধক্ষেত্রের সকল খবর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, "পারস্য সম্রাট কেসরা ইরাকে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।" সমস্ত খবর শুনিয়া এই অবস্থাতেই হযরত ওমরকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওমর, আমি যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর এবং সেই অনুযায়ী কাজ কর। আমার মনে হয় অদ্যই আমার জীবন শেষ হইয়া যাইবে। যদি দিনের বেলায় আমার দম বাহির হয় তবে সন্ধ্যার পূর্বেই এবং যদি রাত্রে হয় তবে সকাল হওয়ার পূর্বেই মুসান্নার সহিত সৈন্য প্রেরণ করিবে।" অতঃপর বলিলেন, "ওমর, যে কোন বিপদ মুহূর্তেও আল্লাহর নির্দেশ অথবা ইসলামের কোন কাজ পরবর্তী দিবসের জন্য মুলতবি রাখিও না। হযরত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর চাইতে বড় বিপদ আমাদের জন্য আর কি হইতে পারিত? কিন্তু তুমি দেখিয়াছ, ঐ দিনও আমার যা করণীয় ছিল তাহা আমি করিয়াছি। আল্লাহর শপথ, ঐ দিন যদি আমি আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করিতে যাইয়া অবহেলা করিতাম, তবে আল্লাহ্ আমাদের উপর ধ্বংসের শাস্তি অবতীর্ণ করিতেন; মদীনার ঘরে ঘরে কলহের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। আল্লাহ যদি ইরাকে মুসলিম বাহিনীকে কৃতকার্য করেন, তবে খালেদের বাহিনীকে সিরিয়া সীমান্তে পাঠাইয়া দিও। কেননা, সে বিচক্ষণ এবং ইরাকের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।"

ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন, "হযরত মোহাম্মদ (সা.) কোন্ দিন ইন্তেকাল করিয়াছিলেন?" বলা হইল, সোমবার দিন। তখন তিনি বলিলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা যেন আজই আমি বিদায় হই। যদি আল্লাহ্ আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, তবে আমাকেও রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র কবরের নিকটে সমাহিত করিও!

ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাসের সময় নিকটবর্তী হইতেছিল। হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত মোহাম্মদ (সা.)-কে কয়টি কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছিল? আয়েশা (রা.) বলিলেন, তিন কাপড়ে। তিনি বলিলেন, আমাকেও তিন কাপড়ে কাফন দিও। এখন আমার শরীরে যে দুইটি চাদর আছে এইগুলি ধুইয়া দিও, আর একটি কাপড় বাহির হইতে ব্যবস্থা করিও। হযরত আয়েশা (রা.) সমবেদনার সুরে নিবেদন করিলেন,– "আব্বাজান!

আমরা এত দরিদ্র নই যে, নতুন কাফন কিনিতে সমর্থ হইব না।"

হযর আবু বকর (রা.) বলিলেন, "কন্যা, মৃতদের চাইতে জীবিতদের কাপড়ের বেশী প্রয়োজন। আমার জন্য এই পুরাতন কাপড়ই যথেষ্ট হইবে।"

মৃত্যুর মুহূর্ত একটু একটু করিয়া নিকটবর্তী হইতেছিল। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এই অস্তাচলমুখী চাঁদের শিয়রে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন। দুঃখ বেদনায় ভরা এক একটি কথা তাঁহার কণ্ঠনালী হইতে অশ্রুর বন্যার সহিত ভাসিয়া আসিতেছিল। বসিয়া বসিয়া তিনি কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন– যাহার মর্ম হইল–

"জ্যোতিষ্কের মতো এমন অনেক উজ্জ্বল চেহারাও রহিয়াছে, যাহার নিকট মেঘমালাও পানি ভিক্ষা করিত; তিনি ছিলেন এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের পৃষ্ঠপোষক।"

কবিতা শুনিয়া হযরত সিদ্দিক (রা.) চক্ষু খুলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "বৎস, এই কথা একমাত্র রসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কেই খাটে।" হযরত আয়েশা (রা.) দ্বিতীয় একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, যাহার মর্ম হইল–

"তোমার বয়সের শপথ, মৃত্যুর ঊর্ধ্বশ্বাস যখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ধন-সম্পদ কোন কাজে আসে না।"

হযরত আবু বকর (রা.) বলিলেন, এই কথা বল—

جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ .

– "মৃত্যু যন্ত্রণার সঠিক সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, উহা ঐ সময় যাহা হইতে তোমরা পলাইতেছিলে।"– (কোরআন)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মৃত্যুর সময় আমি আমার পিতার শিয়রে বসিয়া নিম্নের মর্ম সম্বলিত কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম–

"যাহার অশ্রু সর্বদা, বদ্ধ রহিয়াছে একদিন তাহাও প্রবাহিত হইবে। প্রত্যেক আরোহীর কোন না কোন গন্তব্যস্থান রহিয়াছে। প্রত্যেক পরিধানকারীকেই কাপড় দেওয়া হইয়া থাকে!"

ইহা শুনিয়া আমার পিতা বলিতে লাগিলেন, কন্যা, এইভাবে নয়, সত্য কথা এইরূপ যেইরূপ আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

– মৃত্যু যন্ত্রণার সময় উপস্থিত হইয়াছে, উহা ঐ নিদারুণ সময় যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতে।

ইন্তেকাল

এই কথা বলিতে বলিতে হযরত আবু বকরের পবিত্র জীবনের সমাপ্তি হইয়াছিল–

رَبِّ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ

– "হে আল্লাহ, আমাকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দাও এবং তোমার সৎ বান্দাদের সহিত মিলিত কর।"

হিজরী ১৩ সনের ২৩ জুমাদাল আখের সোমবার দিন এশা ও মাগরেবের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁহার পবিত্র রূহ এই পাপ দুনিয়া হইতে উঠিয়া যায়। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর। তঁহার খেলাফত ছিল দুই বৎসর তিন মাস এগার দিন।

স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) গোসল দেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর শরীরে পানি ঢালিয়া দেন। হযরত ওমর জানাযার নামায পড়ান। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সমাধির সংলগ্ন স্থানে কবর খনন করা হইল।

রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্কন্ধ বরাবর মাথা রাখিয়া হযরত আবু বকর (রা.)-এর কবর রচনা করা হয়। হযরত ওমর, হযরত তাল্‌হা, হযরত ওসমান এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) পবিত্র লাশ কবরে নামাইলেন। এইভাবে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় াসাল্লামের পর উম্মতের সবচাইতে জনপ্রিয়, সর্বজ নমান্য ব্যক্তিকে দুনিয়ার আকাশ হইতে চিরতরে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

হযরত ওমরের শাহাদাত

রসূলে খোদার (সা.) শেষ বিদায়ের পর ইসলাম ও মুসলিম জাতির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছিল এক পর্বতপ্রমাণ দায়িত্ব। এ সহ্যাতীত বোঝা ইসলামের দুই জন নিষ্ঠাবান সন্তান মিলিতভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ও দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত ওমর ফারুক (রা.)। হযরত সিদ্দিক (রা.) একাধারে রসূলে খোদার (স.) বিচ্ছেদ-ব্যথায় তিলে তিলে নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিলেন, অপরদিকে ইসলাম ও মুসলিম জাতির দায়িত্বের গুরুভার তাঁহার মস্তক বিগলিত করিয়া দিতেছিল। ইহার ফল হইল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর তিনি মাত্র দুই বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তাহার পর এই দায়িত্বের বোঝা সম্পূর্ণরূপে

হযরত ওমরের কাঁধে আসিয়া পতিত হয়। হযরত ওমর ফারুক (রা.) কেমন প্রাণপণ সাধনা করিয়া খেলাফতের দায়িত্বভার পালন করিয়াছিলেন, নিম্নের কয়েকটি ঘটনা হইতে তাহার অনুমান করা যাইবে।

হরমুজান ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি। পারস্য সম্রাট ইয়াজদেগারদ তাঁহাকে আহওয়াজ ও ইরান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধ বাধিলে পর হরমুজান এই শর্তে অস্ত্র ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন, তাহাকে ছহিছালামতে মদীনায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত ওমর (রা.) তাঁহার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করিবেন অম্লান বদনে তাহাই মানিয়া লইবেন। যুদ্ধ থামিয়া গেল। হরমুজান বিপুল সমারোহে মদীনায় রওয়ানা হইলেন। ইরানের কতিপয় বড় বড় রঈসও তাহার সঙ্গে ছিলেন। মদীনার নিকটবর্তী হইয়া তিনি সুসজ্জিত মুকুটে মস্তক শোভিত করিলেন, মখমলের বহুমূল্য আবা পরিধান করিলেন। কটিদেশে বহুমূল্য তরবারি ঝুলাইয়া রাজকীয় শান-শওকতে মদীনায় প্রবেশ করিলেন। মসজিদে নববীর নিকট পৌঁছিয়া লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমীরুল মোমেনীনের সহিত কোথায় দেখা হইবে? ইরানীদের ধারণা ছিল, যে ব্যক্তির দাপটে সমগ্র দুনিয়ায় বিপ্লবের বাতাস বহিয়া চলিয়াছে, তাঁহার দরবার নিশ্চয়ই নিতান্ত জাঁকজমকপূর্ণ হইবে। একজন বেদুঈন হাতের ইশারায় দেখাইয়া বলিলেন, এই তো আমীরুল মোমেনীন। আমীরুল মোমেনীন ওমর (রা.) তখন মসজিদের বারান্দায় শুইয়া ছিলেন। ইয়ারমুকের ময়দানে যখন ত্রিশ সহস্র রোমীয় সৈন্য পায়ে বেড়ি লাগাইয়া মুসলিম বাহিনীর সহিত লড়াই করিতেছিল, তখন হযরত ওমরের অবস্থা কিরূপ ছিল? বিশ্বস্ত বর্ণনা, যতদিন যুদ্ধ চলিয়াছিল, ততদিন হযরত ওমর (রা.) একরাত্রিও শান্তির সহিত শুইতে পারেন নাই। যুদ্ধ শেষে যখন বিজয়ের খবর আসিল, তখন আল্লাহর উদ্দেশে সেজদায় পড়িয়া অশ্রু প্রবাহিত করিতে থাকেন।

কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারস্য সম্রাট রাজ্যের সর্বশক্তি যুদ্ধের ময়দানে নিয়োগ করিয়াছিলেন। একদিনের যুদ্ধেই দশ হাজার ইরানী ও দুই হাজার মুসলিম সৈন্য হতাহত হন। যুদ্ধ চলাকালে হযরত ওমরের অবস্থা ছিল, প্রত্যহ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মদীনার বাহিরে কোন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কাদেসিয়ার সংবাদবাহী কাসেদের পথ চাহিয়া থাকিতেন। কাসেদ যেদিন বিজয়ের সংবাদ লইয়া আসে, সেইদিনও তিনি মদীনার বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন জানিতে পারিলেন, হযরত সাদের কাসেদ যুদ্ধের খবর লইয়া আসিয়াছে, তখন তিনি খবর জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করিলেন। কাসেদ উট দৌড়াইয়া যাইতেছিল আর খবর বলিতেছিল। হযরত ওমরও উটের রেকাব ধরিয়া

কাসেদের পিছু পিছু দৌড়াইতে ছিলেন। শহরের অভ্যন্তরে পৌঁছার পর কাসেদ যখন শুনিতে পাইল, তাহার উটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া আসা লোকটিকে মদীনাবাসীগণ অতি সম্ভ্রমে আমীরুল মোমেনীন বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, তখন কাসেদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। ইনিই আল্লাহর রসূলের খলিফা। কাসেদ বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "আমীরুল মোমেনীন, আপনি পূর্বেই কেন আমাকে পরিচয় দেন নাই? তাহা হইলে তো আমাকে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে হইত না।" ওমর (রা.) বলিলেন, এই কথা বলিও না। আসল কথা বলিয়া যাও। কাসেদ বলিয়া যাইতে লাগিল, আর তিনি পূর্ববৎ উটের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া বাড়ী পৌঁছিলেন।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বসাধারণ মুসলমানকে মসজিদে নববীতে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন, "মুসলমানগণ, তোমাদের সম্পদে আমার ঠিক ততটুকু অধিকার রহিয়াছে, যতটুকু কোন এতীমের প্রতিপালকের জন্য এতীমের সম্পদে থাকে। আমার যদি সামর্থ্য থাকে, তবে তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রকার পারিশ্রমিক নিব না। যদি অসমর্থ হইয়া পড়ি, তবে কেবলমাত্র খাওয়া-পরার খরচ গ্রহণ করিব। ইহার পরও তোমরা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিও যেন অপব্যয় অথবা সঞ্চয় করিতে না পারি।", রোগে মধুর প্রয়োজন পড়িলে মসজিদে লোক সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাইসব, যদি আপনারা অনুমতি দেন, তবে বাইতুল মালের ভাণ্ডার হইতে সামান্য মধু গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করি। জনসাধারণ তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিলে পর তিনি তাহা গ্রহণ করেন।

রাত ভরিয়া তিনি নামায পড়িতেন এবং ক্রন্দন করিতে থাকিতেন। অনেক সময় ক্রন্দন করিতে করিতে দম বন্ধ হইয়া আসিত। অশ্রু বহিতে বহিতে পবিত্র চেহারায় দুটি কাল দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদা হযরত ওমর (রা.) নামায পড়াইতেছিলেন। কেরাত পড়িতে পড়িতে যখন আয়াতে পাক إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ পর্যন্ত পৌঁছিলেন, তখন হঠাৎ এমন জোরে ক্রন্দন করিতে শুরু করিলেন যে, লোকেরা অস্থির হইয়া উঠিল।

ইমাম হাসান (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা.) নামায পড়িতেছিলেন, এমতাবস্থায় إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ - مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিয়া এমনভাবে কাঁদিতে শুরু করিলেন যে, তাঁহার দুই চক্ষু লাল হইয়া গেল! কোন কোন সময় লোকের সন্দেহ হইত, হয়ত দুশ্চিন্তায় তাঁহার অন্তর ফাটিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন। কোন কোন সময় অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া যাইত যে, লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিত।

এক সাহাবী ঐ সমস্ত সৎকর্মাবলীর বিবরণ দিতেছিলেন, যাহা তিনি রসূলুল্লাহর (সা.) সঙ্গে থাকিয়া করিয়াছিলেন। শুনিতে শুনিতে অধীর হইয়া হযরত ওমর (রা.) বলিতে লাগিলেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তা শপথ, আমি মনে করি, যদি পুরস্কার কিছু নাও পাওয়া যায়, তবু অন্ততঃ আজাবের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে।

একদা রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। কি মনে করিয়া মাটি হইতে একটি তৃণখণ্ড উঠাইলেন এবং আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, পরিতাপ! আমি যদি এই তৃণ খণ্ডটির ন্যায় নগণ্য হইতাম! হায়, আমি যদি জন্মই না নিতাম! আমার মাতা যদি আমাকে প্রসবই না করিতেন! অন্য এক সময় বলিতেছিলেন, যদি আকাশবাণী হয় যে, এক ব্যক্তি ব্যতীত দুনিয়ার সকল লোকের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবু আমার ভয় দূর হইবে না। আমি মনে করিব, বোধ হয় সেই হতভাগ্য মানুষটি আমি!

এই সমস্ত চিন্তা তাঁহার জীবিকাগত অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া দিয়াছিল। তিনি রোম ও ইরান সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহার নিঃস্বতা ও উপবাস দূর হয় নাই। সাধারণ লোক পর্যন্ত উহা উপলব্ধি করিত, কিন্তু তিনি সর্বদা অম্লান বদনে আল্লাহর ইচ্ছাই মানিয়া লইতেন। একদিন তাঁহার কন্যা মুসলিম জননী হযরত হাফছা (রা.) সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, পিতা, আল্লাহ আপনাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন, আপনার পক্ষে ভাল খাবার এবং ভাল পোশাক হইতে দূরে থাকার প্রয়োজন কি? তিনি জওয়াবে বলিলেন,— বৎস, মনে হয় তুমি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দারিদ্র ও নিঃস্বতার কথা ভুলিয়া গিয়াছ। আল্লাহর শপথ, আখেরাতে আনন্দ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁহার পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিব। এই কথা বলিয়া তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দারিদ্রের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শুনিয়া শেষ পর্যন্ত হযরত হাফছা (রা.) রোদন করিতে শুরু করেন।

একবার ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) তাঁহাকে দাওয়াত করিয়াছিলেন। খাইতে বসিয়া কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখিতে পাইয়া হাত উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন, "যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ, তোমরা যদি রসূলুল্লাহর (সা.) পথ পরিত্যাগ কর, তবে বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে।

হযরত আহওয়াস (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত ওমরের সম্মুখে ঘৃতে পাক করা গোশ্‌ত দেওয়া হইল। তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, এখনই তোমরা দুই তরকারি একত্রিত করিয়া ফেলিলে। একটি ঘৃত আর একটি গোশত। একটিতে যখন খাওয়া চলিত তখন দুইটি একত্রিত করিয়া ফেলার কি প্রয়োজন ছিল?

সাহাবীগণ তাঁহার শরীরে কখনও গরম কাপড় দেখেন নাই। তাঁহার জামায় একত্রে বারটি পর্যন্ত তালি লাগাইয়াছিলেন। মাথায় ছেঁড়া জীর্ণ পাগড়ি থাকিত। ছেঁড়া ফাটা জুতা পায়ে দিতেন। এই অবস্থায় পারস্য বা রোম সম্রাটের দূতদের সাক্ষাত দান করার সময় মুসলমানগণ লজ্জিত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যাইত না।

একবার হযরত আয়েশা ও হযরত হাফছা (রা.) মিলিতভাবে বলিলেন, আমীরুল মোমেননীন, আল্লাহ আপনাকে মর্যাদা দান করিয়াছেন, বড় বড় সম্রাটের দূত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; এমতাবস্থায় আপনার জীবনযাত্রা একটু পরিবর্তিত হওয়া উচিত। জওয়াবে তিনি বলিলেন, আক্ষেপের বিষয়, তোমরা উভয়ে রসূলে খোদার (সা.) সম্মানিতা সহধর্মিনী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে দুনিয়ার প্রতি উৎসাহিত করিতেছ। তাঁহার নিকট তো একটি মাত্র কাপড় থাকিত, দিনের বেলায় তিনি তাহা বিছাইতেন, রাত্রে গায়ে দিতেন। হাফ্ছা, তোমার কি স্মরণ নাই, একদা তুমি রসূলুল্লাহর (সা.) বিছানা বদলাইয়া দিয়াছিলে আর সেই বিছানায় শুইয়া তিনি ভোর পর্যন্ত নিদ্রিত রহিলেন। নিদ্রা হইতে জাগিয়া তোমাকে বলিয়াছিলেন, হাফছা, তুমি এ কি করিলে? আমার বিছানা বদলাইয়া দিলে আর আমি সকাল পর্যন্ত ঘুমাইয়া রহিলাম। দুনিয়ার আরাম-আয়েশে আমার প্রয়োজন কি? বিছানা নরম করিয়া দিয়া তুমি কেন আমাকে অচেতন রাখিলে?

একবার জামা ছিঁড়িয়া গেলে তিনি তালির উপর তালি লাগাইতেছিলেন। হযরত হাফ্ছা (রা.) উহাতে বারণ করিলে বলিতে লাগিলেন, — হাফ্ছা, আমি মুসলমানদের সম্পদ হইতে ইহার অধিক ভোগ করিতে পারি না।

জিনিসের দর-দাম যাচাই করার জন্য কখনও কখনও তিনি বাজারে যাইতেন। তখন পথে পড়িয়া থাকা পুরাতন রশি, খেজুরের বীচি ইত্যাদি উঠাইয়া লোকের বাড়ীতে ছুঁড়িয়া দিতেন; যেন উহা পুনরায় ব্যবহার করা চলে।

একদা উৎবা ইবনে ফারকাদ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। সিদ্ধ গোশ্ত এবং শুকনা রুটি তাহার সম্মুখে দেওয়া হইয়াছিল; আর তিনি জোর করিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিতেছিলেন। উৎবা থাকিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন, আমীরুল মোমেনীন, আপনি যদি খাওয়া-পরায় আরো কিছু বেশী খরচ করেন, তবে ইহাতে মুসলিম জাতির সম্পদ মোটেই কমিয়া যাইবে না। ওমর (রা.) বলিলেন— আফসোস, তোমরা আমাকে আরামপ্রিয়তার প্রতি উৎসাহিত করিতেছ। রবী ইবনে যিয়াদ বলিলেন— আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহ আপনাকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, তাহাতে আরাম-আয়েশ অবশ্যই করিতে পারেন। এইবার তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন— "আমি জাতির আমানতদার, আমানতে খেয়ানত জায়েয আছে কি?"

খলিফা তাঁহার বিরাট পরিবারের জন্য বাইতুল মাল হইতে রোজ মাত্র দুই দেরহাম গ্রহণ করিতেন! একবার হজ্বের সফরে সর্বমোট ৮০ দেরহাম খরচ হইল। ইহাতে তিনি অনুতাপ করিতেছিলেন, আমার দ্বারা অপব্যয় হইয়া গেল। বাইতুল মালের উপর যাহাতে চাপ না আসে এই জন্য তিনি ছেঁড়া জীর্ণ কাপড়ে পর্যন্ত তালি দিতেন।

একদিন খলিফা জুমার খুৎবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে দাঁড়াইলেন। হযরত হাসান (রা.) গুনিয়া দেখিলেন, তাঁহার জামায় মোট ১২টি তালি দেওয়া রহিয়াছে। আবুল উসমান বলেন, আমি খলিফার পাজামা দেখিয়াছি, উহাতে চামড়ার তালি দেওয়া ছিল।

একবার বাহরাইন হইতে গনীমতের মাল আসিল। উহাতে মেশ্‌ক ও আম্বর ছিল। খলিফা এমন একজন দক্ষ ওজনবিশারদ খোঁজ করিতেছিলেন, যিনি অত্যন্ত নিপুণতার সহিত এই সব বণ্টন করিতে পারেন। বিবি আসিয়া নিবেদন করিলেন, আমি এই কাজ করিতে পারিব। খলিফা বলিলেন, আকেলা, আমি তোমা দ্বারা এই কাজ করাইতে পারিব না। মেশ্‌ক্ আম্বর বণ্টন করার সময় তোমার হাতে যাহা লাগিয়া থাকিবে তাহা যদি শরীরে ঘষিয়া ফেল, তবে আমাকেই উহার জবাবদিহি করিতে হইবে।

একদা দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে মাথার উপর চাদর ফেলিয়া খলিফা মদীনার বাহিরে কোথাও গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসার সময় এক ক্রীতদাসকে গাধার উপর আরোহণ করিয়া আসিতে দেখিলেন। পরিশ্রান্ত খলিফা আরোহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ক্রীতদাস গাধা হইতে নামিয়া বাহন গাধাটি তাঁহাকে দিয়া দিল। খলিফা বলিলেন, তুমি বসিয়া থাক, আমি তোমার পশ্চাতে আরোহণ করিয়া যাইতেছি। শেষ পর্যন্ত এইভাবেই তাঁহারা মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মদীনাবাসীগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিলেন, আমীরুল মোমেনীন এক ক্রীতদাসের পশ্চাতে গাধায় আরোহণ করিয়া আসিতেছেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কয়েক বারই তাঁহাকে সরকারীভাবে সফর করিতে হইয়াছে, কিন্তু কোন সময়ই তিনি তাঁবু পর্যন্ত সঙ্গে নেন নাই। বরাবরই গাছের নীচে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন এবং মাটিতে বিছানা বিছাইয়া শয়ন করিতেন। দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে বৃক্ষ শাখায় কম্বল টানাইয়া ছায়া করিয়া লইতেন।

হিজরী ১৮ সনে আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় হযরত ওমরের অস্থিরতা ছিল বেদনাদায়ক। গোশ্‌ত, ঘৃত প্রভৃতি সর্বপ্রকার ভাল ভাল খাদ্য তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার পুত্রের হাতে তরমুজ দেখিতে পাইয়া ভীষণ রাগান্বিত হইলেন। বলিতে লাগিলেন—মুসলিম জনসাধারণ অনাহারে মরিতেছে আর তুমি ফল খাইতেছ! ঘৃত ত্যাগ করিয়া জয়তুন তৈল ব্যবহারের ফলে একদিন পেটে পীড়া দেখা

দিল। তিনি পেটে আঙ্গুল রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, যে পর্যন্ত দেশে দুর্ভিক্ষ বিদ্যমান থাকে, তোমাকে ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

ইকরেমা ইবনে খালেদ বলেন, একদা মুসলমানদের এক প্রতিনিধিদল যাইয়া খলিফাকে বলিলেন, যদি আপনি একটু ভাল খাদ্য গ্রহণ করেন তবে আল্লাহর কাজে আরও শক্তি পাইবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কী তোমাদের ব্যক্তিগত ধারণা, না মুসলিম সাধারণের সম্মিলিত অভিমত? বলা হইল, ইহা মুসলিম সাধারণেরই অভিমত। তখন বলিলেন, আমি তোমাদের সমবেদনার জন্য কৃতজ্ঞ। তবে আমি আমার অগ্রগামীদ্বয়ের রাজপথ পরিত্যাগ করিতে পারি না। তাঁহাদের সান্নিধ্য আমার জন্য এখানকার আরামের চাইতে বেশী লোভনীয়!

যে সমস্ত লোক যুদ্ধের ময়দানে চলিয়া যাইতেন, খলিফা তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া খোঁজ নিতেন, প্রয়োজনীয় বাজার সওদা পর্যন্ত নিজ হাতে আনিয়া দিতেন। সৈন্যদের কোন চিঠি আসিলে স্বয়ং বাড়ী বাড়ী যাইয়া বিলাইয়া দিতেন। যাহাদের ঘরে লেখাপড়া জানা লোক থাকিত না, তাহাদের চিঠি স্বয়ং পড়িয়া দিতেন। বাড়ীর লোকেরা যে খবর দিত তাহা নিজ হাতে লিখিয়া চিঠির জওয়াব দিতেন।

হযরত তাল্‌হা (রা.)-এর বর্ণনা, একদিন প্রত্যূষে আমার ধারণা হইল, সম্মুখের কুটিরে হযরত ওমর (রা.) তশরীফ আনিয়াছেন। আবার মনে হইল, আমীরুল মোমেনীন এখানে কি করিতে আসিবেন? খবর লইয়া জানা গেল, এখানে একজন অন্ধ বৃদ্ধা বাস করেন, হযরত ওমর (রা.) প্রত্যহ তাহার খবর লওয়ার জন্য আগমন করিয়া থাকেন।

এই ছিল হযরত ওমরের নিত্যকার কর্ম তালিকা। আল্লাহর প্রতি সীমাহীন ভয়; মুসলমানদের অসীম সেবা এবং দিনরাত্রে অন্তহীন ব্যস্ততা লাগিয়াই থাকিত। তদুপরি এক রাত্রিও আরাম করিয়া শুইতেন না বা এক বেলাও তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন না। ফল এই দাঁড়াইল, তাঁহার সুঠাম দেহ দিন দিন দুর্বল হইয়া চলিল, শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। শরীর ধীরে ধীরে কৃশ হইয়া গেল। বার্ধক্যের বহু পূর্বেই বৃদ্ধের ন্যায় সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িলেন। এমতাবস্থায় অধিকাংশ সময় বলিতেন, যদি কোন ব্যক্তি খেলাফতের এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতেন, তবে খলিফা হওয়ার চাইতে বরং দেহ হইতে আমার মস্তক পৃথক করিয়া দেওয়াকেই আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতাম।

হিজরী ২৩ সনে কেরমান, সাজেস্তান, মাকরান, ইস্পাহান প্রভৃতি স্থান বিজিত হয়। তখন ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন মিসর হইতে বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল। এই বৎসরই তিনি শেষবারের মত হজ্ব করিলেন। হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে একস্থানে

প্রচুর পরিমাণ কঙ্কর একত্রিত করতঃ উহার উপর চাদর বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং উপর দিকে দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

"খোদাওয়ান্দ, এখন আমার বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজারা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন তুমি আমাকে এমনভাবে উঠাইয়া লও যেন আমার আমল বরবাদ না হয় এবং আমার বয়সের সীমা স্বাভাবিকতার গণ্ডি অতিক্রম না করে।"

শাহাদাতের পটভূমি

একদা কা'ব আল-আহ্বার খলিফাকে বলিলেন, আমি তওরাতে দেখিয়াছি, আপনি শহীদ হইবেন। খলিফা বলিলেন, এ কি করিয়া সম্ভব, আরবে থাকিয়াই আমি শহীদ হইব? সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করিলেন, "হে আল্লাহ্, আমাকে তোমার পথে শহীদ কর এবং তোমার প্রিয় রসূলের (সা.) মদীনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সুযোগ দাও।"

একদিন জুমার খুৎবায় বলিতে লাগিলেন— আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, একটি পাখী আসিয়া আমার মাথার উপর ঠোকর মারিয়াছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হইতেছে আমার মৃত্যু নিকটবর্তী। আমার জাতি দাবী করিতেছে, আমি যেন আমার স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত করিয়া যাই। স্মরণ রাখিও, আমি মৃত্যু বা খেলাফত কোনটিরই মালিক নই। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁহার দ্বীন ও খেলাফতের রক্ষক। তিনি উহা কখনও বিনষ্ট করিবেন না।

যুহরী বলেন, হযরত ওমর (রা.) নির্দেশ দিয়াছিলেন, কোন প্রাপ্তবয়স্ক মোশরেক মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই ব্যাপারে কুফার শাসনকর্তা হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন, এখানে ফিরোজ নামক এক বিচক্ষণ যুবক রহিয়াছে। সে সূত্রধর ও লৌহ শিল্পের খুব ভাল কাজ জানে। আপনি যদি তাহাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দেন, তবে সে মুসলমানদের অনেক কাজে লাগিতে পারে। হযরত ওমর (রা.) তাহাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ফিরোজ মদীনায় প্রবেশ করিয়াই খলিফার নিকট অভিযোগ করিল, হযরত মুগীরা (রা.) আমার উপর অযথা কর ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন, আপনি তাহা হ্রাস করিয়া দিন।

হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন, কত কর ধার্য করা হইয়াছে?

ফিরোজ জবাব দিল,— দৈনিক দুই দেরহাম

হযরত ওমর (রা.) বলিলেন,— তোমার পেশা কি?

ফিরোজ বলিল, — কাষ্ঠ চিত্র ও লৌহ শিল্প।

ওমর (রা.) বলিলেন,— পেশার তুলনায় এই পরিমাণ কর মোটেই অধিক নহে।

ফিরোজের পক্ষে এই উত্তর সহ্যাতীত ছিল। সে ক্রোধে অধীর হইয়া বাহির হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল— আমীরুল মোমেনীন আমি ব্যতীত আর সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করেন। কিছুদিন পর হযরত ওমর (রা.) ফিরোজকে পুনরায় ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— আমি শুনিতে পাইলাম, তুমি এমন এক প্রকার চক্র তৈয়ার করিতে পার যাহা বায়ুর সাহায্যে চলিতে পারে। ফিরোজ একটু ব্যঙ্গ করিয়া জওয়াব দিল— আমি আপনার জন্য এমন চক্র তৈয়ার করিব যাহা এখানকার লোক কখনও ভুলিবে না। ফিরোজ চলিয়া গেলে পর ওমর (রা.) বলিলেন— এই যুবক আমাকে হত্যার হুমকি দিয়া গেল।

দ্বিতীয় দিন ফিরোজ একটি দুইধারী খঞ্জর আস্তিনে লুকাইয়া প্রত্যূষে মসজিদে উপস্থিত হইল। মসজিদের কিছু লোক নামাযের কাতার ঠিক করিতে নিযুক্ত ছিলেন। নামাযের কাতার যখন ঠিক হইয়া যাইত তখনই সাধারণতঃ হযরত ওমর (রা.) তশরীফ আনিতেন এবং ইমামত করিতেন। এই দিনও তদ্রূপ হইল। কাতার ঠিক হইয়া যাওয়ার পরই ওমর (রা.) ইমামতের জন্য অগ্রসর হইলেন। নামায শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ফিরোজ আসিয়া উপর্যুপরি খড়্গ দ্বারা ছয়টি আঘাত করিল, তন্মধ্যে একটি আঘাত নাভির নীচদেশে মারাত্মকরূপে বিঁধিয়া গেল।

দুনিয়া এই মারাত্মক মুহূর্তেও খোদাভীতির এক নূতন দৃশ্য দেখিল। আহত হইয়া হযরত ওমর (রা.) যখন ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, তখন তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকে হাতে ধরিয়া ইমামের স্থানে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং সেই স্থানে পড়িয়াই কাতরাইতে লাগিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ এই অবস্থায়ই নামায পড়াইলেন। আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) সম্মুখে পড়িয়া কাতরাইতে ছিলেন। ফিরোজ আরো কয়েকজনকে আহত করিয়া শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আত্মহত্যা করিয়া ফেলিল।

আহত হযরত ওমর ফারুককে উঠাইয়া গৃহে আনা হইল। সর্বপ্রথম তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার আততায়ী কে? লোকেরা বলিল, ফিরোজ! এই কথা শুনিয়া পবিত্র চেহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখে বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর শোকর, আমি কোন মুসলমানের হাতে নিহত হইতেছি না।

লোকের ধারণা ছিল, আঘাত তত মারাত্মক নহে, হয়ত সহজেই আরোগ্য হইয়া যাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন চিকিৎসকও ডাকা হইল। চিকিৎসক খেজুরের রস এবং দুধ পান করাইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা আঘাতের স্থান দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে নৈরাশ্য দেখা দিল। সকলেই বুঝিলেন, হযরত ওমর (রা.) আর দুনিয়ায় থাকিবেন না।

এমন মনে হইতেছিল, হযরত ওমর (রা.) যেন একা আহত হন নাই, সমগ্র মদীনাবাসীই আহত হইয়াছেন, মুসলিম খেলাফত আহত হইয়া গিয়াছে। সর্বোপরি পবিত্র ইসলাম যেন আহত হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিত এবং পঞ্চমুখে তাঁহার প্রশংসাকীর্তন করিত। তিনি তখন বলিতেছিলেন, আমার নিকট যদি আজ সমগ্র দুনিয়ার স্বর্ণও মওজুদ থাকিত, তবে তাহাও কেয়ামতের ভীতি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিলাইয়া দিতাম।

খলিফা নির্বাচন সমস্যা

হযরত ফারুকে আজম (রা.) যে পর্যন্ত মুসলমানদের চোখের সম্মুখে ছিলেন, সেই পর্যন্ত তাঁহাদের অন্তরে নূতন খলিফা নির্বাচনের কোন খেয়ালই উদয় হয় নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, ইসলামের এই আদর্শ সেবকই বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া রসূলের উম্মতের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যাইবেন। হযরত ফারুক (রা.) যখন শয্যা গ্রহণ করিলেন তখনই তাহাদের অন্তরে অসহায় ভাব এবং নিদারুণ নিঃসঙ্গতা অনুভূত হইতে শুরু করিল। এই মুহূর্তে সকল মুসলমানেরই ভাবনা ছিল, অতঃপর কে মুসলিম জাতির অভিভাবক হইবেন? যত লোক খলিফাকে দেখিতে আসিতেন, সকলে একই অনুরোধ করিতেছিলেন, "আমীরুল মোমেনীন, আপনার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া যান।" খলিফা মুসলমানদের এই তাকিদ শুনিতেছিলেন এবং নিরুত্তর হইয়া ভাবিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বলিলেন, তোমরা কি চাও, মৃত্যুর পরও এই বোঝা আমার উপর ন্যস্ত থাকুক? তাহা হইতে পারে না। আমার ইচ্ছা, আমি এই সমস্যা হইতে এমনভাবে দূরে থাকি, যেন আমার পাপগুলির সহিত অর্জিত পুণ্য সমতা রক্ষা করিতে পারে।

হরত ফারুকে আজম (রা.) অবশ্য দীর্ঘকাল হইতেই খেলাফত-সমস্যার উপর চিন্তা করিতেছিলেন। লোকেরা অনেক সময় তাঁহাকে একান্তে বসিয়া ভাবিতে দেখিয়াছে। প্রশ্ন করিলে বলিতেন, আমি খেলাফতের সমস্যা নিয়া ভাবিতেছি। বার বার ভাবনার পরও তাঁহার বিচক্ষণ দৃষ্টি কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হইতেছিল না। অনেক সময়ই তাঁহার মুখ হইতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিত। বলিতেন, আফসোস! এই গুরুদায়িত্ব বহন করার মত কোন লোক যে আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

এক ব্যক্তি নিবেদন করিলেন, আপনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে কেন খলিফা নিযুক্ত করিতেছেন না? জবাবে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন। আল্লাহর শপথ, আমি কখনও তাহার নিকট এইরূপ কামনা করি নাই। আমি কি এমন এক ব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করিব, যাহার মধ্যে স্বীয় স্ত্রীকে ঠিকমত তালাক দেওয়ার যোগ্যতাও বিদ্যমান নাই।

এই প্রসঙ্গে আরো বলিলেন ঃ আমি আমার সাথীগণকে খলিফা হওয়ার লোভে নিমগ্ন দেখিতেছি। যদি আবু হোযাইফার মুক্তি দেওয়া ক্রীতদাস সালেম অথবা আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জীবিত থাকিতেন, তবে আমি তাহাদের সম্পর্কে কিছু বলিয়া যাইতে পারিতাম। এই উক্তি হইতে মনে হয়, খেলাফতের সমস্যা হইতে দূরে থাকিয়াই তিনি দুনিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিতেন, কিন্তু মুসলমানদের তাকিদ দিন দিনই বর্ধিত হইতেছিল। শেষে তিনি বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পর ওসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস তিন দিনের মধ্যে যাঁহাকে নির্বাচিত করিবেন, তাঁহাকেই যেন খলিফা নিযুক্ত করা হয়।"

আখেরাতের প্রস্তুতি

শেষ মুহূর্তে তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে ডাকিয়া বলিলেন, আবদুল্লাহ, হিসাব করিয়া দেখ আমার উপর কি পরিমাণ ঋণ রহিয়াছে। হিসাব করিয়া বলা হইল, ৮৬ হাজার দেরহাম। বলিলেন, এই ঋণ আমার পরিবারের সম্পত্তি দ্বারা পরিশোধ করিয়া দিও। যদি সম্পত্তিতে না কুলায় তবে 'আদি' গোত্র হইতে সাহায্য গ্রহণ করিও। যদি তাহাতেও না হয় তবে কোরায়শ গোত্র হইতে সাহায্য চাহিও।

হযরত ওমরের জনৈক ক্রীতদাস নাফে (র.) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহার উপর ঋণ কেন থাকিবে? মৃত্যুর পর তাঁহার এক এক উত্তরাধিকারী এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ওমরের একটি গৃহ হযরত আমির মোয়াবিয়ার নিকট বিক্রয় করিয়া তাঁহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছিল। ঋণ পরিশোধের পর বলিলেন, তুমি এখনই মুসলিম জননী হযরত আয়েশার নিকট যাও এবং তাঁহার নিকট আবেদন জানাও, ওমর তাঁহার পূর্ববর্তী দুই বন্ধুর নিকট সমাহিত হইতে চাহে। তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হউক। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) খলিফার এই আবেদন হযরত আয়েশার নিকট পৌছাইলেন। আয়েশা (রা.) সমবেদনায় বিগলিত হইয়া বলিলেন, এই স্থান আমি নিজের জন্য রক্ষিত রাখিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আমি ওমরকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেছি। পুত্র যখন তাঁহাকে হযরত আয়েশার মঞ্জুরীর খবর শুনাইলেন, তখন নিতান্ত খুশী হইয়া এই শেষ আরজু পূর্ণ হওয়ার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

তখন হইতে মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হইল। এই অবস্থায়ই লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন— যে ব্যক্তি অতঃপর খলিফা নির্বাচিত হইবেন, তাঁহাকে পাঁচটি দলের অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহারা হইতেছেন ঃ মোহাজের,

আনসার, বেদুঈন, যে সমস্ত আরব অন্যান্য স্থানে যাইয়া বসবাস শুরু করিয়াছেন এবং যিম্মী প্রজা। তৎপর প্রত্যেক দলের অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। যিম্মী বা সংখ্যালঘু প্রজাদের সম্পর্কে বলিলেন, "আমি পরবর্তী খলিফাকে অসিয়ত করিয়া যাইতেছি, তিনি যেন আল্লাহর রসূলের যিম্মার মর্যাদা রক্ষা করেন। যিম্মীদের সঙ্গে কৃত সমস্ত অঙ্গীকার যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। তাহাদের শত্রুদের যেন দমন করা হয় এবং তাহাদের সাধ্যাতীত কোন কষ্ট যেন না দেওয়া হয়।"

মৃত্যুর সামান্য পূর্বে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে বলিলেন, আমার কাফনে যেন কোন প্রকার আড়ম্বর করা না হয়। আমি যদি আল্লাহর নিকট ভাল বলিয়া বিবেচিত হই তবে ভাল পোশাক এমনিতেই পাইব। আর যদি মন্দ বিবেচিত হই তবে ভাল কাফন কোন কাজে আসিবে না।

পুনরায় বলিলেন, "আমার জন্য যেন দীর্ঘ ও প্রশস্ত কবর খনন করা না হয়। কারণ, আল্লাহর নিকট যদি আমি অনুগ্রহপ্রাপ্তির যোগ্য হই, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই আমার কবর বিস্তৃত হইয়া যাইবে। আর যদি অনুগ্রহপ্রাপ্তির যোগ্য না হই, তবে কবরের বিস্তৃতি আমাকে শাস্তির সংকীর্ণতা হইতে কিছুতেই মুক্তি দিতে সক্ষম হইবে না। আমার জানাযার সহিত যেন কোন নারী গমন না করে, কোন প্রকার অতিরঞ্জিত গুণাবলী দ্বারাও যেন আমাকে স্মরণ করা না হয়। জানাযা প্রস্তুত হইয়া যাওয়ার পর যথাসম্ভব শীঘ্র যেন আমাকে কবরে রাখিয়া দেওয়া হয়। আমি যদি রহমত পাওয়ার যোগ্য হই, তবে আমাকে আল্লাহর রহমতের মধ্যে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি প্রেরণ করাই উচিত হইবে। আর যদি আযাবের যোগ্য হই, তবুও একটি মন্দ লোকের বোঝা যতশীঘ্র নিক্ষেপ করা যায় ততই মঙ্গল।" এই বেদনাময় অসিয়তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শেষ মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এটা ২৩ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসের একেবারের শেষ দিকের ঘটনা। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর। হযরত সোয়াওয়াব জানাযার নামায পড়ান। হযরত আবদুর রহমান, ওসমান, হযরত তালহা, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) মুসলিম জাহানের এ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পার্শ্বে চিরনিদ্রায় শোয়াইয়া দেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

হযরত ওমর ফারুকের শাহাদাত মুসলমানদের হৃদয়ে যে বেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। প্রত্যেক মুসলমান প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের এই মহান নেতার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। হযরত উম্মে আয়মান (রা.) বলেন,— "যেই দিন হযরত ওমর (রা.) শহীদ হইলেন, সেই দিন হইতেই ইসলাম দুর্বল হইয়া গিয়াছে।"

হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন,— "হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর

(রা.) যেন ইসলামের পিতামাতা ছিলেন,— তাঁহাদের বিদায় হইয়া যাওয়ার পর ইসলাম যেন এতীম হইয়া গেল। আল্লাহ বলেন,— তাঁহারা মরিয়া যান নাই, বরং জীবিত আছেন এবং সর্বদা জীবিত থাকিবেন।"

হযরত ওস্মানের শাহাদাত

ইসলামের ইতিহাসে অন্তর্বিরোধের একটি কলঙ্কজনক রেখা ফুটিয়া রহিয়াছে। এই রেখার সূত্রপাত সর্বপ্রথম হযরত ওসমানের রক্ত দ্বারা ঘটিয়াছে এবং এর ফলে ইসলামের পূর্ণ মর্যাদা চিরকালের জন্য সমাহিত হইয়া যায়।

হযরত ওসমানের শাহাদাতের মূল ভিত্তি হইতেছে, কোরায়শ গোত্রের বনী হাশেম ও বনী উমাইয়ার বংশগত বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের পূর্ণ ব্যাখ্যা করা ছাড়া তাঁহার শাহাদাতের উপর পূর্ণ আলোকপাত সম্ভব নহে। এই জন্য সর্বপ্রথম আমরা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ আবদুল মানাফের ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার চারি পুত্র ছিলেন ঃ নওফাল, মোত্তালেব, হাশেম ও আবদুশ শামস। বনী হাশেম ও বনী উমাইয়ার পারস্পরিক বিদ্বেষের অর্থ হইতেছে হাশেম ও আবদুশ শামসের সন্তানদের পারস্পরিক অনৈক্য।

হাশেম যদিও আবদুশ্ শামসের ছোট ছিলেন, তথাপি যোগ্যতা ও দানশীলতার জন্য গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি রোম সম্রাট ও হাবশার নরপতি নাজ্জাশীর সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কাবা গৃহের সব দায়িত্বও প্রাপ্ত হন। হাশেমের এই উন্নতি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুশ শামসের পুত্র উমাইয়া ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। এক সময় তিনি পিতৃব্য হাশেমের সহিত যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন। যুদ্ধের শর্ত ছিল, পিতৃব্য হাশেম ও ভ্রাতুষ্পুত্র উমাইয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম বিতর্ক হইবে। খোজাআ গোত্রের জনৈক গণক ব্যক্তি বিতর্কের রায় প্রদান করিবেন। যিনি পরাজিত হইবেন তাঁহাকে বিজয়ী ব্যক্তিকে পঞ্চাশটি কৃষ্ণ চক্ষুবিশিষ্ট উষ্ট্র প্রদান করিতে হইবে এবং দশ বৎসর নির্বাসিত জীবন যাপন করিতে হইবে।

রসূলে খোদার (সা.) যুগে

রসূলে খোদার (সা.) নবুওয়তপ্রাপ্তির সময় পাঁচ ব্যক্তি বনী হাশেমের প্রধান ছিলেন। হাশেমের পুত্র আবদুল মোত্তালেব, অর্থাৎ রসূলে খোদার (সা.) পিতামহ, তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেব, হামযা, আব্বাস ও আবু লাহাব। সমসাময়িক বনী উমাইয়া গোত্রের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তিন ব্যক্তি, আবু সুফিয়ান, আফ্ফান ও হাকাম।

হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওয়তপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। যেহেতু তিনি বনী হাশেমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই জন্য বনী উমাইয়া গোত্রীয়গণ বংশগত বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া প্রথমাবস্থায়ই তাঁহার বিরোধিতা শুরু করে, আর তাহাদের প্রতিপক্ষ বনী হাশেম তাঁহার সহযোগিতা করে। পিতামহ আবদুল মোত্তালে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে লালন-পালন করিয়াছিলেন। পিতৃব্য আ তালেব তাঁহার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হযরত আলী (রা. সর্বপ্রথম তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছিলেন। পিতৃব্য হযরত হামযা (রা.)ও অল্প দি পরই তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন এবং বিশেষভাবে সহায়তা করিতে থাকেন তাঁহার অন্য পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) যদিও দেরীতে ঈমান আনিয়াছিলেন, তথাপি সর্বাবস্থায়ই তিনি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিশেষ সহায়তা করিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বনী হাশেমের একমাত্র আবু লাহাবই রসূলে খোদার সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া হযরত আব্বাস, হযরত হামযা, হযরত আবু তালেব, হযরত আলী, হযরত আকিল (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট হাশেমীগণ প্রায় সকলেই ঈমান আনিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই আল্লাহর রসূলের পিতৃব্য অথবা পিতৃব্যপুত্র ছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঐ সময় তিন ব্যক্তি বনী উমাইয়া গোত্রের নেতৃত্ব করিতেছিলেন। আবু সুফিয়ান, আফ্ফান ও হাকাম। ইহাদের পর ইহাদের সন্তানগণই গোত্রের নেতৃত্ব প্রাপ্ত হন। ইহারা ছিলেন আবু সুফিয়ানের পুত্র আমির মোয়াবিয়া, আফ্ফানের পুত্র হযরত ওসমান এবং হাকামের পুত্র মারওয়ান। আফ্ফানের পুত্র হযরত ওসমান প্রথমাবস্থায়ই ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট প্রায় সকলেই মোটামুটিভাবে রসূলে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শত্রুতা করিতে থাকেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য, আমির মোয়াবিয়া, হযরত ওসমান এবং মারওয়ান– এই তিন জনই উমাইয়ার প্রপৌত্র। হযরত ওসমানের শাহাদাতের কারণ সাধারণভাবে এই তিন জনের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বনী উমাইয়া ও হাশেমের বংশতালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, উমাইয়া হাশেমের সহিত সংঘর্ষ করিয়াছেন, আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, আমির মোয়াবিয়া ও হযরত আলীর মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে, ইয়াজিদ হযরত ইমাম হোসাইনকে শহীদ করিয়াছেন। আবু সুফিয়ানের সন্তানদের মধ্য হইতে বনী উমাইয়ার খেলাফত শুরু হয়, যাহা হযরত আব্বাসের সন্তানগণ আব্বাসিয়া খেলাফত কায়েম করিয়া উৎখাত করেন।

উপরে বলা হইয়াছে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কার জীবনে বনী হাশেম সাধারণতঃ তাঁহার সহযোগিতা এবং বনী উমাইয়া তাঁহার শত্রুতা করিয়াছে। এই অবস্থাতেই হযরত ওসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ঘোর শত্রুতার মধ্যে ওসমানের পক্ষে উমাইয়া শিবির ত্যাগ করিয়া হাশেমী শিবিরে যোগদান করা বিশেষ সত্যপ্রীতি ও সাহসিকতার ব্যাপার ছিল। এই ব্যাপারটাই হযরত ওসমানের মর্যাদা ও ঈমানের দৃঢ়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার কিছুকাল পর বনী উমাইয়ার অন্যান্য লোকও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইহাদের এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহাতে বনী হাশেম ও বনী উমাইয়া গোত্রের দীর্ঘকালের শত্রুতা মুছিয়া গিয়াছিল। ইসলামের ছায়াতলে আসিয়া বনী হাশেম ও বনী উমাইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং পরস্পরে প্রতিযোগিতা করিয়া ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

হযরত ওসমানের নির্বাচন

মানবতার নবীর বিদায়ের পর হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। এই সময়টা বিশেষ শান্তির সহিত অতিবাহিত হয়। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁহার যমানাও সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়। হিজরী ২৩ সনে যিলহজ্জ মাসের একেবারে শেষের দিকে হযরত ওমর ফারুক (রা.) ইন্তেকাল করেন এবং অসিয়ত করিয়া যান, হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত যুবাইর, হযরত তালহা, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ— এই ছয় ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে কাহাকেও খলিফা নির্বাচিত করিবেন। উক্ত ছয় ব্যক্তির মধ্যে দুই দিন বিতর্ক চলিল, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হইল না। তৃতীয় দিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) প্রস্তাব করিলেন, আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি যদি এক একজনের পক্ষে দাবী ত্যাগ করি, যাহাতে ছয়ের বিতর্ক তিনের মধ্যে চলিয়া আসে, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ সুবিধা হইবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী হযরত যুবাইর হযরত আলীর পক্ষে, হযরত তালহা হযরত ওসমানের পক্ষে এবং হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের পক্ষে দাবী পরিত্যাগ করিলেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলিলেন, আমি স্বয়ং খেলাফতের দাবী ত্যাগ করিতেছি। অতঃপর বিতর্ক হযরত ও ওসমান হযরত আলীর মধ্যে আসিয়া সীমাবদ্ধ হইল। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) যেহেতু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া দাবী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই জন্য অবশিষ্ট উভয়ে মিলিয়া তাঁহার উপরই মীমাংসার দায়িত্ব

অর্পণ করিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) সাহাবীগণকে মসজিদে সমবেত করিয়া সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন এবং খেলাফতের জন্য হযরত ওসমানের নাম প্রস্তাব করিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই হযরত ওসমানের হাতে বায়আত করিলেন। অতঃপর হযরত আলীও বায়আত করিয়া ফেলিলেন। এরপর জনসাধারণ বায়আতের জন্য আগাইয়া আসিল। এইভাবে বনী উমাইয়ারই একজন সম্মানিত ব্যক্তি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খলিফা নির্বাচিত হইলেন। ইহা ২৪ হিজরী সনের ৪ঠা মহররমের ঘটনা।

প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি

হযরত ওসমানের খেলাফতের প্রথম ছয় বৎসর নিতান্ত শান্তির সহিতই অতিবাহিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ছয় বৎসরে যেন দুনিয়ার পরিবেশই পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ ছিল, সাহাবায়ে কেরামের যে পবিত্র জামাত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোবারক সাহচর্য হইতে ঐক্য ও জীবনদর্শনের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া যাইতেছিলেন। পরবর্তী যে জনমণ্ডলী এই মহান জামাতের উত্তরাধিকার লাভ করিতেছিলেন, আত্মত্যাগ ও খোদাভীরুতার দিক দিয়া তাঁহারা পূর্বর্তীদের সার্থক উত্তরাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল— তাঁহাদের জীবন-মরণ নিবেদিত ছিল একমাত্র আল্লাহর জন্য। যেহেতু তাঁহারা স্বার্থবুদ্ধির উর্ধ্বে ছিলেন, এই জন্য কোন প্রকার অন্তর্বিরোধ ও মনকষাকষি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যাঁহারা ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ততটুকু নিষ্ঠাবান ও স্বার্থহীন ছিলেন না। ফলে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের প্রশ্নে সংঘাত স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিতে থাকে। যাঁহার অন্তরে তওহীদের জ্যোতি যত অধিক হয় ততই তিনি স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা ও মোনাফেকী হইতে দূরে থাকিতে সমর্থন হন। যে সমস্ত লোক এই সমস্ত গ্লানি ও বিচ্যুতি হইতে যত বেশী পবিত্র হইবেন তাঁহারা পরস্পর তত বেশী ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু তওহীদের জ্যোতি যতই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে শুরু করে, ততই স্বার্থ ও সংঘাত-বুদ্ধি আসিয়া সেই স্থান পূরণ করিতে শুরু করে। ফলে পরস্পরের আন্তরিক ঐক্য বিনষ্ট হইতে থাকে। এই আন্তরিক ঐক্য বিনষ্টের পরিণতিস্বরূপই ইসলামী খেলাফতের মজবুত দুর্গ অল্প দিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

হযরত ওসমানের যুগে নিম্নোক্ত তিন প্রকার মতবিরোধ সৃষ্টি হয় ঃ

(ক) বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের মধ্যে মতবিরোধ

হাশেমীগণ নিজেদের রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী মনে করিতেন। পূর্ববর্তী গোত্রীয় অনৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রসূলের খেলাফত

তাহাদের গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বী উমাইয়া বংশের কাহারো অধীন হউক, উহা তাঁহারা মনে-প্রাণে মানিয়া লইতে পারিতেছিলেন না।

(খ) কোরায়শ ও অ-কোরায়শদের মধ্যে অনৈক্য

মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বিপুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়া গিয়াছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতির ব্যাপারে কোরায়শদের সঙ্গে সঙ্গে আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকও সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য অ-কোরায়শগণ ইহা চাহিতেন না, নেতৃত্বের মুকুট কেবলমাত্র কোরায়শগণের মস্তকেই শোভিত হউক।

(গ) আরব-অনারবে অনৈক্য

ইসলামের জ্যোতি আরবের বাহিরে সিরিয়া, গ্রীস ও মিসর পর্যন্ত যাইয়া পৌছিয়াছিল। ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নি-উপাসক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের অগণিত লোক ইসলামে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছিলেন। ইসলামী ঐক্যের ভিত্তিতে তাঁহারাও অধিকারের ক্ষেত্রে নিজ দিগকে আরবদের সমঅধিকারী বলিয়া দাবী করিতেন। আরবদের একচ্ছত্র অধিকার তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। এক কথায়, বনী হাশেমের অন্তর বনী উমাইয়ার সহিত একত্রিত হইতেছিল না। আরবের সাধারণ অধিবাসী কোরায়শদের আর অনারব জাতিগুলি আরবদের আধিপত্য বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেছিল না। এইভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, অনৈক্য ও শত্রুতার বীজ ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া যাইতেছিল।

(ঘ) ধ্বংসাত্মক শক্তির সংগঠন

সর্বপ্রথম কুফায় ধ্বংসাত্মক শক্তি দানা বাঁধিয়া উঠে। আশ্‌তার নাখয়ী নামক জনৈক অনারব প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রচার শুরু করেন, ইসলামী বিধানমতে মুষ্টিমেয় কোরায়শের পক্ষে সমগ্র মুসলিম জাতিকে পদানত রাখার কোন অধিকার নাই। সাধারণ মুসলমানগণ সকলে মিলিয়া রাজ্য জয় করিয়াছেন, এই জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক মুসলিমের নেতৃত্ব করার অধিকার রহিয়াছে। অনারবগণ আশ্‌তার নাখয়ীর এই মতবাদ অতি সহজেই গ্রহণ করিতে শুরু করে। ইহাদের প্রচেষ্টায় একটি ষড়যন্ত্রকারী দল গড়িয়া উঠে। উহারা কুফার শাসনকর্তা সায়ীদ ইবনুল আস (রা.)-এর বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার শুরু করে। সায়ীদ ইবনুল আস অপপ্রচারকারীগণকে দমন করার জন্য হযরত ওসমানের অনুমতিক্রমে উহাদের দশ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। ইহার ফলে বসরায়ও একটি বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠে। কুফা ও বসরায় আশ্‌তার নাখয়ী যে কাজ শুরু করিয়াছিল, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা পূর্বেই মিসরে তাহা শুরু করিয়া দিয়াছিল। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা

জনৈক নও মুসলিম, যে পূর্বে ছিল ইহুদী। বসরা ও কুফার বিপ্লবীদের কথা জানিতে পারিয়া সে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অল্প দিনের মধ্যে সে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক শক্তির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতঃ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হযরত ওসমানকে খেলাফতের পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া বনী উমাইয়ার শক্তি চিরতরে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হউক। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা চারিদিকে অতি দ্রুততার সহিত তাহার প্রচারক দল প্রেরণ করিয়া দিল। তাহার প্রচারকরা বাহ্যিক ধার্মিকতার বেশ ধরিয়া প্রথমে সাধারণ মুসলমানদের আস্থা অর্জন করিত। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.)ও তাঁহার শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অপপ্রচার করিয়া সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করিয়া তুলিত। তাহারা ইসলামের দোহাই দিয়া সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে খলিফার প্রতি সম্ভ্রমবোধ শিথিল করিয়া দিয়াছিল।

বিপ্লবী প্রচারণা এতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিল যে, মোহাম্মদ ইবনে আবু হোযাইফা এবং মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের ন্যায় লোক পর্যন্ত অপপ্রচারকারীদের দলে ভিড়িয়া পড়িলেন। পরিস্থিতি এই পর্যন্ত আসিয়া গড়াইল যে, খোদ মদীনার অবস্থাও বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইতে শুরু করিল। একদিন হযরত ওসমান (রা.) জুমার খুৎবা দিতে দাঁড়াইয়া আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল,— ওসমান, আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করিয়া চল। হযরত ওসমান (রা.) নিতান্ত নম্রভাবে বলিলেন, আপনি বসিয়া পড়ুন, কিন্তু লোকটি খুৎবার ভিতরে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিল। হযরত ওসমান (রা.) তাহাকে পুনরায় বসিয়া পড়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে বসিয়া পড়িল এবং আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। ধৈর্য ও নম্রতার প্রতিমূর্তি হযরত ওসমান (রা.) তাহাতেও উত্তেজিত হইলেন না। নিতান্ত নম্রভাবে বলিলেন, আপনি বসিয়া পড়ুন এবং খুৎবা শুনুন, কিন্তু যেহেতু এইসব একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে করা হইয়াছিল, এজন্য এইবার লোকটির বিরাট একদল সমর্থক উঠিয়া দাঁড়াইয়া হযরত উসমানকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং এমন নির্মমভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, আল্লাহর রসূলের খলিফা আঘাতে জর্জরিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন, কিন্তু হযরত ওসমানের কি অপরিসীম ধৈর্য, তিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদিগকে কিছুই বলিলেন না; বরং সবাইকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অপবাদ

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের তরফ হইতে হযরত ওসমানের উপর পাঁচটি বিশেষ অপবাদ আরোপ করা হয়। যথা—

(১) তিনি বিশিষ্ট সাহাবীগণকে রাখিয়া নিজের অযোগ্য আত্মীয়-স্বজনদের রাষ্ট্রের

গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছেন।

(২) তিনি তাঁহার আপন লোকদের মধ্যে বায়তুল মালের অর্থ বন্টন করিতেছেন।

(৩) তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) কর্তৃক লিখিত কোরআন ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত কপি জ্বালাইয়া দিয়াছেন।

(৪) তিনি কতিপয় সাহাবাকে অপদস্থ করিয়াছেন এবং কতিপয় নূতন নূতন বেদআতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৫) মিসর হইতে আগত প্রতিনিধিদলের সহিত প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।

উপরোক্ত অভিযোগগুলি ছিল সম্পূর্ণরূপে ষড়যন্ত্রপ্রসূত। যথা—

(১) সাহাবীগণের সরকারী দায়িত্ব হইতে পদচ্যুতি ছিল নিতান্তই শাসনতান্ত্রিক ব্যাপার।

(২) আপন লোকদিগকে তিনি যাহা কিছু দিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে দেওয়া হইয়াছিল।

(৩) তিনি কোরআনের যে কপি সংরক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহা হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত ছিল। সুতরাং ইহার চাইতে নির্ভুল কপি আর কি হইতে পারে?

(৪) যে সমস্ত বেদআতের কথা বলা হইত, তাহা সম্পূর্ণই ইজতেহাদী ব্যাপার। সুতরাং এইগুলিকে বেদআত কিছুতেই বলা চলে না।

(৫) মিসরীয় প্রতিনিধিদলের বিবরণ আমরা পরে দিতেছি।

শাসনকর্তাদের সম্মেলন

হযরত ওসমান (রা.) রাষ্ট্রব্যাপী ধ্বংসাত্মক শক্তির ব্যাপক অভ্যুদয়ের কথা জানিতে পারিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। সম্মেলনে তাঁহাকে নিম্নোক্ত পরামর্শ দেওয়া হইল।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ঃ কোন দেশে সৈন্য প্রেরণ করতঃ লোকদিগকে জেহাদে নিয়োজিত করিয়া দেওয়া হউক। ইহাতে বিশৃঙ্খলা আপনা হইতেই দূর হইয়া যাইবে।

আমির মোয়াবিয়া ঃ প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্তা নিজ নিজ প্রদেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

আমর ইবনুল আস ঃ আপনি সুবিচার করুন, অন্যথায় খেলাফত হইতে পদত্যাগ করুন, কিন্তু সম্মেলন শেষে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত ওসমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিলেন, আমি বিদ্রোহীদের আস্থা অর্জন করার জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন হইতে আমি উহাদের গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে

আপনাকে অবহিত করিতে থাকিব। সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পর হযরত ওসমান (রা.) সবদিক বিবেচনা করতঃ তিনটি কর্মপন্থা গ্রহণ করিলেন।

(১) কূফার শাসনকর্তা সাদ ইবনুল আসকে পদচ্যুত করিয়া তদস্থলে হযরত আবু মূসা আশ্‌আরীকে নিযুক্ত করিলেন।

(২) প্রত্যেক প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন প্রেরণ করিলেন।

(৩) সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন, হজ্বের সময় প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অভিযোগ পেশ করিবেন, ঐগুলির যথাযোগ্য প্রতিকার করা হইবে।

বিদ্রোহীদের মদীনা আক্রমণ

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা সংস্কার চাহিত না। এই জন্য হযরত ওসমান (রা.) যখন শাসন-ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারে হাত দিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে উহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া মদীনার দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করিল। পথে উহারা নিজদিগকে হজ্বযাত্রী বলিয়া পরিচয় দিতেছিল। মদীনার নিকটবর্তী হইয়াই উহারা সৈনিকের বেশ ধারণ করতঃ বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করিল। বিদ্রোহীদের খবর পাইয়া হযরত ওসমান (রা.) হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত আলীকে একে একে প্রেরণ করতঃ বিদ্রোহীদিগকে নিজ নিজ এলাকায় ফিরিয়া যাওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি তাহাদিগকে নিশ্চয়তা দিলেন, তাহাদের প্রত্যেকটি সঙ্গত দাবী-দাওয়া পূরণ করা হইবে। পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য মসজিদে সভা আহ্বান করা হইল। তাল্‌হা ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) দাঁড়াইয়া খলিফার সহিত কঠোর ভাষায় কথোপকথন করিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকার তরফ হইতে পয়গাম আসিল, আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহর মত ব্যক্তি, যাহার উপর সাহাবী হত্যার অভিযোগ রহিয়াছে, তাহাকে আপনি কেন মিসরের শাসনকর্তৃত্বের পদ হইতে অপসারণ করিতেছেন না। হযরত আলীও এই মত সমর্থন করিলে খলিফা বলিলেন, মিসরের বিক্ষোভকারীরা স্বয়ং তাহাদের শাসনকর্তা নির্বাচিত করুক, আমি তাহাকেই আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি সারাহর স্থানে নিযুক্ত করিব। বিদ্রোহীদের পক্ষ হইতে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের নাম প্রস্তাব করা হইল। হযরত ওসমান (রা.) তৎক্ষণাৎ তাঁহার নামে ফরমান লিখিয়া দিলেন। মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর কিছু সংখ্যক মোহাজের ও আনসারকে সঙ্গে লইয়া মিসরের পথে রওয়ানা হইয়া গেলেন। ব্যাপারটা তখনকার মত এখানেই মিটিয়া গেল।

এই ঘটনার কিছু দিন পর আবার প্রচারিত হইল, বিদ্রোহীরা পুনরায় মদীনায় প্রবেশ করিয়াছে। মুসলমানগণ বাহির হইয়া দেখিলেন, মদীনার অলিতে-গলিতে 'প্রতিশোধ'

'প্রতিশোধ' রব উঠিয়াছে। মদীনাবাসীগণ বিদ্রোহীদের নিকট এইরূপ আশ্চর্যজনক প্রত্যাবর্তনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর তাহারা হযরত ওসমানের উপর এমন অদ্ভুত অভিযোগ উত্থাপন করিল যে, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহারা বলিতে লাগিল, মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের কাফেলা তৃতীয় মঞ্জিলে পৌঁছিলে পর দেখা গেল, জনৈক সরকারী উষ্ট্রারোহী দ্রুত মিসরের দিকে গমন করিতেছে। মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের সঙ্গীগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহারা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে এবং কোথায় যাইতেছ? উত্তরে লোকটি বলল, আমি আমীরুল মোমেনীনের ক্রীতদাস, মিসরের শাসনকর্তার নিকট গমন করিতেছি। লোকেরা মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি মিসরের শাসনকর্তা। লোকটি বলিল, ইনি নন, এই বলিয়া সে পুনরায় চলিতে শুরু করিল। লোকেরা তাহাকে পুনরায় ধরিয়া ফেলিল এবং তল্লাশি লইলে একটি পত্র পাওয়া গেল। পত্রটিতে হযরত ওসমানের সীলমোহর লাগানো ছিল এবং লেখা ছিল— "মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর ও তাহার সহিত অমুক অমুক যখনই তোমার নিকট পৌঁছিবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিবে এবং প্রত্যেক অভিযোগকারীকে দ্বিতীয় নির্দেশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বন্দী করিয়া রাখিবে।"

বিদ্রোহীরা বলিতে লাগিল, হযরত ওসমান (রা.) আমাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। আমরা উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। হযরত আলী, হযরত তাল্হা, হযরত যুবাইর, হযরত সাদ (রা.) প্রমুখ অনেক সাহাবী সমবেত হইলেন। বিদ্রোহীগণ হযরত উসমানের বলিয়া কথিত পত্রটি তাহাদের সম্মুখে রাখিল। হযরত ওসমান (রা.)-ও তথায় গমন করিলেন এবং কথাবার্তা শুরু হইল।

হযরত আলী (রা.) বলিলেন ঃ আমীরুল মোমেনীন, এই গোলাম কি আপনার?

হযরত ওসমান (রা.) বলিলেন ঃ হ্যাঁ আমার।

হযরত আলী (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এই উষ্ট্রীও কি আপনার?

হযরত ওসমান (রা.) জওয়াব দিলেন ঃ হ্যাঁ আমারই।

হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ পত্রে অংকিত এই সীলমোহর কি আপনার?

হযরত ওসমান (রা.) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, সীলমোহরও আমারই।

হযরত আলী (রা.) বলিলেন ঃ এই পত্রও কি আপনি লিখিয়াছেন?

হযরত ওসমান (রা.) জওয়াব দিলেন ঃ আমি আল্লাহকে উপস্থিত জানিয়া এই শপথ করিতেছি, এই পত্র আমি নিজে লিখি নাই, অন্য কাহাকেও লিখার নির্দেশ দেই নাই, এমনকি এই সম্পর্কে আমি কিছু জানিও না।

হযরত আলী (রা.) বলিলেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, পত্রবাহক গোলাম আপনার, বাহনের উষ্ট্রী আপনার, পত্রে অংকিত সীলমোহরও আপনার। অথচ আপনি পত্রের মর্ম সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

হযরত ওসমান (রা.) বলিলেন, আল্লাহর শপথ, আমি নিজে এই পত্র লিখি নাই,

কাহাকেও লিখিতেও বলি নাই, উহা মিসরে প্রেরণ করিতেও বলি নাই।

পত্রের লিপি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, উহা মারওয়ানের হস্তাক্ষর। এই সময় মারওয়ান হযরত ওসমানের গৃহে অবস্থান করিতেছিল। লোকেরা দাবী তুলিল, আপনি মারওয়ানকে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিন, কিন্তু হযরত ওসমান (রা.) তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে করিয়া হাঙ্গামা শুরু হইয়া গেল। অধিকাংশ লোকের ধারণা হইল, হযরত ওসমান (রা.) কখনও মিথ্যা শপথ করিতে পারেন না। প্রকৃতই তিনি এই সম্পর্কে কিছু জানেন না, কিন্তু কেহ কেহ বলিতে লাগিল, তিনি মারওয়ানকে আমাদের হাতে কেন ছাড়িয়া দিতেছেন না? আমরা অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিয়া লইব। যদি মারওয়ান অপরাধী প্রমাণিত হয়, তবে তিনি উহার শাস্তি ভোগ করিবেন। হযরত ওসমানের ধারণা ছিল, মারওয়ানকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলিয়া দিলে উহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। এই জন্য তিনি মারওয়ানকে তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন।

ইহার পর বিদ্রোহীরা হযরত ওসমানের গৃহ অবরোধ করিয়া খেলাফত হইতে তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিতে লাগিল। হযরত ওসমান (রা.) জওয়াব দিলেন, যে পর্যন্ত আমার শেষ নিঃশ্বাস অবশিষ্ট থাকে, আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত এই মর্যাদা ত্যাগ করিতে পারি না। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিয়া যাইব।

দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরিয়া অবরোধ চলিল! খলিফার গৃহে খাদ্য পানীয় সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বিদ্রোহীদের ধৃষ্টতা তখন এমন চরমে উঠিয়াছিল যে, বিশিষ্ট সাহাবীগণকে পর্যন্ত তাহারা তোয়াক্কা করিত না। একদিন মুসলিম জননী হযরত উম্মে সালামা (রা.) কিছু খাদ্য পানীয় লইয়া রওনা হইলে হতভাগারা তাঁহাকে পর্যন্ত বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিল।

হযরত ওসমান (রা.) হযরত আলীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁহাকে গৃহ প্রবেশের অনুমতি দিল না। হযরত আলী (রা.) মাথার পাগড়ি খুলিয়া খলিফার নিকট প্রেরণ করতঃ খালি মাথায় ফিরিয়া আসিলেন, যাহাতে খলিফা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।

মদীনার সকল কাজকর্ম হযরত আলী, হযরত তাল্হা ও যুবাইরের দায়িত্বে ন্যস্ত থাকিত, কিন্তু এই বেদনাময় হাঙ্গামায় তাঁহাদের সকল আওয়াজও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। খলিফার গৃহে অবরুদ্ধদের অবস্থা যখন শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন হযরত ওসমান (রা.) স্বয়ং গৃহের ছাদে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন— "তোমাদের মধ্যে কি আলী রহিয়াছেন?" লোকেরা বলিল, না। পুনরায় বলিলেন, "এই জনতার মধ্যে সাদ রহিয়াছে কি?" লোকেরা উত্তর করিল, না, তিনিও নাই। এইবার তিনি একটু দমিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ ভাবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি— যে আলীর নিকট

যাইয়া বলিবে যেন এখানকার পিপাসার্তদের পানি পান করাইবার ব্যবস্থা করেন!" এক ব্যক্তি নায়েবে রসূলের এই বেদনা-বিধুর আবেদন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া হযরত আলীর নিকট এই পয়গাম পৌছাইলে পর তিনি তিন মশক পানি প্রেরণ করিলেন। এই পানি এমন সাধ্য-সাধনার পর পৌছানো হইল যে, ইহাতে বনী হাশেম ও বনী উমাইয়া গোত্রের কয়েকজন গোলামকে শোচনীয়রূপে আহত হইতে হইল। এইবার মদীনাব্যাপী খবর প্রচারিত হইল, মারওয়ানকে যদি বিদ্রোহীদের হাতে সমর্পণ করা না হয় তবে হযরত ওসমানকে হত্যা করিয়া ফেলা হইবে। এই খবর শুনিয়া হযরত আলী (রা.) হযরত হাসান ও হোসাইনকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা যাইয়া উন্মুক্ত তরবারিসহ খলিফার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক, যেন কোন বিদ্রোহী তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে। হযরত তালহা, হযরত যুবাইর (রা.) প্রমুখ আরও কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী স্বীয় সন্তানগণকে খলিফার গৃহ প্রহরা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিলেন।

বিদ্রোহীদের প্রতি হযরত ওসমানের আবেদন

হযরত ওসমান (রা.) কয়েকবারই বিদ্রোহীদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। একবার গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকসকল, ঐদিনের কথা স্মরণ কর, যখন মসজিদে নববী নেহায়েত ক্ষুদ্র ছিল। আল্লাহর রসূল (সা.) বলিয়াছিলেন, এমন কেহ আছে কি, যে মসজিদ সংলগ্ন স্থানটুকু খরিদ করিয়া মসজিদের নামে ওয়াকফ করিয়া দেয় এবং বিনিময়ে জান্নাতে ইহার চাইতে উৎকৃষ্ট জায়গার অধিকারী হয়। তখন কে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশ পালন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল?

লোকেরা বলিল, আপনি তাহা পালন করিয়াছিলেন।

হযরত ওসমান (রা.) বলিলেন, তোমরা কি আমাকে আজ সেই মসজিদে নামায পড়িতে বারণ করিতেছ?

আবার বলিলেন— আমি তোমাদিগকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, তোমরা ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন মদীনায় 'বীরে মাউনা' ব্যতীত পানীয় জলের আর দ্বিতীয় কোন ব্যবস্থা ছিল না। সমস্ত মুসলমান তখন পানীয় জলের অভাবে কষ্টভোগ করিতেছিলেন। তখন কে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে এই কূপ খরিদ করিয়া মুসলমানদের মধ্যে ওয়াক্ফ করিয়া দিয়াছিলেন?

জওয়াব আসিল— আপনিই করিয়াছিলেন।

হযরত ওসমান (রা.) বলিলেন,— আর আজ সেই কূপের পানি হইতে তোমরা আমাকে বঞ্চিত করিতেছ?

আবার বলিলেন,— মুসলিম বাহিনীর সাজসরঞ্জাম কে বর্ধিত করিয়াছিল?

লোকেরা বলিল,– আপনি।

অতঃপর বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে খোদার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে সত্যের সমর্থন করিবে এবং বলিবে, একদা আল্লাহর রসূল (সা.) যখন ওহুদ পর্বতে আরোহণ করিলেন তখন পর্বত কাঁপিতে লাগিল। আল্লাহর রসূল পর্বতের উপর পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "হে ওহুদ, স্থির হও! তোমার উপর এখন একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুই জন শহীদ রহিয়াছেন, তখন আমিও আল্লাহর রসূলের সঙ্গে ছিলাম।"

লোকেরা বলিতে লাগিল,— আপনি সত্য বলিতেছেন।

পুনরায় বলিতে লাগিলেন,— লোকসকল, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বল, হোদায়বিয়া নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সা.) যখন আমাকে দূত হিসাবে কোরায়শদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন কি ঘটিয়াছিল? ইহা কি সত্য নয়, তখন আল্লাহর রসূল (সা.) স্বীয় এক হাতকে আমার হাত বলিয়া তাহাতে তোমাদের বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন?

জনতার মধ্য হইতে আওয়াজ আসিল, আপনি সত্য বলিতেছেন!

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আল্লাহর রসূলের প্রতিভূর এহেন মর্যাদার কথা নিজ মুখে স্বীকার করার পরও বিদ্রোহীদের অন্তর হইতে দুর্বুদ্ধি প্রশমিত হইল না। হজ্বের মওসুম তখন অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইতেছিল। বিদ্রোহীদের ভয় ছিল, হজ্ব সমাপ্ত হইলে পর মুসলমানগণ মদীনার দিকে আসিতে থাকিবেন। তখন তাহাদের দুরভিসন্ধি কার্যকর হইতে পারিবে না। এই জন্য বিদ্রোহীরা হযরত ওসমানকে হত্যা করার কথা ঘোষণা করিয়া দিল। হযরত ওসমান (রা.) নিজ কর্ণে এই ঘোষণা শুনিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকসকল, কোন অপরাধে তোমরা আমার রক্তের জন্য পিপাসিত হইয়াছ? ইসলামী শরীয়তে কোন ব্যক্তিকে হত্যার তিনটি মাত্র কারণ রহিয়াছে। যদি সে ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে প্রস্তর মারিয়া নিহত করা হয়। যদি সে ইসলাম ত্যাগ করে, তবে এই অপরাধে তাহাকে হত্যা করা চলে। অথবা যদি কেহ কাহাকেও ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তবে সেই হত্যার অপরাধে তাহাকেও হত্যা করা যাইতে পারে। এখন তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে বল, আমি কি কাহাকেও হত্যা করিয়াছি? তোমরা কি আমার উপর ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করিতে পার? আমি কি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বীন পরিত্যাগ করিয়াছি? তোমরা শুনিয়া রাখ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ এক, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রসূল (সা.)। অতঃপর তোমাদের পক্ষে আমাকে হত্যা করার কোন্ সঙ্গত কারণটি অবশিষ্ট রহিয়াছে?"

নায়েবে রসূলের ধৈর্য

অবস্থা যখন বেশী শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা.) খলিফার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এই পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে তিনটি পরামর্শ দিতেছি ঃ আপনার সমর্থক যথেষ্ট পরিমাণ বীর যোদ্ধা এখানে মওজুদ রহিয়াছেন,

আপনি জেহাদের নির্দেশ দিন। অগণিত মুসলিম সত্যের সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। যদি এই পরামর্শ গ্রহণ না করেন তবে গৃহের সদর দরজা ভাঙ্গিয়া অবরোধ হইতে বাহির হউন এবং মক্কায় চলিয়া যান। যদি তাহাও পছন্দ না করেন তবে আপনি সিরিয়ায় চলিয়া যান। সেখানকার লোক বিশ্বস্ত, তাহারা আনপাকে সাহায্য করিবে।

কিন্তু ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হযরত ওসমান (রা.) বলিলেন, আমি মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খলিফা হইয়া কিরূপে মুসলিম জাতির রক্ত প্রবাহিত করিব। আমি সেই খলিফা হইতে চাই না, যিনি মুসলিম জাতির মধ্যে রক্তারক্তির সূচনা করিবেন। আমি মক্কাতেও যাইতে পারি না। কেননা, আমি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুখে শুনিয়াছি, কোরায়শদের কোন ব্যক্তি পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে রক্তপাত করাইবে। তাহার উপর অর্ধ দুনিয়ার আযাব হইবে। আমি আল্লাহর রসূলের এই ভীতিপূর্ণ বাণীর উদগাতা হইতে পারি না। বাকী রহিল সিরিয়ায় যাওয়ার কথা। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গসুখ এবং হিজরতের পবিত্র ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আমার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব? পরিস্থিতি যখন আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল তখন তিনি আবু সাওর আল-ফাহমীকে ডাকিয়া বেদনা-বিধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, মহান আল্লাহর উপর আমার বিশেষ ভরসা রহিয়াছে। আমার দশটি আমানত তাঁহার নিকট রক্ষিত আছে ঃ

(১) ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়া আমি চতুর্থ মুসলমান। (২) আল্লাহর রসূল আমার নিকট স্বীয় কন্যা বিবাহ দেন। (৩) একজনের মৃত্যু হইলে পর দ্বিতীয় আর এক কন্যা আমাকে দান করেন। (৪) আমি জীবনে কখনও গান করি নাই। (৫) কখনও আমি অন্যায়ের ইচ্ছাও পোষণ করি নাই। (৬) যখন হইতে আমি আল্লাহর রসূলের হাতে বায়আত করিয়াছি, তাহার পর হইতে আমার সেই দক্ষিণ হস্ত কখনও লজ্জাস্থানে লাগাই নাই। (৭) মুসলমান হওয়া অবধি প্রত্যেক জুমার দিন আমি একটি করিয়া ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়াছি। ঘটনাক্রমে কখনও ক্রীতদাসের অভাব হইলে আমি পরে উহার ক্ষতিপূরণ করিয়াছি। (৮) আমি বর্বর যুগে অথবা মুসলমান হওয়ার পর কখনও ব্যভিচার করি নাই। (৯) বর্বর যুগে অথবা মুসলমান হওয়ার পর কখনও আমি চুরি করি নাই। (১০) আল্লাহর রসূলের পবিত্র জীবৎকালেই আমি কোরআন পাক হেফ্জ করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

ক্রমে পরিস্থিতির আরও অবনতি দেখা দিল। এই সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) খেদমতে হাজির হইয়া নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রসূলের খলিফা, আপনার গৃহ প্রাঙ্গণে সাতশত মোজাহেদ উপস্থিত রহিয়াছেন। আপনি নির্দেশ দিন আমরা

বিদ্রোহীদের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতেছি। জওয়াব দিলেন, আমি আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি; আমার জন্য একজন মুসলমানও যেন রক্তপাত না করেন। গৃহে বিশটি ক্রীতদাস ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য হইতে তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত। এই সময় হযরত যায়েদ ইবেন সাদ (রা.) উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহর রসূলের আনসারগণ দ্বারে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা পুনরায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পালন করিত চাহেন। তিনি জওয়াব দিলেন, যদি যুদ্ধ করিতে চাও তবে আমি কিছুতেই অনুমতি দিতে পারি না। অদ্য আমার সবচাইতে বড় সহযোগিতা হইবে, আমার জন্য যেন কেহ তরবারি কোষমুক্ত না করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) উপস্থিত হইলেন এবং নিতান্ত বিনয়ের সহিত জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি জানিতেন, নায়েবে রসূলের সামান্য অনুমতির সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে তাঁহার পতাকাতলে একত্রিত হইয়া আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে, কিন্তু খলিফা বলিলেন, আবু হোরায়রা, তুমি কি সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এমনকি আমাকেও হত্যা করিতে পারিবে? হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলিলেন, কোন মুসলমানই এইরূপ করিতে পারে না। তখন খলিফা বলিলেন, যদি তুমি একটি মানব সন্তানকেও অযথা হত্যা কর, তবে তুমি যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে– গোটা মানবতাকে হত্যা করিলে। এই উক্তি দ্বারা খলিফা সূরা মায়েদার একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এই উক্তি শ্রবণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিলেন।

শাহাদাত

আল্লাহর রসূল (সা.) হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সাধারণ মুসলমানগণ বিদ্রোহীদের ধ্বংসাত্মক অভিযানের মধ্যে অশ্রুরুদ্ধ নয়নে তাহাই দেখিতেছিলেন। একমাত্র হযরত ওসমানই নির্বিকার চিত্তে আল্লাহর রসূলের অন্তিম বাণীর বাস্তবতা অবলোকন করার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। জুমার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি রোজার নিয়ত করিলেন। এই দিন সকালের দিকে স্বপ্ন দেখিলেন, আল্লাহর রসূল (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর সমভিব্যহারে তশরীফ আনিয়াছেন এবং বলিতেছেন— ওসমান (রা.), শীঘ্র চলিয়া আস। আমি এখানে তোমার ইফতারের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। চক্ষু খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিবিকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার শাহাদাতের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। বিদ্রোহীরা এখনই আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। বিবি বলিলেন,– না, না, এইরূপ কিছুতেই হইতে পারে না। তিনি বলিলেন, আমি এখনই স্বপ্নে দেখিয়াছি। এই কথার পর বিছানা হইতে উঠিয়া একটি নূতন পাজামা আনাইয়া পরিধান করিলেন এবং কোরআন সম্মুখে লইয়া তেলাওয়াতে বসিয়া গেলেন।

ঐদিকে সেই সময় মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর তীর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিলেন। একটি তীর আসিয়া খলিফার দ্বারে দণ্ডায়মান হযরত হোসাইনের শরীরে বিদ্ধ হইল। হযরত হোসাইন (রা.) গুরুতররূপে আহত হইলেন। আর একটি তীর গৃহের অভ্যন্তরে মারওয়ানের শরীরে যাইয়া লাগিল। হযরত আলীর গোলাম কাম্বরও মাথায় আঘাত পাইলেন। হযরত হোসাইনকে আহত হইতে দেখিয়া মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বীয় দুই সঙ্গীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন— বনী হাশেম যদি হযরত হোসাইনের আহত হওয়ার খবর পায়, তবে আমাদের সমগ্র পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে। তাঁহারা হযরত ওসমানের কথা ভুলিয়া হযরত হোসাইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া ছাড়িবে না। সুতরাং এই মুহূর্তেই কার্য উদ্ধার করিয়া ফেলা উচিত। মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরের এই পরামর্শমত সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন বিদ্রোহী দেওয়াল উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ঘটনাচক্রে খলিফার ঘরে তখন যে কয়জন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, সকলেই উপরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) তখন একাকী নীচে বসিয়া কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল ছিলেন। বিদ্রোহীদের সহিত গৃহে প্রবেশ করতঃ মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যবহার করিলেন। তিনি হযরত ওসমানের পবিত্র দাড়ি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সজোরে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। আমীরুল মোমেনীন হযরত ওসমান (রা.) তখন বলিতে লাগিলেন— ভ্রাতুষ্পুত্র, আজ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) জীবিত থাকিলে এই দৃশ্য কিছুতেই পছন্দ করিতেন না। এই কথা শুনিয়া মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর লজ্জিত হইয়া পিছু হটিয়া গেলেন, কিন্তু কেননা ইবনে বেশর একটি লোহার শলাকা দিয়া খলিফার মস্তকদেশে এক নিদারুণ আঘাত হানিল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রসূলের এই সম্মানিত প্রতিভূ বিছানায় গড়াইয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন ঃ "বিসমিল্লাহ, আল্লাহর উপর ভরসা করিতেছি।" দ্বিতীয় আঘাত করিল সাওদান ইবনে আমরান। দ্বিতীয় আঘাতে রক্তের ফোয়ারা বহিয়া চলিল। আমর ইবনে হোমকের নিকট এই নৃশংসতা যথেষ্ট মনে হইল না। হতভাগ্য নায়েবে রসূলের বুকের উপর আরোহণ করতঃ খড়গ দ্বারা আঘাতের পর আঘাত করিতে শুরু করিল। এই সময় অন্য এক নির্দয় তরবারি দ্বারা আঘাত করিল। এই আঘাতে বিবি হযরত নায়েলার তিনটি আঙ্গুল কাটিয়া গেল। এই ধস্তাধস্তির মধ্যেই আমীরুল মোমেনীনের পবিত্র আত্মা জড়দেহ ছাড়িয়া অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া গেল। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

নৃশংসতার এই পাশবিক দৃশ্য কেবলমাত্র হযরত নায়েলা সচক্ষে দর্শন করিলেন। তিনি হযরত ওসমানকে নিহত হইতে দেখিয়া ঘরের ছাদে আরোহণ করতঃ চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমীরুল মোমেনীন শহীদ হইয়া গিয়াছেন। খবর শোনার সঙ্গে

সঙ্গে আমীরুল মোমেনীনের বন্ধুরা ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, হযরত ওসমানের রক্তাক্ত দেহ বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মদীনাবাসীগণ উর্ধ্বশ্বাসে খলিফার গৃহের দিকে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। হযরত আলী (রা.) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হযরত হাসান ও হোসাইনকে শাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। হযরত ওসমান (রা.) রক্তের ফোয়ারায় ডুবিয়া গৃহের অভ্যন্তরে পড়িয়া রহিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও অবরোধ ঠিকমত চলিতেছিল। দীর্ঘ দুই দিন পর্যন্ত খলিফাতুল মুসলেমনীনের পবিত্র লাশ গোর-কাফন ব্যতীত গৃহে পড়িয়া রহিল। তৃতীয় দিন কতিপয় ভাগ্যবান মুসলমান এই শহীদের রক্তাক্ত লাশ দাফন-কাফনের জন্য আগাইয়া আসিলেন। মাত্র সতের জন লোক জানাযার নামায পড়িলেন। এইভাবে আল্লাহর কিতাবের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক, সুন্নতে রসূলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিককে জ ান্নাতুল বাকীতে নিয়া সমাহিত করা হইল।

দুর্ঘটনার সময় ওসমান (রা.) কোরআন তেলাওয়াত করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে পবিত্র কোরআন খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল। হযরত ওসমানের পবিত্র রক্ত কোরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতখানা রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল ঃ

"আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি প্রাজ্ঞ, তিনি সব শোনেন।"

জুমার দিন আছরের সময় তিনি শহীদ হইলেন। হযরত জুবাইর ইবনে মোত্য়েম জানাযার নামায পড়াইলেন। হযরত আলী (রা.) দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি ওসমানের রক্তপাত হইতে সম্পূর্ণ নির্দোষ!" সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রা.) বলিলেন, "তোমাদের ধৃষ্টতার প্রতিফলস্বরূপ ওহুদ পর্বত ফাটিয়া পড়ার কথা।" হযর আনাস (রা.) বলিলেন, হযরত ওসমানের জীবদ্দশা পর্যন্ত আল্লাহর তরবারি কোষবদ্ধ ছিল। তাঁহার শাহাদাতের পর অদ্য এই তরবারি কোষমুক্ত হইবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত উহা কোষমুক্তই থাকিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি হযরত ওসমানের রক্তের প্রতিশোধ দাবী করা না হইত তবে মানুষের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষিত হইত। হযরত সামুর (রা.) বলেন, হযরত ওসমান-হত্যার জের কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হইবে না এবং ইসলামী খেলাফত মদীনা হইতে এমনভাবে বহিষ্কৃত হইবে, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত আর কখনও মদীনায় ফিরিয়া আসিবে না।

কাব ইবনে মালেক (রা.) শাহাদাতের খবর শুনিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ হইতে কয়েকটি কবিতা বাহির হইয়া আসিল। যাহার মর্ম হইল–

"তিনি তাঁহার উভয় হস্ত বাঁধিয়া রাখিতেন, গৃহের দরজাও বন্ধ করিয়া দিলেন। মনে মনে বলিলেন, আল্লাহ সব কিছুই জানেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিলেন, শত্রুদের

সহিত যুদ্ধ করিও না। আজ যে ব্যক্তি আমার জন্য যুদ্ধ না করিবে, সে আল্লাহর শান্তির ছায়ায় থাকিবে।"

"ওহে দর্শকগণ! হযরত ওসমানের শাহাদাতের ফলে পরস্পরের ভালবাসা কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া গেল। আর আল্লাহ্ তাহার জায়গায় পরস্পরের উপর শত্রুতার বোঝা চাপাইয়া দিলেন।"

"হায়! ওসমানের পর মঙ্গল এমনভাবে অন্তর্হিত হইবে, যেমন তীব্র ঘূর্ণিবাত্যা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া যায়।"

মুসলিম জাহানে প্রতিক্রিয়া

হযরত ওসমানের শাহাদাতের খবর মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়াইয়া পড়িল। এই সময় হযরত হোযাইফা (রা.) এমন একটি কথা বলিয়াছিলেন, পরবর্তী সমস্ত ঘটনাই তাঁহার সেই কথার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "হযরত ওসমানের শাহাদাতের ফলে মুসলিম জাহানে এমন এক বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছে, কেয়ামত পর্যন্ত যাহা রুদ্ধ হওয়ার নহে।"

হযরত ওসমানের রক্তাক্ত জামা ও হযরত নায়েলার কাটা অঙ্গুলি বনী উমাইয়ার তদানীন্তন বিশিষ্ট নেতা, সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত আমির মোয়াবিয়ার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। খলিফাতুল মুসলেমীনের এই রক্তাক্ত জামা যখন খোলা হইল, তখন চারিদিক হইতে কেবল 'প্রতিশোধ' 'প্রতিশোধ' আওয়াজ উঠিল। বনী উমাইয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলে যাইয়া আমির মোয়াবিয়ার নিকট সমবেত হইলেন। এখানে এই কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হযরত আলীর খেলাফত হইতে শুরু করিয়া ইমাম হোসাইনের শাহাদাত এবং আমির মোয়াবিয়ার পর উমাইয়া ও আব্বাসিয়া খেলাফতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতগুলি দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে, প্রত্যেক স্থানেই হযরত ওসমানের পবিত্র রক্ত ক্রিয়াশীল দেখিতে পাওয়া যায়। হযরত ওসমানের এই শাহাদাত এমন একটি দুর্ঘটনা, যদ্দ্বারা ইসলামের ভাগ্যই পরিবর্তিত হইয়া গেল। জঙ্গে জামালে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাও এই রক্তের জের মাত্র। তৎপর কারবালাতে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও এই ঘটনারই দুঃখজনক পরিণতি। তৎপরও উমাইয়া বনাম আব্বাসিয়া প্রশ্নে যে সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও এই বিভ্রান্তি বা বেদনাদায়ক অপকর্মেরই স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। হযরত ওসমানের শাহাদাতের পর বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের গোত্রীয় বিদ্বেষের আগুন আবার নূতনভাবে জ্বলিয়া উঠিল এবং ইসলামের যে বিদ্যুৎসম শক্তি একদা সমগ্র দুনিয়ার শান্তি সমৃদ্ধির শপথ লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা এমনভাবে বিপর্যস্ত হইল যে, অতঃপর আর কখনও সেই বিপর্যয় সামলাইয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই।

হযরত আলীর শাহাদাত

জঙ্গে জামালের পর ইসলামী খেলাফতের লড়াই দুই ব্যক্তির মধ্যে আসিয়া সীমাবদ্ধ হয়। একজন হইতেছেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব এবং অন্যজন হইতেছেন আমির মোয়াবিয়া ইবনে আবু ছুফিয়ান (রা.)। এঁদের মধ্যে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আমর ইবনুল আস (রা.)। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনীতিতে ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

সিফফীনের যুদ্ধ মুসলমানদের মধ্যে খারেজী নামক আর একটি নূতন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। দলটি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক উদ্দেশে গঠিত হইলেও এর সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসকে জড়িত করা হইয়াছিল। ইহাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল ঃ ان الحكم لا لله– "রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর।"

অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বর্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে উহাদিগকে নৈরাজ্যবাদী বলা যাইতে পারে। এই জন্য উহারা কুফা ও দামেশকের উভয় রাষ্ট্রশক্তিরই ঘোর বিরোধী ছিল।

মক্কায় বসিয়া খারেজীগণ ইসলামের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্র করিল। এই জন্য তিন ব্যক্তি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। আমর ইবনে বকর তামিমী শপথ করিল, "আমি মিসরের শাসনকর্তা আমর ইবনুল আসকে দুনিয়া হইতে বিদায় করিব। কারণ, বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মূল উদ্গাতা তিনি।" বারক ইবনে আবদুল্লাহ তামিমী শপথ নিল, "আমি মোয়াবিয়া ইবনে আবু ছুফিয়ানকে হত্যা করিব, কারণ, তিনি সিরিয়ায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছেন।"

দুই ব্যক্তির শপথের পর মুহূর্তের জন্য মন্ত্রণাসভায় নীরবতা দেখা দিল। তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক হযরত আলীকে হত্যা করার কল্পনা যেন সকলের অন্তরকেই একবার কাঁপাইয়া তুলিল। শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম মুরাবী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, আমি হযরত আলীকে হত্যা করিব।

এই ভয়ানক ষড়যন্ত্র কার্যকর করার জন্য ১৭ই রমজান তারিখ নির্দিষ্ট হইল। প্রথম দুই ব্যক্তি অকৃতকার্য হয়, কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম কৃতকার্য হইল। নিম্নে ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইল।

মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া আবদুর রহমান কুফায় পৌছিল। এখানেও খারেজীদের একটি বিরাট দল মওজুদ ছিল। আবদুর রহমান তাহাদের নিকট যাতায়াত করিত। একদিন

তামীমুর রুবাব গোত্রের কতিপয় খারেজীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ইহাদের মধ্যে কাত্তাম বিনতে সাজনা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী ছিল। আবদুর রহমান সহজেই সুন্দরীর প্রতি আসক্ত হইয়া উঠিল। নিষ্ঠুর প্রেমিকা বলিল, আমাকে পাইতে হইলে মোহরানা বাবদ যা দাবী করিব তাহা দিতে হইবে। ইবনে মুলজিম সহজেই রাজি হইয়া গেল। কাত্তাম মোহরানার শর্ত বলিল ঃ "তিন সহস্র দেরহাম, একটি ক্রীতদাস, একটি দাসী ও হযরত আলীকে হত্যা।" আবদুর রহমান বলিল, আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু আলীকে কি করিয়া হত্যা করিব?

রক্তপিপাসু প্রিয়া বলিল, অত্যন্ত গোপনে। "যদি তুমি কৃতকার্য হইয়া ফেরত আসিতে পার, তবে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখের সংসার গড়িতে পারিবে। যদি মারা যাও তবে জান্নাতের অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবে।" আবদুর রহমান আনন্দিত হইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বিদায় হইল।

বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়, হযরত আলী (রা.) অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনাগত দুর্ঘটনার কথা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমকে দেখিয়াই মনে করিতেন, ইহার হাত যেন রক্তে রঞ্জিত হইবে। ইবনে সাদের এক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি বলিতেন, "আল্লাহর শপথ, রসূলে খোদা (সা.) বলিতেন, আমার মৃত্যু হইবে হত্যার মাধ্যমে।"

আবদুর রহমান ইবনে ইবনে মুলজিম দুইবার তাঁহার নিকট বায়আতের জন্য উপস্থিত হয়, কিন্তু দুইবারই তিনি তাহাকে ফিরাইয়া দেন। তৃতীয় বার আগমন করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "সবচাইতে ঘৃণ্য নরাধমকে কে ফিরাইয়া দিতেছে? (দাড়িতে হাত দিয়া বলিলেন) আল্লাহর শপথ, এই বস্তু নিশ্চয়ই রঙ্গিন হইয়া উঠিবে।"– (ইবনে সাদ)

কখনও সঙ্গীদের প্রতি বিরক্ত হইলে বলিতেন, "তোমাদের সবচাইতে হতভাগ্য ব্যক্তির আগমন ও আমাকে হত্যা করার ব্যাপারে কে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে? হে খোদা, আমি উহাদের প্রতি উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছি। আর উহারাও আমার প্রতি চরমভাবে বিরক্ত হইয়া গিয়াছে। আমাকে উহাদের কবল হইতে মুক্তি দাও; উহাদিগকেও আমার সান্নিধ্য হইতে মুক্তি দাও।"– (তাবাকাতে ইবনে সাদ, কামেল, ইবনে আসীর প্রভৃতি)

একদিন খুৎবা দিতে যাইয়া বলিলেন, "ঐ মহান শক্তির শপথ, যিনি বীজ, অঙ্কুর ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা অবশ্যই এই বস্তু দ্বারা রঞ্জিত হইবে (দাড়ি ও মাথার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন)। হতভাগ্য কেন বিলম্ব করিতেছে?"

লোকেরা নিবেদন করিল, আমীরুল মোমেনীন; আমাদিগকে তাহার নাম বলুন, এখনই তাহার দফা শেষ করিয়া দেই। বলিলেন, এমতাবস্থায় তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করিবে, যে এখনও আমাকে হত্যা করে নাই।

লোকেরা বলিল, তবে আমাদের জন্য একজন খলিফা নির্বাচিত করিয়া যান। বলিলেন, না; আমি তোমাদিগকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে চাই, যে অবস্থায় রসূলে খোদা (সা.) তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

লোকেরা নিবেদন করিল, এমতাবস্থায় আপনি আল্লাহর নিকট কি জওয়াব দিবেন? বলিলেন, বলিব– খোদা, আমি উহাদের মধ্যে তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি; যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে উহাদের সংশোধন করিও; আর যদি ইচ্ছা কর উহাদের ধ্বংস করিয়া দিও।

(মোসনাদে ইমাম আহমদ)

দুর্ঘটনার পূর্বে

হযরত আলীর দাসী উম্মে জাফরের বর্ণনা, হযরত আলী (রা.) নিহত হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে আমি একদিন তাঁহার হাত ধুইয়া দিতেছিলাম। তিনি মাথা উঠাইয়া দাড়িতে হাত রাখিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আক্ষেপ তোর জন্য, তুই রক্ত দ্বারা রঞ্জিত হইবি।"– (ইবনে সাদ)

তাঁহার কোন কোন সঙ্গীও এই ষড়যন্ত্রের কথা আঁচ করিতে পারিয়াছিলেন। বনী মুরাদের একব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, "আমীরুল মোমেনীন, সাবধানে থাকিবেন, এখানকার কিছু লোক আনপাকে হত্যার চেষ্টা করিতেছে।"

– (আল ইমামাতু ওয়াস্ সিয়াসাতু)

কোন্ গোত্রের লোক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, এই কথা জানাজানি হইয়া গিয়াছিল। একদিন নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "আমীরুল মোমেনীন, সাবধানে থাকিবেন। মুরাদ গোত্রের কিছু লোক আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিতেছে।"– (ইবনে সাদ)

কে এইরূপ দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হইয়াছে, সেই কথাও প্রকাশ পাইয়া গিয়াছিল। আশ্আস্ একদিন ইবনে মুলজিমকে একটি নূতন তরবারি ধার দিতে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তো কোন যুদ্ধ নাই, নূতন তরবারি ধার দিতেছ কেন?

ইবনে মুলজিম জওয়াব দিল, একটি জংলী উট জবেহ্ করিতে হইবে। আশ্আস্ ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন এবং খচ্চরে আরোহণ করিয়া হযরত আলীর নিকট আগমন করতঃ বলিতে লাগিলেন, "আপনি কি ইবনে মুলজিমের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা সম্পর্কে কি

জ্ঞাত আছেন?" হযরত আলী (রা.) জওয়াব দিলেন, কিন্তু সে তো এখনও আমাকে হত্যা করে নাই। -(আল-কামেল)

ইবনে মুলজিমের দুরভিসন্ধির কথা এতটুকু প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল যে, একদিন হযরত আলী (রা.) স্বয়ং তাহাকে দেখিয়া আমর ইবনে মাদীকারেবের এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন-

اريد حباه ويريد قتلي - غد يرى من خليلك من مراد

ইবনে মুলজিম বরাবরই নিজের সাফাই গাহিত, কিন্তু একদিন সে মুখ খুলিয়া বলিয়া ফেলিল, "যাহা হইবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে।"

এই কথা শুনিয়া লোকেরা বলিতে লাগিল, আমীরুল মোমেনীন, আপনি যখন তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন তখন উহাকে হত্যা কেন করিতেছেন না? হযরত আলী (রা.) বলিলেন, যে আমার হত্যাকারীরূপে নির্ধারিত তাহাকে আমি কি করিয়া হত্যা করি? (কামেল)

শাহাদাতের সকাল

হত্যার দুর্ঘটনা জুমার দিন ফজরের সময় সংঘটিত হয়। ইবনে মুলজিম সারারাত আশ্‌আস্ ইবনে কায়স কেন্দীর মসজিদে বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিয়া কাটাইয়া দেয়। সে কুফার শাবীব বাজরা নামক আর একজন খারেজীকে এই দুষ্কর্মের সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল। রাত্রি শেষে উভয়েই তরবারি লইয়া রওয়ানা হয় এবং মসজিদের যে দরজা দিয়া সাধারণতঃ আমীরুল মোমেনীন প্রবেশ করিতেন সেই দ্বারে আসিয়া বসিয়া থাকে। -(ইবনে সাদ)

সেই রাত্রে আমীরুল মোমেনীনের নিদ্রা আসিল না। হযরত হাসান (রা.) বর্ণনা করেন, সকালবেলা আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বলিতে লাগিলেন, বৎস, রাত্রিভর একটুকুও ঘুমাইতে পারি নাই। একবার বসিয়া বসিয়াই একটু তন্দ্রার ভাব হইলে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখিলাম। বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার উম্মত দ্বারা আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি। তিনি বলিলেন, দোয়া কর যেন আল্লাহ্ পাক তোমাকে উহাদের কবল হইতে মুক্তি দেন।- (কামেল)

ইহার পর আমি দোয়া করিলাম, হে খোদা, আমাকে উহাদের চাইতে ভাল সঙ্গী দাও এবং উহাদিগকে আমার চাইতে নিকৃষ্ট সঙ্গীর কবলে পতিত কর।- (ইবনে সাদ)

হযরত হাসান (রা.) বলেন, এই সময়ই ইবনুল বান্না মোয়াজ্জেন আসিয়া নামাজের জন্য ডাকিতে লাগিলেন। আমি পিতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া মসজিদের দিকে

যাইতে শুরু করিলাম। ইবনুল বান্না তাঁহার অগ্রে এবং আমি পশ্চাতে ছিলাম। দরজার বাহিরে আসিয়া তিনি ডাকিতে শুরু করিলেন, "লোকসকল, নামায!" বরাবর তাঁহার নিয়ম ছিল, লোকদিগকে তিনি মসজিদে আসার জন্য নিদ্রা হইতে জাগাইতেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মোয়াজ্জেনের ডাক শুনিয়াও তিনি উঠিলেন না। মোয়াজ্জেন দ্বিতীয়বার আসিল, কিন্তু এইবারও তিনি উঠিতে পারিলেন না। তৃতীয়বার ডাকার পর তিনি অতি কষ্টে নিম্নের মর্ম সম্বলিত কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলেন—

"মৃত্যু অবশ্যই তোমার সহিত মিলিত হইবে।
মৃত্যুর জন্য কোমর বাঁধিয়া লও, কারণ
মৃত্যুকে ভয় করিও না; যদি মৃত্যু আসিয়া উপনীত হয়।"–(এহইয়াউল উলুম)

সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গেই দুইটি তরবারি একত্রে চমকিতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি আওয়াজ শোনা গেল; "রাজ্য আল্লাহর, হে আলী, তোমার নয়।" শাবীবের তরবারি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, কিন্তু ইবনে মুলজিমের তরবারি তাঁহার ললাটদেশে বিদ্ধ হইয়া মস্তিষ্ক পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল।–(ইবনে সাদ)

আহত হইয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আল্লাহর শপথ, আমি কৃতকার্য হইয়া গিয়াছি।"–(এহ্ইয়াউল উলুম)

সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, আততায়ী যেন পলাইতে না পারে। আওয়াজ শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিল, কিন্তু ইহার ভিতর হইতেই শাবীব পলাইয়া যাইতে সমর্থ হয়।– (ইবনে সাদ)

আবদুর রহমান তরবারি ঘুরাইতে সুরাইতে ভীড় ঠেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এইভাবে পলায়ন করার মুখেই মুগীরা ইবনে নওফাল নামক বিখ্যাত বীর পুরুষ দৌড়াইয়া গিয়া তাহার উপর পুরু কাপড় ফেলিয়া দিলেন এবং শূন্যে তুলিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন।– (কামেল)

আততায়ীর সহিত কথোপকথন

আহত আমীরুল মোমেনীনকে গৃহে পৌঁছানো হইল। তিনি আততায়ীকে ডাকাইলেন। তাহাকে সম্মুখে আনা হইলে বলিলেন, হে খোদার দুশমন, আমি কি তোর প্রতি কোন অনুগ্রহ করি নাই? সে বলিল, নিশ্চয়ই! বলিলেন, ইহার পরও তুই কেন এই কাজ করিলি? আততায়ী বলিতে লাগিল, আমি চল্লিশ দিন যাবত আমার তরবারি ধার দিতেছিলাম এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম, ইহা দ্বারা যেন তাঁহার নিকৃষ্টতম সৃষ্টিকে হত্যা করিতে পারি।

আমীরুল মোমেনীন বলিলেন, "তুই এই তরবারি দ্বারাই নিহত হইবি। তুই-ই আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।"– (তাবারী)

তাঁহার কন্যা উম্মে কুলসুম চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে খোদার দুশমন, তুই আমীরুল মোমেনীনকে হত্যা করিয়াছিস। আততায়ী বলিল, "আমি আমীরুল মোমেনীনকে হত্যা করি নাই; অবশ্য তোমার পিতাকে হত্যা করিয়াছি।" তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহর অনুগ্রহে আমি আশা করি, আমীরুল মোমেনীনের একটি পশমও বাঁকা হইবে না। সে বলিল, 'তবে আর কেন চিৎকার কর?' পুনরায় বলিল, আল্লাহর শপথ, আমি দীর্ঘ একমাস যাবত এই তরবারিকে বিষ পান করাইয়াছি। তাহার পরও যদি উহা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে খোদা উহার সর্বনাশ করিবেন।"–(ইবনে সাদ)

আমীরুল মোমেনীন হযরত হাসানকে বলিলেন, "এই ব্যক্তি বন্দী; উহার সহিত সদ্ব্যবহার কর। ভাল খাইতে দাও, নরম বিছানা দাও। যদি বাঁচিয়া থাকি তবে আমার রক্তের সবচাইতে বড় দাবীদার আমি হইব। ইহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব অথবা ক্ষমা করিয়া দিব। আর যদি মরিয়া যাই তবে উহাকে আমার পিছনেই প্রেরণ করিয়া দিও। আল্লাহর দরবারে উহার জন্য ক্ষমা চাহিব।"

"হে বনী আবদুল মোত্তালেব, দেখিও, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যেন মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত শুরু করিয়া দিও না। সাবধান! আমার হন্তা ব্যতীত আর কাহাকেও হত্যা করিও না।" হাসান! উহার এই আঘাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে উহাকে অনুরূপ আঘাত দ্বারা শেষ করিয়া দিও। উহার নাক, কান কর্তন করিয়া লাশ খারাপ করিও না। আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "সাবধান! নাক কান কাটিও না– যদিও সে কুকুর হয়।"– (তাবারী)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তিনি বলিলেন, যদি তোমরা 'কেসাস' (প্রতিশোধ) লইতেই চাও তবে উহাকে সেইরূপ আঘাতেই হত্যা করিও, যেইরূপ আঘাতে সে আমাকে হত্যা করিয়াছে। আর যদি ক্ষমা করিয়া দাও তবে উহাই তাক্‌ওয়ার (খোদাভীতির) বিশেষ নিকটবর্তী।"– (কামেল)

"দেখিও, বাড়াবাড়ি করিও না। কেননা, আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"–(ইবনে সাদ)

অন্তিম উপদেশ

উপরোক্ত উপদেশগুলি দেওয়ার পর তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গেলেন। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসার পর জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আসিয়া বলিলেন, খোদা না করুন, আপনি যদি

দুনিয়াতে না থাকেন, তবে কি আমরা হযরত হাসানকে খলিফা নির্বাচিত করিব? তিনি জওয়াব দিলেন, "আমি তোমাদিগকে এইরূপ নির্দেশ দিব না, নিষেধও করিতেছি না। তোমরা নিজেদের মঙ্গলের জন্য যাহা ভাল মনে কর, তাহাই করিও।"-(তাবারী)

অতঃপর পুত্রদ্বয়- হযরত হাসান ও হোসাইনকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাদের দুই জনকে খোদাভীতির উপদেশ দিতেছি। কখনও দুনিয়ার পশ্চাতে লাগিও না, যদিও এই দুনিয়া তোমার পশ্চাদ্ধাবন করে। যে বস্তু তোমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাইবে তাহাতে দৃঢ় থাকিও না। সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকিবে। এতীমের প্রতি দয়া করিও। অসহায়ের সাহায্য করিও। আখেরাতের জন্য আমল করিও। অত্যাচারীর শত্রু ও নির্যাতিতের সহকারী হইও। আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করিও। আল্লাহর পথে চলার জন্য তিরস্কারকারীদের তিরস্কারের পরোয়া করিও না।"

এরপর তিনি তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমার ভাইদের জন্য যে উপদেশ দিয়াছি তাহা অনুধাবন করিয়াছ তো? তিনি নিবেদন করিলেন, জি হাঁ? আবার বলিলেন, "আমি তোমাকেও এই উপদেশই দিতেছি। পুনরায় বলিতেছি, তোমার এই দুই ভাইয়ের বিরাট মর্যাদার কথা সর্বদা স্মরণ রাখিও। তাহাদের অনুগত থাকিও। তাহাদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করিও না।" অতঃপর ইমাম হাসান-হোসাইনকে পুনরায় বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে তাহার সম্পর্কে অসিয়ত করিতেছি, সেও তোমাদের ভাই, তোমাদের পিতারই সন্তান। তোমরা জান, তোমাদের পিতা তাহাকে ভালবাসেন।"

তৎপর ইমাম হাসানকে বলিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে অসিয়ত করিতেছি : আল্লাহকে ভয় করিও। সময়মত নামায পড়িও, পরিমাণমত যাকাত আদায় করিও। ভালভাবে অজু করিও। কেননা, পবিত্রতা ব্যতীত নামায সম্ভবপর নহে। যাকাত অস্বীকারকারীর নামায কবুল হয় না। আরও অসিয়ত করিতেছি, মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিও। ধর্মীয় ব্যাপারে যুক্তি-বুদ্ধির অনুসরণ করিও। প্রত্যেক ব্যাপারে ভালভাবে অনুসন্ধান করিও। কোরআনের সহিত গভীর সম্পর্ক রাখিও। প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করিও। অশ্লীলতা হইতে দূরে থাকিও।"-(তাবারী)

তারপর সকল সন্তানদের ডাকিয়া বলিলেন, "আল্লাহকে ভয় করিও। অলস নিষ্কর্মা হইও না। নীচতা অবলম্বন করিও না। হে খোদা, আমাদের সকলকে হেদায়েতের পথে দৃঢ় রাখ। আমাকে ও তাহাদেরকে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত করিয়া দাও। আমার ও তাহাদের জন্য আখেরাত এখানকার চাইতে ভাল করিয়া দাও।" -(আল-ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাতু)

মৃত্যুর সময় তিনি নিম্নলিখিত অসিয়ত লিপিবদ্ধ করাইয়া ছিলেন ঃ "ইহা আলী ইবনে আবু তালেবের অন্তিম বাণী। তিনি সাক্ষ্য দিতেছেন, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই। মোহাম্মদ (সা.) তাঁহার বান্দা ও রসূল। আমার নামায, আমার এবাদত, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, সবকিছু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁহার কোন শরীক নাই। আমাকে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং আমি সর্বপ্রথম তাঁহার প্রতি অনুগত। অতঃপর হে হাসান, আমি তোমাকে এবং আমার সমস্ত সন্তানকে উপদেশ দিতেছি, আল্লাহকে ভয় করিও। যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে তখন ইসলামের উপরই মৃত্যুবরণ করিও। সকলে মিলিয়া আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ করিও। পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য আসিতে দিও না।" কেননা, আমি রসূলে খোদা আবুল কাসেম (সা.)কে বলিতে শুনিয়াছি, "পরস্পরের সৌহার্দ্য বজায় রাখা রোযা-নামাযের চাইতে উত্তম। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিও। তাহাদের উপকার করিও, আল্লাহ্ হিসাব সহজ করিয়া দিবেন। হাঁ, এতীম! এতীম!! এতীমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। উহারা কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত যেন না হয় এবং তোমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকিবে। কেননা, উহা তোমাদের নবীর অন্তিম উপদেশ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সব সময় প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। এমনকি আমরা মনে করিতে লাগিলাম, শেষ পর্যন্ত বোধ হয় প্রতিবেশীর উত্তরাধিকার স্বীকৃত হইবে এবং দেখিও, কোরআন! কোরআনের উপর আমল করার ব্যাপারে যেন কেহ তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে না পারে। এবং নামায! নামায!! কেননা, উহা তোমাদের ধর্মের প্রধান স্তম্ভ। তোমাদের আল্লাহর ঘর সম্পর্কেও কখনও উদাসীন থাকিও না।

আল্লাহর পথে জেহাদ! আল্লাহর পথে স্বীয় জানমাল দিয়া জেহাদ করিও। যাকাত! যাকাত!! যাকাত তোমাদের প্রভুর ক্রোধকে ঠাণ্ডা করিয়া দেয় এবং তোমাদের নবীর যিম্মী! তোমাদের নবীর যিম্মী!! অর্থাৎ, ঐ সমস্ত অমুসলিম, যাহারা তোমাদের সহিত বসবাস করে, তোমাদের সম্মুখে তাহাদের উপর যেন কোন প্রকার অত্যাচার হইতে না পারে। তোমাদের নবীর সাহাবী! তোমাদের নবীর সাহাবী!! আল্লাহর রসূল (সা.) তাঁহার সাহাবীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন। ফকীর-মিসকিন! দরিদ্র অসহায় শ্রেণী!! তাহাদের তোমাদের জীবিকার অংশীদার করিয়া লইও এবং তোমাদের ক্রীতদাস! সর্বদা ক্রীতদাসের সহিত সদ্ব্যবহার করিও।

আল্লাহর সন্তুষ্টির ব্যাপারে যদি কাহারও পরোয়া না কর, তবে তিনি তোমাদিগকে শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিবেন। খোদার সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া-প্রীতি রাখিও। ভালভাবে কথা বলিও। আল্লাহ এইরূপই নির্দেশ দিয়াছেন। সৎকর্মে উৎসাহদান এবং অসৎ

কর্ম প্রতিরোধ করিতে থাকিও। অন্যথায় সমাজের দুষ্ট শ্রেণীকে তোমাদের উপর প্রবল করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তোমরা দোয়া করিবে, কিন্তু তাহা আল্লাহর নিকট কবুল হইবে না। পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিও। সহজ-সরল আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিও! সাবধান! পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিও না, অথবা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইও না। সততা ও খোদাভীতির ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিও, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কেহ কাহাকেও সহায়তা করিও না। আল্লাহকে ভয় করিও। কেননা, আল্লাহর আজাব বড়ই ভীষণ। হে আহলে বায়ত, আল্লাহ তোমাদিগকে রক্ষা করুন এবং তাঁহার নবীর প্রদর্শিত পথে কায়েম রাখুন। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিতেছি। তোমাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করিতেছি।"

এরপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াই চিরদিনের মত তাঁহার যবান স্তব্ধ হইয়া যায়।–

(তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

দাফনের পর

দাফনের পর দ্বিতীয় দিন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) মসজিদে এই মর্মে খুৎবা দিলেন ঃ

"লোকসকল, গতকল্য তোমাদের মধ্য হইতে এমন এক ব্যক্তি বিদায় হইয়া গিয়াছেন, বিদ্যার ক্ষেত্রে পূর্বে তাঁহার সমকক্ষতা কেউ করিতে পারে নাই, না ভবিষ্যতে পারিবে। আল্লাহর রসূল (সা.) তাঁহাকে পতাকা সমর্পণ করিতেন; আর তাঁহার হাতেই বিজয় আসিত। তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কেবলমাত্র দৈনন্দিন ভাতা হইতে বাঁচাইয়া সাতশত দেরহাম (এক দেরহাম প্রায় চারি আনা) পরিবার-পরিজনের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।" –(মোসনাদে হাসান)

যায়েদ ইবনে হোসাইন (রা.) বর্ণনা করেন ঃ আমীরুল মোমেনীনের শাহাদাতের খবর কুলসুম ইবনে ওমরের মারফত মদীনায় পৌঁছে। খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র শহরে শোকের মাতম বহিয়া যায়। এমন কোন লোক ছিল না যে রোদন করে নাই। আল্লাহর রসূলের ইন্তেকালের পর যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই অবস্থারই যেন পুনরাবৃত্তি হইল। একটু শান্ত হওয়ার পর সাহাবীগণ হযরত আয়েশার গৃহের দিকে চলিলেন। এই খবর শোনার পর উম্মুল মোমেনীনের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা জানিতে সকলেই যাইয়া হযরত আয়েশার হুজরা প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন।

এখানে আসিয়া সকলেই দেখিলেন, দুর্ঘটনার খবর পূর্বেই পৌঁছিয়া গিয়াছে। উম্মুল মোমেনীন শোকে অধীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দুই গণ্ড অশ্রু প্লাবনে ভাসিয়া

গিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন।"

হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, দ্বিতীয় দিন প্রচারিত হইল, হযরত উম্মুল মোমেনীন (রা.) রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজায় আসিতেছেন। খবর শুনিয়া মোহাজের ও আনসারগণ সম্মানার্থ সমবেত হইলেন। সকলে অগ্রসর হইয়া সালাম নিবেদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও সালামের জওয়াব দিতে পারিতেছিলেন না। শোকে তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পা যেন চলিতেছিল না। লোকেরা দলে দলে তাঁহার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। অতি কষ্টে তিনি রওজা মোবারকে আসিয়া আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ঃ

"ওগো হেদায়েতের নবী, তোমার প্রতি সালাম! আবুল কাসেম, আপনার প্রতি সালাম! আল্লাহর রসূল, আপনার এবং আপনার দুই বন্ধুর প্রতি সালাম। আমি আপনাকে আপনার প্রিয়তম আপনজনের মৃত্যুর সংবাদ শুনাইতে আসিয়াছি। আমি আপনার পরম স্নেহাস্পদের স্মরণ তাজা করিতে আসিয়াছি। আল্লাহর শপথ, আপনার নির্বাচিত আপনজন নিহত হইয়া গিয়াছেন। যাঁহার সহধর্মিনী শ্রেষ্ঠতমা নারী ছিলেন, তিনি নিহত হইয়াছেন!!

যিনি ঈমান আনিয়াছিলেন এবং ঈমানের শপথে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি ক্রন্দনরতা, দুঃখ ভারাক্রান্তা। আমি তাঁহার উপর অশ্রু বিসর্জনকারিণী, অন্তর বিদীর্ণকারিণী! যদি কবর খুলিয়া যাইত তবে তোমার মুখেও এই কথাই উচ্চারিত হইত, তোমার শ্রেষ্ঠ স্নেহাস্পদ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিহত হইয়া গিয়াছেন।"– (ইকদুল ফরীদ)

এক বর্ণনায় আছে, উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) আমীরুল মোমেনীনের শহীদ হওয়ার খবর শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, এখন আরবগণ যাহা চায় সব করিতে পারে। উহাদের বাধা দেওয়ার মত কোন ব্যক্তি আর অবশিষ্ট রহিল না।–

(ইস্তিয়াব)

হযরত আলীর বিখ্যাত শাগরেদ আবুল আসওয়াদ আদ্‌দোয়ালী মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া মর্সিয়া রচনা করিয়াছিলেন—

الا ابلغ معاوية ابن هرب – فلا قرة عيون الشا تينا

ইমাম হোসাইনের শাহাদাত

জগতে মানবীয় মর্যাদা ও খ্যাতির সহিত সত্যের ভারসাম্য খুব অল্পই রক্ষিত হইতে দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, যে ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে যত বেশী উন্নত হন, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই তত বেশী অলীক কল্প-কাহিনীর সৃষ্টি হইতে দেখা

যায়। এই জন্য ইতিহাস-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনকারী ইবনে খুলদুন বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে ঘটনা দুনিয়ায় যতবেশী খ্যাত ও জনপ্রিয় হইবে, কল্প-কাহিনীর অলীকতা ততবেশী তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে। পাশ্চাত্যের কবি গ্যাটে এই সত্যটাই অন্য কথায় বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "মানবীয় মর্যাদার শেষ স্তর হইতেছে কল্প-কাহিনীতে রূপান্তরলাভ।"

ইসলামের ইতিহাসে হযরত ইমাম হোসাইনের অপরিসীম ব্যক্তিত্বের কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যে মর্মান্তিক ঘটনা ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা হইতেছে হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনা। কোন প্রকার অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই বলা চলে, দুনিয়ার কোন দুর্ঘটনাই বোধ হয় দিনের পর দিন মানব সন্তানের এত অধিক অশ্রু বিসর্জন করাইতে সমর্থ হয় নাই। বিগত তেরশত বৎসরের মধ্যে তেরশত মহররম চলিয়া গিয়াছে; আর প্রত্যেক মহররমই এই বেদনার স্মৃতিকে তাজা করিয়া যাইতেছে। হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র দেহ হইতে যে পরিমাণ রক্ত কারবালা প্রান্তরে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি বিন্দুর পরিবর্তে দুনিয়ার মানুষ দুঃখ-বেদনা ও মাতম-অশ্রুর এক এক একটি সয়লাব প্রবাহিত করিয়াছে।

এতদসত্ত্বেও ভাবিতে আশ্চর্যবোধ হয়, ইতিহাসের এত বড় একটি প্রসিদ্ধ ঘটনাকে ইতিহাসের চাইতে কল্প-কাহিনীর বেড়াজাল বেশী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আজ যদি কোন সত্যসন্ধানী কেবলমাত্র ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে বিচার করিয়া এই বিখ্যাত ঘটনাটি পাঠ করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে প্রায় নৈরাশ্যই বরণ করিতে হইবে! বর্তমানে এই বিষয়ের উপর যত প্রচলিত বই-পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই মাতম-জারির আবেগ হইতে সৃষ্টি। এইগুলির উদ্দেশ্যও কেবল মাতম-জারি সৃষ্টি করা মাত্র। এমনকি ইতিহাসের আবরণে বর্ণনা করা কিছু বিষয়বস্তু, যাহা ইতিহাসের নামেই সংকলিত হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশই ইতিহাস নহে। মাতমের মজলিসী বিষয়বস্তুই ইতিহাসের রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র।

আজ দুনিয়ার যে কোন ভাষায় তালাশ করিয়াও কারবালার ঘটনার উপর একটি সত্যিকারের ইতিহাস পুস্তক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রকেই নিরাশ হইতে হয়।

রসূলে খোদা (সা.)-এর আহ্‌লে বায়ত প্রথম হইতেই নিজদিগকে খেলাফতের প্রকৃত দাবীদার মনে করিতেন। আমির মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের ইন্তেকালের পর

খেলাফতের মসনদ শূন্য হয়। ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়া পূর্ব হইতেই খেলাফতের উত্তরাধিকারী ঘোষিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার খেলাফতের কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং হযরত হোসাইন ইবনে আলীর নিকটও আনুগত্য প্রকাশ করিয়া বায়আত গ্রহণের নির্দেশ প্রেরণ করিলেন। আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রা.) কুফায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য সেখানে আহলে বায়তের সমর্থকের সংখ্যা বেশী ছিল। কুফাবাসীরা হযরত ইমাম হোসাইনকে লিখিলেন, আপনি এখানে আগমন করুন, আমরা আপনার সহযোগিতা করিব। হযরত হোসাইন (রা.) তাঁহার পিতৃব্য মুসলিম ইবনে আকীলকে কুফাবাসীর বায়আত গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং কুফা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বন্ধুদের পরামর্শ

হযরত হোসাইনের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ এই কথা শুনিতে পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সুযোগ-সন্ধানী চরিত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তাই সকলে মিলিয়া এই সফরের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলিলেন, "জনসাধারণ এই কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে যে, আপনি ইরাকে রওয়ানা হইতেছেন, আমাকে প্রকৃত ঘটনা খুলিয়া বলুন।"

হযরত হোসাইন (রা.) জওয়াব দিলেন, "আমি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছি; আজ অথবা আগামীকল্যই যাত্রা করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আপনি কি এমন লোকদের নিকট গমন করিতেছেন, যাহারা শত্রুকে বাহির করিয়া দিয়া রাষ্ট্রের শক্তির উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে? যদি এইরূপ হইয়া থাকে তবে আপনি আনন্দিত চিত্তেই যাইতে পারেন। যদি এইরূপ না হইয়া থাকে আর পুরাতন শাসক শক্তিই এখনও তাহাদের মাথার উপর দস্তুরমত চাপিয়া থাকিয়া থাকে, তাহাদের কর্মচারীরা যদি এখনও স্ব-স্ব রাজকার্য করিয়া যাইতে থাকে, তবে তাহাদের আপনাকে আহ্বান করা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের প্রতিই আহ্বান করার নামান্তর মাত্র। আমার ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত উহারা আপনাকে ধোকা দিয়া না বসে! সর্বোপরি শত্রুকে শক্তিশালী দেখিয়া শেষ পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করিয়া না দেয়," কিন্তু ইমাম হোসাইন এই সমস্ত কথায় কোন প্রকার কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্বেগ

হযরত হোসাইনের যাত্রার সময় নিকটবর্তী হইলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পুনরায় দৌড়াইয়া আসিলেন। বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় ভাই, আমি চুপ করিয়াই থাকিতে

চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে আমি নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে যাত্রা করিতে দেখিতেছি। ইরাকবাসীরা চরম বিশ্বাসঘাতক। ইহাদের নিকটেও যাইবেন না। আপনি এখানেই অবস্থান করুন। কেননা, হেজাযে আপনার চাইতে বড় আর কেহ নাই। ইরাকবাসীরা যদি আপনাকে ডাকে, তবে তাহাদিগকে বলুন, সর্বপ্রথম তাহারা শত্রুদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া পরে যেন আপনাকে আহ্বান করে। যদি আপনি হেজায হইতে যাইতেই চান তবে ইয়ামান চলিয়া যান। সেখানে মজবুত দুর্গ ও দুর্গম পর্বতমালা রহিয়াছে। দেশ প্রশস্ত এবং অধিবাসীগণ সাধারণতঃ আপনার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেখানে আপনি শত্রুদের কবল হইতে অনেকটা দূরে থাকিতে পারিবেন এবং দূত ও পত্র মারফত অন্যান্য এলাকায় আপনার দাওয়াত প্রেরণ করতঃ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন।"

কিন্তু হযরত হোসাইন জওয়াব দিলেন ঃ "ভ্রাতা! আমি জানি, তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছি।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলিলেন, "যদি আমার কথা একান্তই না মানেন তবে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন না। আমার সন্দেহ হয়, আপনিও হয়ত শেষ পর্যন্ত হযরত উসমানের ন্যায় নিজের পরিবার-পরিজনের সম্মুখেই শহীদ হইবেন।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনার কেশ আকর্ষণ করিয়া চিৎকার করার পর লোক একত্রিত হইলে আপনি এই সর্বনাশা ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া যদি আমার আস্থা জন্মিত, আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি শেষ পর্যন্ত আপনার কেশই আকর্ষণ করিতাম।– (ইবনে জরীর)

কিন্তু এতকিছুর পরও হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের পত্র

অনুরূপভাবে আরও অনেকেই হযরত ইমাম সাহেবকে কুফা যাত্রা হইতে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁহার চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর পত্র লিখিলেন,— "আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিতেছি, এই পত্র পাঠমাত্র স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। কেননা, এই পথে আপনার জন্য ধ্বংস এবং আপনার পরিবার-পরিজনের সর্বনাশ নিহিত রহিয়াছে। আপনি যদি নিহত হন তবে পৃথিবীর নূর চিরতরে নিভিয়া যাইবে। এইক্ষণে একমাত্র আপনিই হেদায়েতের পতাকা এবং ঈমানদারদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যাত্রার জন্য তাড়াহুড়া করিবেন না। আমি আসিতেছি!" –(ইবনে জরীর, কামেল, মাক্তাল ইবনে আহনাফ ইত্যাদি)

ওয়ালীর পত্র

আবদুল্লাহ পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, ইয়াযিদের নিয়োজিত মক্কার ওয়ালী আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল আসের নিকট গমন করতঃ বলিলেন, হোসাইন ইবনে আলীকে পত্র

লিখ এবং সর্বদিক দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া দাও। আমর বলিলেন, আপনি স্বয়ং পত্র লিখিয়া আনুন, আমি উহাতে সীলমোহর দিয়া দিতেছি। আবদুল্লাহ্ ওয়ালীর তরফ হইতে এই পত্র লিখিলেন,— "আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ্ আপনাকে এই পথ হইতে সরাইয়া দেন, যে পথে নিশ্চয়ই ধ্বংস নিহিত রহিয়াছে এবং প্রার্থনা করি, যেন সেই পথে পরিচালিত করেন, যে পথে আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। তাঁহাদের সহিত ফিরিয়া আসুন। আমার এখানে আপনার মতবিরোধ ও সংঘর্ষের পথ হইতে আল্লাহ্ তাআলার পানাহ্ ভিক্ষা করি। আমি আপনার সর্বনাশকে ভয় পাই। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ও ইয়াহইয়া সায়ীদকে আপনার জন্য মঙ্গল রাখিয়াছেন। জন্য শান্তি, নিরাপত্তা, শ্রদ্ধা ও সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি রহিল। আল্লাহ্ সাক্ষী। তিনিই এই প্রতিশ্রুতির নেগাহ্বান।" এতদসত্ত্বেও হযরত হোসাইন (রা.) স্বীয় সংকল্পে অটল রহিলেন।

ফারাযদাকের সহিত সাক্ষাত

মদীনা হইতে হযরত হোসাইন (রা.) ইরাকের পথে রওয়ানা হইয়া গেলেন। সাফ্ফাহ নামক স্থানে আহ্লে বায়ত-ভক্ত বিখ্যাত কবি ফারাযদাকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হযরত ইমাম জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তোমাদের ঐ দিককার লোকদের কি মতামত?" ফারাযদাক জবাব দিলেন, "লোকদের অন্তর আপনার প্রতি আর তরবারি বনী উমাইয়ার প্রতি।" হযরত ইমাম বলিলেন,- সত্য বলিতেছ, কিন্তু এখন পরিণাম একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাহা চান তাহাই হইয়া থাকে। আমার প্রতিপালক প্রতিমুহূর্তেই কোন না কোন নির্দেশ দিয়া থাকেন, যদি তাঁহার ইচ্ছা আমার অনুকূল হয় তবে তাঁহার প্রশংসা-কীর্তন করিব। আর যদি আমার আশার প্রতিকূল হয় তবুও আমার নিষ্ঠা এবং নিয়তের পুণ্য কোথাও যাইবে না। এই কথা বলিয়া আবার সোয়ারী সম্মুখের দিকে চালাইতে লাগিলেন। –(ইবনে আকীল)

মুসলিম ইবনে আকীল

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ফররুদ নামক স্থানে পৌছিয়া শুনিতে পাইলেন, তাঁহার নায়েব মুসলিম ইবনে আকীলকে কুফাস্থ ইয়াযিদের শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রকাশ্যে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। তেমন কেহ তাঁহার সহযোগিতা করিতেও আগাইয়া আসে নাই। এই খবর শুনিয়া বার বার তিনি ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন পড়িতে লাগিলেন। কোন কোন সঙ্গী বলিলেন, এখনও সময় আছে, আমরা আপনার এবং আপনার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি; এখনও ফিরিয়া চলুন। কুফায় আপনার সাহায্যকারী একটি প্রাণীও নাই। সকলেই আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।

এই কথা শুনিয়া হযরত ইমাম একটু থামিয়া ফিরিয়া যাওয়ার কথা ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীলের স্বজনগণ দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর শপথ, আমরা কিছুতেই ফিরিব না। আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিব অথবা স্বীয় ভ্রাতার ন্যায় মৃত্যুবরণ করিব। এই কথা শুনিয়া হযরত ইমাম সঙ্গীগণের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন— অতঃপর আর জীবনের কোন স্বাদই অবশিষ্ট রহিল না। -(ইবনে জরীর)

সঙ্গীদের প্রত্যাবর্তন

একদল বেদুঈন হযরত ইমামের সহিত কুফায় রওনা হইয়াছিল। তাহারা মনে করিতেছিল, কুফায় যাইয়া বিশেষ আরাম পাইবে। হযরত ইমাম উহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকেফহাল ছিলেন। পথে একস্থানে সকলকে সমবেত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকসকল, আমার নিকট ভয়ানক খবর আসিয়াছে। মুসলিম ইবনে আকীল, হানি ইবনে ওরওয়া এবং আবদুল্লাহ ইবনে বুকতির নিহত হইয়াছেন। আমাদের কোন সাহায্যকারী অবশিষ্ট নাই। যাহারা আমার সঙ্গ ছাড়িতে চাও, স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পার, আমি কখনও তাহাদের উপর বিরক্ত হইব না।" এই কথা শোনার পর বেদুঈনগণ ধীরে ধীরে তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।- (ইবনে জরীর)

হোর ইবনে ইয়াযিদের আগমন

কাদেসিয়া পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কর্মচারী হোসায়ন ইবনে নোমায়র তামিমীর তরফ হইতে হোর ইবনে ইয়াযিদ এক সহস্র সৈন্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের উপর নির্দেশ ছিল, হযরত হোসাইনের সহিত লাগিয়া থাকিয়া তাহাকে যেন ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সম্মুখে লইয়া আসে। ইতিমধ্যেই জোহরের নামাযের সময় হইল। হযরত ইমাম তহবন্দ পরিধান করতঃ চটি পায়ে ও চাদর গায়ে দিয়া সঙ্গীগণ এবং হোরের সৈন্যদের সম্মুখে আসিয়া বক্তৃতা দিলেন—

"লোকসকল, আল্লাহর সম্মুখে এবং তোমাদের সম্মুখে আমার কৈফিয়ত হইতেছে; আমি এখানে নিজ ইচ্ছায় আগমন করি নাই। আমার নিকট তোমাদের পত্র পৌছাইয়াছে; কাসেদ আসিয়াছে। আমাকে এই মর্মে বার বার আহ্বান জানানো হইয়াছে, আমাদের কোন ইমাম নাই। আপনি আসুন যেন আল্লাহ্ আমাদিগকে আপনার মাধ্যমে একত্রিত করেন। এখনও যদি তোমাদের মনের সেই অবস্থা থাকিয়া থাকে তবে শোন, আমি আসিয়া পড়িয়াছি। যদি তোমরা আমার হাতে শপথ গ্রহণ করিতে আসিয়া থাক তবে আমি

শান্ত মনে তোমাদের শহরে যাইতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তোমরা আমার আগমনে অসন্তুষ্ট হইয়া থাক তবে আমি যেখান হইতে আসিয়াছি সেখানেই চলিয়া যাইতেছি।" হযরত ইমামের এই বক্তৃতার কেহ কোন প্রকার জওয়াব দিল না। দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর লোকেরা মোয়াজ্জেনকে আজান দেওয়ার কথা বলিল। হযরত ইমাম হোর ইবনে ইয়াযিদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তোমরা কি পৃথকভাবে নামায পড়িবে"? হোর বলিল, না; আপনি ইমামত করুন, আমরা আপনার পশ্চাতে নামায পড়িব। সেখানেই তিনি আসরের নামাযও পড়িলেন। শত্রু-মিত্র সকলে মিলিয়া তাঁহার একতেদা করিল। নামাযের পর তিনি পুনরায় খুৎবা দিলেন ঃ

"লোকসকল, যদি তোমরা খোদাভীরুতার পথে থাকিয়া থাক, আর হকদারদের হক সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া থাক, তবে উহা খোদার সন্তুষ্টির কারণ হইবে। আমরা রসূলে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আহ্‌লে বায়ত, বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের চাইতে রাষ্ট্রক্ষমতার বেশী হকদার। উহাদের হুকুমত করার কোন অধিকার নাই। উহারা লোকের উপর অত্যাচার করিয়া রাজত্ব করিতেছে, কিন্তু তোমরা যদি আমাকে অপছন্দ কর, আমার মর্তবা সম্পর্কে সচেতন না থাক এবং তোমরা অসংখ্য পত্রে ও প্রতিনিধি মারফত আমাকে যে কথা শুনাইয়াছিলে, তোমাদের বর্তমান মতামত তাহার বিপরীত হইয়া গিয়া থাকে, তবে আমি ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।"

এই কথা শুনিয়া হোর বলিল,- আপনি কোন্ পত্রের কথা বলিতেছেন? এই সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ওক্‌বা ইবনে আশ্‌আসকে কূফাবাসীদের পত্রে বোঝাই দুইটি থলি বাহির করিয়া আনিতে নির্দেশ দিলেন। ওক্‌বা থলি ঝাড়িয়া পত্রের স্তূপ বাহির করিলেন। এইগুলি দেখিয়া হোর বলিল, যাহারা এই সমস্ত পত্র লিখিয়াছে আমরা তাহারা নই। আমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আপনাকে কুফার শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

হযরত ইমাম বলিলেন,— "কিন্তু উহা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ অসম্ভব।" অতঃপর তিনি যাত্রার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু শত্রুরা রাস্তা বন্ধ করিয়া দিল। হযরত ইমাম রাগান্বিত হইয়া হোরকে বলিলেন,—হতভাগ্য! কি চাও? হোর উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ, যদি আপনি ব্যতীত অন্য কোন আরব আমাকে এইরূপ কথা বলিত তবে তাহার কল্যাণ ছিল না, কিন্তু আমি আপনাকে কটু কথা বলিতে পারিব না।

হযরত ইমাম বলিলেন, "তুমি কি চাও?"

হোর জওয়াব দিল, আমি আপনাকে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট লইয়া যাইতে

হযরত ইমাম বলিলেন, কিন্তু আমি আর তোমাদের সহিত যাইতেছি না। হোর বলিল, আমিও আপনার পিছন ছাড়িতেছি না। কথা যখন বেশী বাড়িয়া চলিল তখন হোর বলিল, আমাকে আপনার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যদি আপনার উহা পছন্দ না হয় তবে আপনি এমন এক পথে যাত্রা করুন যাহা কুফা অথবা মদীনায় যায় নাই। আমি ইবনে যিয়াদকে লিখিয়া জানাইয়া দেই। অথবা আপনিও যদি চান তবে ইয়াযিদ কিংবা ইবনে যিয়াদকে এই মর্মে লিখিতে পারেন। এইভাবে হয়ত আমি এই ব্যাপারে চরম পরীক্ষা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যাইব। হযরত ইমাম এই কথায় সম্মত হইয়া অন্য পথে যাত্রা করিলেন।– (ইবনে জরীর, কামেল)

আর একটি বক্তৃতা

পথিমধ্যে হযরত ইমাম আরও কয়েক স্থানে বক্তৃতা দেন। বায়জা নামক স্থানে পৌছিয়া শত্রু-মিত্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

"লোকসকল, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলিয়াছেন, কেহ যদি এমন শাসনকর্তা দেখিতে পায় যে অত্যাচার করে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে, নবীর সুন্নতের বিরোধিতা করে, আল্লাহর বান্দাদের উপর অন্যায় ও উদ্ধতভাবে রাজত্ব করে, আর এইরূপ দেখার পরও যদি কথায় কাজে তাহার বিরোধিতা না করে, তবে আল্লাহ্ তাহাকে ভাল পরিণাম দিবেন না। দেখ, উহারা শয়তানের অনুসারী এবং আল্লাহর অবাধ্য হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে অন্যায়-অনাচার চলিয়াছে। আল্লাহর আইন অচল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জাতীয় সম্পদ, গনীমতের মাল উহারা অন্যায়ভাবে গ্রাস করিতেছে। আল্লাহর নির্ধারিত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালালে পরিণত করা হইতেছে। উহাদের এই উদ্ধত অন্যায়কে সত্য ও ন্যায়ে রূপান্তরিত করার আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক হকদার। তোমাদের অগণিত পত্র ও কাসেদ বায়আতের পয়গামসহ আমার নিকট পৌছিয়াছে। তোমরা শপথ করিয়াছ, আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। যদি তোমরা সেই প্রতিশ্রুতি পালন কর তবে উহাই তোমাদের জন্য হেদায়েতের পথ। কারণ, আমি হোসাইন ইবনে আলী (রা.) ইবনে ফাতেমা– রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৌহিত্র। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সহিত রহিল। আমার পরিবার-পরিজন তোমাদের পরিবার-পরিজনের সহিত রহিল। আমাকে তোমাদের আদর্শরূপে গ্রহণ কর! আমার পক্ষ হইতে মুখ ফিরাইয়া নিও না, কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পালন না কর, আর আমার তরফ হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, অবশ্য ইহাও তোমাদের পক্ষে কোন বিচিত্র ব্যাপার হইবে না।

তোমরা আমার পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃব্য-পুত্র মুসলিমের সহিত তাহাই করিয়াছ। যাহারা তোমাদের উপর ভরসা করে, তাহারা নিঃসন্দেহে প্রতারিত, কিন্তু স্মরণ রাখিও, তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছ এবং এখনও নিজেদেরই ক্ষতি করিবে। তোমরা নিজেদের অংশই হারাইয়াছ। নিজেদের ভাগ্য বিপর্যস্ত করিয়াছ। যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধেই বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। আশ্চর্য নয়, খোদা শীঘ্রই আমাকে তোমাদের হইতে নির্ভরহীন করিয়া দিবেন। আল্লাহ তোমাদিগকে শান্তি সমৃদ্ধি দান করুন।" -(ইবনে জরীর, কামেল)।

অন্য একটি বক্তৃতা

অন্য এক স্থানে এইরূপ বক্তৃতা প্রদান করিলেন— "পরিস্থিতি কোথায় গড়াইয়াছে তাহা তোমরাও অনুধাবন করিয়াছ। দুনিয়া খালি হইয়া গিয়াছে, মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। পুণ্য হইতে জগৎ খালি হইয়া গিয়াছে। সামান্য অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে। আমার তুচ্ছ জীবন এখনও বাকী আছে। চারিদিকে বিভীষিকা পাখা বিস্তার করিয়াছে। আক্ষেপের বিষয়, তোমরা কি দেখিতেছ না, সত্য পশ্চাতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর অন্যায় অসত্যের উপর প্রকাশ্যে আমল করা হইতেছে। এমন কেহ নাই যে আজ সত্যের প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ করে। সময় আসিয়াছে যখন মুমিন সত্যের পথে আল্লাহর ইচ্ছা কামনা করিবে, কিন্তু আমি শহীদের মৃত্যুই কামনা করি। জালেমের সহিত জীবিত থাকাই একটি মহাপাপ।"

হযরত ইমামের এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া যোবায়র ইবনুল কাইয়েন বাজালী উঠিয়া বলিলেন,- "তোমরা কিছু বলিবে কি, না আমি বলিব"? সকলে বলিল, তুমি বল।

যোবায়র বলিতে লাগিলেন,- হে রসূলের (সা.) বংশধর! আল্লাহ আপনার সহায়তা করুন। আপনার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি। আল্লাহর শপথ, দুনিয়া যদি চিরস্থায়ীও হয় আর এখানে যদি আমাদের চিরকাল বসবাস করারও ব্যবস্থা হয়, তবুও আপনার জন্য আমরা এই দুনিয়া ত্যাগ করিতে পারি। অনন্ত জীবনে আপনার সঙ্গসুখ লাভের জন্য আপনার সহিত মৃত্যুবরণকে শ্রেষ্ঠ মনে করিব।

হোরের হুমকি

হোর ইবনে ইয়াযিদ সব সময়ই হযরত ইমামের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। সে বার বার বলিতেছিল,- "হে হোসাইন (রা.), নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে খোদাকে স্মরণ করুন। আমি জোরের সহিত বলিতেছি, আপনি যদি যুদ্ধ করেন তবে অবশ্যই নিহত হইবেন।"

একবার হযরত ইমাম রাগান্বিত হইয়া বলিলেন- "তুমি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাইতেছ? তোমাদের দুঃসাহস কি এই পর্যন্ত পৌছিবে যে, শেষ পর্যন্ত আমাকে হত্যা

করিবে? আমি ভাবিয়া পাই না, তোমাকে কি জওয়াব দিব," কিন্তু আমি ঐ কথাই বলিব— রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী জেহাদে যাওয়ার পথে ভ্রাতার শাসানী শুনিয়া যাহা বলিয়াছেন—

"এবং যখন সে জীবন দান করতঃ সৎকর্মশীলদের সাহায্যকারী হইল এবং প্রতারক জালেম ধ্বংসোন্মুখের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল।"

চারি জন কুফাবাসীর আগমন

আজীবুল হাজানাত নামক স্থানে চারি জন কুফাবাসী আরোহীকে আসিতে দেখা গেল। তাহাদের অগ্রে অগ্রে তেরমাহ ইবনে আদী কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন। তাহার আবৃত্তিকৃত কবিতার অর্থ হইল–

–"হে আমার উষ্ট্রী, আমার কঠোরতায় ভীত হইও না, সূর্যোদয়ের পূর্বেই সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হও।"

"সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমণকারীদিগকে লইয়া চল, সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমণে চল এবং শেষ পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট পৌছাও।"

"তাঁহারা সম্মানিত, স্বাধীনচেতা; প্রশস্ত বক্ষ, আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে সর্বদা নিরাপদ রাখুন।"

হযরত হোসাইন (রা.) এই কবিতা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন— "আল্লাহর শপথ, আমার এই আশাই ছিল, আল্লাহ্ আমাদের সহিত মঙ্গল দান করার ইচ্ছা রাখেন, নিহত হই অথবা জয়যুক্তই হই।"

হোর ইবনে ইয়াযিদ আগন্তুকদিগকে দেখিয়া হযরত ইমামকে বলিতে লাগিল, উহারা কুফার লোক, আপনার সঙ্গী নয়। আমি উহাদিগকে বাধা দান করিব এবং এখান হইতেই ফিরাইয়া দিব।

হযরত ইমাম বলিলেন, "তোমরা অঙ্গীকার করিয়াছ, ইবনে যিয়াদের পত্র আসার পূর্ব পর্যন্ত আমার কোন কর্মে বাধা দিবে না। যদিও আমার সঙ্গে আসে নাই, কিন্তু ইহারা আমার সাথী। যদি তাহাদের সহিত কোন দুর্ব্যবহার কর তবে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।" এই কথা শুনিয়া হোর চুপ হইয়া গেল।

কুফাবাসীদের অবস্থা

হযরত ইমাম আগন্তুকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "কুফাবাসীদিগকে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ?" তাঁহারা জওয়াব দিলেন,— "শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে ঘুষ প্রদান করিয়া বাধ্য করিয়া ফেলা হইয়াছে। জনসাধারণের অন্তর অবশ্য আপনার দিকে, তবে

তাহাদের সকলের তরবারিই আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইবে।"– (ইবনে জরীর)

ইতিপূর্বে হযরত ইমাম কায়স ইবনে মুহেরকে দূতরূপে কুফায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন পর্যন্ত হযরত ইমাম এই খবর জানিতেন না। তিনি আগন্তুকদের নিকট দূতের খবর জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। দূতের নিহত হওয়ার খবর শুনিয়া হযরত ইমামের চক্ষু অশ্রু প্লাবিত হইয়া উঠিল। তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন— "তাহাদের মধ্যে কিছু লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন আর কিছু লোক মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু এই অবস্থায়ও তাঁহারা সত্যের পথে দৃঢ় রহিয়াছেন, অন্য পথ অবলম্বন করেন নাই। হে খোদা, আমাদের জন্য এবং তাঁহাদের জন্য জান্নাতের পথ খুলিয়া দাও। তোমার রহমত ও পুণ্যের স্থানে আমাদিগকে ও তাহাদিগকে একত্রিত কর।"

তেরমাহ্ ইবনে আদীর পরামর্শ

তেরমাহ্ ইবনে আদী বলিতে লাগিলেন, "আল্লাহর শপথ, আমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতেছি, কিন্তু আপনার সহিত কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। আপনার পশ্চাতে যাহারা লাগিয়া রহিয়াছে, তাহারাই যদি ঝাঁপাইয়া পড়ে, তবে এই ক্যাফেলার কেহই নিষ্কৃতি পাইবে না। তদুপরি কুফার উপকণ্ঠে একমাত্র হোসাইনের সহিত লড়াই করার জন্য এতবড় এক জনতাকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া আসিয়াছি যে, এত লোক আমি কখনও একত্রে দেখি নাই। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, যদি সম্ভব হয় তবে আর এক পা-ও অগ্রসর হইবেন না। আপনি যদি এমন স্থানে যাইতে চান যেখানে শত্রুরা আপনার নাগাল পাইবে না, তবে আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনাকে আজা নামক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় লইয়া যাইব, সেখানে অন্ততঃ বিশ সহস্র 'তাই' গোত্রীয় লোক আপনার পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইবে। যে পর্যন্ত তাহাদের জীবন অবশিষ্ট থাকিবে, আপনার দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।"

হযরত ইমাম জওয়াব দিলেন— "আল্লাহ্ তোমাকে ইহার সৎ পরিণাম দান করুন, কিন্তু আমার আর উহাদের মধ্যে চুক্তি হইয়াছে, আমি উহাদের নিকট হইতে একপদও অন্যদিকে চালনা করিতে পারি না। উহাদের আর আমার অবস্থা কোথায় গিয়া শেষ হয় তাহা এখনও কিছু বলা যায় না।"

নিদারুণ স্বপ্ন

এতদিন হযরত ইমামের অন্তরে স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 'কাসরে বনী মাকাতেল' নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি সামান্য তন্দ্রাগ্রস্ত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। জাগ্রত হইয়া বার বার 'ইন্না লিল্লাহ' পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র আলী আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন— ইন্না লিল্লাহ পড়ার অর্থ কি আব্বা? হযরত ইমাম বলিলেন, বৎস, এখন একটু তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখি, একজন অশ্বারোহী ছুটিয়া আসিতেছেন এবং বলিতেছেন,— "লোক সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে আর মৃত্যু তাহাদের সঙ্গে চলিয়াছে।" আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এতদ্দ্বারা আমাদের মৃত্যু সংবাদই শোনানো হইয়াছে।

আলী আকবর বলিলেন, আল্লাহ্ আপনাকে এমন মন্দ দিন না দেখান। আমরা কি সত্য পথে নই? হযরত ইমাম বলিলেন, নিশ্চয় আমরা সত্য পথে রহিয়াছি। এই কথা শুনিয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যদি আমরা সত্য পথেই থাকি তবে মৃত্যুর আর কোন পরোয়া নাই।" হযরত ইমামের এই পুত্রই কারবালার ময়দানে শহীদ হইয়াছিলেন। –(ইবনে জরীর)।

ইবনে যিয়াদের পত্র

প্রত্যূষে হযরত ইমাম পুনরায় যাত্রা শুরু করিলেন। এইবার তিনি সঙ্গী সাথীগণকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হোর উহাতে বাধা দান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কুফার দিক হইতে জনৈক অশ্বারোহীকে ছুটিয়া আসিতে দেখা গেল। লোকটি অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। আগন্তুক হযরত হোসাইনের তরফ হইতে মুখ ফিরাইয়া নিল এবং হোরকে সালাম দিল। সে হোরের সম্মুখে ইবনে যিয়াদের পত্র পেশ করিল। পত্রে লেখা ছিল, "হোসাইনকে কোথাও টিকিতে দিও না। খোলা ময়দান ব্যতীত কোথাও যেন তিনি বিশ্রাম করিতে না পারেন। রক্ষিত স্থানে অথবা লোকালয়ের নিকট যেন তিনি শিবির স্থাপন করিতে না পারেন। আমার এই কাসেদই তোমার কার্য পরীক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকিবে।"

হোর পত্রের মর্ম সম্পর্কে হযরত ইমামকে জ্ঞাত করাইয়া বলিল, "এখন আমি নিরুপায়। তৃণ-গুল্মহীন প্রান্তর ব্যতীত এখন আর কোথাও আপনাকে শিবির স্থাপন করিতে দিতে পারি না।" যোবায়র ইবনে কাইয়েন নিবেদন করিলেন, পরে যে বিরাট বাহিনী আসিতেছে তাহাদের চাইতে এখন আমাদের সহিত যাহারা চলিয়াছে, উহাদের সহিত যুদ্ধ করা সহজ, কিন্তু হযরত ইমাম যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি আমার পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিতে চাহি না।" যোবায়র বলিলেন, "তবে সম্মুখের ফোরাত তীরবর্তী ঐ লোকালয়ে চলুন। তথায় আমরা শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে থাকিব।" হযরত ইমাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্থানের নাম কি? যোবায়র বলিলেন, 'আক্‌র' (আক্‌র অর্থ কন্টকাকীর্ণ বা ফলহীন)। এই কথা শুনিয়া হযরত ইমাম ম্লান মুখে

বলিলেন— "আক্‌র হইতে আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাই।"- (ইবনে জরীর)

কারবালা প্রান্তরে

শেষ পর্যন্ত হযরত ইমাম তৃণ-গুল্মহীন এক শুষ্ক প্রান্তরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। স্থানটি নদী হইতে একটু দূরে অবস্থিত ছিল। নদী ও প্রান্তরের মধ্যে ছিল পার্বত্য এলাকা। স্থানটির নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, 'কারবালা'। হযরত ইমাম বলিলেন, কারব (যাতনা) ও বালা (বিপদ)। ইহা হিজরী ৬১ সনের ২রা মহররমের ঘটনা। -(আল ইমামাতু ওয়াস সিয়াসাতু)

দ্বিতীয় দিন আমর ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস চারি হাজার কুফাবাসী সৈন্য লইয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। আমর এই অভিযানে আসিতে চাহিতেছিলেন না। একাধিকবার তিনি এই মহাপরীক্ষা হইতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ তাঁহাকে জোর করিয়া প্রেরণ করিয়াছিল।

আমর ইবনে সাদ কারবালায় পৌঁছিয়া কাসেদ প্রেরণ করিয়া হযরত ইমামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এখানে কেন আগমন করিয়াছেন? হযরত ইমাম হোর ইবনে ইয়াযিদের নিকট যে জওয়াব দিয়াছিলেন, পুনরায় সেই জওয়াবই দিলেন। তিনি বলিলেন, "অগণিত পত্র ও কাসেদ মারফত তোমরা আমাকে আহ্বান করিয়াছ। এখন যদি আমার আগমন তোমাদের পছন্দ না হইয়া থাকে, তবে আমি ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।"

হযরত ইমামের উত্তর শুনিয়া আমর ইবনে সাদ সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মনে করিলেন, হয়ত সহজেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্র লিখিয়া ইবনে যিয়াদকে এই কথা জানাইয়া দিলেন। পত্র পাঠ করিয়া ইবনে যিয়াদ বলিতে লাগিল, "এখন হোসাইনকে বল, সর্বপ্রথম যেন তিনি সপরিবারে ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়ার হাতে আনুগত্যের শপথ করেন। অতঃপর আমরা তাঁহার সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিতে পারি।" হোসাইনের শিবিরে যেন এক ফোঁটা পানি পৌঁছাইতে না পারে। যেরূপ হযরত ওসমান পানি হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

নিরুপায় হইয়া আমর ইবনে সাদ পানির ঘাটে পাঁচশত সৈন্য মোতায়েন করিলেন। হযরত ইমামের শিবিরে পানি বন্ধ হইয়া গেল। হযরত ইমাম স্বীয় ভ্রাতা হযরত আব্বাস ইবনে আলীকে ত্রিশ জন অশ্বারোহী ও বিশ জন পদাতিকসহ পানি আনিতে নির্দেশ দিলেন। হযরত আব্বাস পানির ঘাটে পৌঁছিলে প্রতিরোধকারী বাহিনীর সেনাপতি আমর ইবনে হাজ্জাজের সহিত সংঘর্ষ হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহারা বিশ মশক পানি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন।

আমর ইবনে সাদের সহিত সাক্ষাত

সন্ধ্যার সময় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) আমর ইবনে সাদের সহিত সাক্ষাত করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। দুই পক্ষের বিশ জন করিয়া অশ্বারোহীসহ মধ্যবর্তী এক স্থানে রাত্রিবেলা মিলিত হইলেন। দীর্ঘক্ষণ উভয়ের মধ্যে গোপনে আলোচনা চলিল। আলোচনা সম্পূর্ণ গোপন ছিল, কিন্তু লোকদের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল, হযরত ইমাম আমর ইবনে সাদকে বলিয়াছিলেন, চল আমরা উভয়ে স্ব-স্ব সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া গোপনে ইয়াযিদের নিকট চলিয়া যাই। এই কথার প্রত্যুত্তরে আমর ইবনে সাদ বলিয়াছিলেন, যদি আমি এরূপ করি, তবে আমার গৃহ খনন করিয়া ফেলা হইবে।

হযরত ইমাম বলিয়াছিলেন, তোমার ধ্বংস করা গৃহ আমি মেরামত করিয়া দিব। আমর বলিয়াছিলেন, আমার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে। হযরত ইমাম বলিয়াছিলেন, আমি আমার হেজাযের সম্পত্তি দ্বারা তোমার সকল ক্ষতিপূরণ করিয়া দিব, কিন্তু আমর এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। -(ইবনে জারীর)

অতঃপর আরও তিন-চারি বার উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হয়। হযরত ইমাম সর্বশেষে তিনটি প্রস্তাব পেশ করিলেন-

১. আমাকে সেখানে ফিরিয়া যাইতে দাও, যেখান হইতে আমি আসিয়াছি।

২. স্বয়ং ইয়াযিদের সহিত আমাকে বোঝাপড়া করিতে দাও।

৩. অথবা আমাকে মুসলমানদের কোন লোকালয়ে পাঠাইয়া দাও। সেখানকার লোকদের যে পরিণাম হয় আমারও তাহাই হইবে।

আমরের পত্র

কয়েকবার সাক্ষাতের পর আমর ইবনে সাদ ইবনে যিয়াদের নিকট পুনরায় পত্র লিখিলেন ঃ খোদা গোলমাল ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছেন! পরস্পরের অনৈক্য দূর করিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। জাতির এই সমস্যা সহজ হইয়া আসিয়াছে। হোসাইন আমার সহিত তিন শর্তের যে কোন একটি মানিতে সম্মত হইয়াছেন। এর মধ্যে তোমার জন্যও মঙ্গল, জাতির জন্যও মঙ্গল।

ইবনে যিয়াদ এই পত্র পাঠ করিয়া অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়া আমর ইবনে সাদের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, আমি এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিতেছি, কিন্তু শিমার যিল জোশান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলিতে লাগিল, "হোসাইন সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছেন। এমতাবস্থায় যদি তিনি আপনাদের পূর্ণ

আনুগত্য স্বীকার না করিয়া ফিরিয়া যান, তবে আশ্চর্য নয় যে, পুনরায় তিনি শক্তি সঞ্চয় করিয়া আপনাদের শক্তি নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার প্রয়াস পাইবেন। এখন যে পর্যন্ত তিনি পূর্ণভাবে আপনাদের আনুগত্য স্বীকার না করেন, সেই পর্যন্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। আমি জানিতে পারিয়াছি, আমর এবং হোসাইন রাত ভরিয়া পরস্পর আলোচনা করিয়া থাকেন।"

ইবনে যিয়াদের উত্তর

ইবনে যিয়াদ শিমারের যুক্তিই শেষ পর্যন্ত মানিয়া লইল এবং শিমারকেই পত্রের জওয়াবসহ প্রেরণ করিল। পত্রের মর্ম ছিল নিম্নরূপ ঃ "হোসাইন যদি সপরিবারে নিজেকে আমাদের নিকট সমর্পণ করেন, তবে যুদ্ধ করিও না। তাঁহাকে ছহি-ছালামতে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও। যদি তিনি আত্মসমর্পণ না করেন তবে যুদ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।" শিমারকে মৌখিক নির্দেশ দিয়াছিলেন, "আমর ইবনে সাদ যদি আমার নির্দেশ ঠিকমত পালন না করেন, তবে তাহাকে সরাইয়া নিজেই সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করিও এবং হোসাইনের মাথা কাটিয়া আমার নিকট লইয়া আসিও।"

ইবনে যিয়াদের পত্রে আমর ইবনে সাদকে বিশেষভাবে শাসাইয়াও দেওয়া হইল। তাহার পত্রে লিখা ছিল, "আমি তোমাকে এই জন্য প্রেরণ করি নাই যে, হোসাইনকে রক্ষা কর এবং আমার নিকট তাহার জন্য সুপারিশপত্র প্রেরণ কর। দেখ! আমার নির্দেশ পরিষ্কার। যদি তিনি আত্মসমর্পণ করেন তবে নিরাপদে আমার নিকট প্রেরণ কর। আর যদি অস্বীকার করেন তবে বিনা দ্বিধায় আক্রমণ কর, রক্ত প্রবাহিত কর। দেহ টুকরা টুকরা করিয়া ফেল। কেননা, তিনি ইহারই যোগ্য। মৃত্যুর পর তাহার মৃত দেহ অশ্বের খুরে পিষ্ট করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া ফেল। কেননা, তিনি বিদ্রোহী, আমাদের দলত্যাগী। আমি শপথ করিয়াছি তাহাকে অবশ্যই হত্যা করিব। যদি তুমি আমার এই নির্দেশ পালন কর তবে পুরস্কারের ভাগী হইবে। আর যদি অমান্য কর, তবে নিহত হইবে।

শিমার বিন যিল জোশান ও হযরত হোসাইন (রা.)

শিমার ইবনে যিল জোশান সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, তাহার ফুফী উম্মুল বানীন বিনতে খুররাম হযরত আলীর অন্যতমা পত্নী ছিলেন। ইহার গর্ভেই হযরত ইমাম হোসাইনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আব্বাস, আবদুল্লাহ, জাফর ও ওসমান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই হযরত হোসাইনের সহিত যুদ্ধে শামিল ছিলেন। এ সম্পর্কে শিমার এই চারি ভ্রাতার এবং তাঁহাদের সম্পর্কে খোদ হযরত হোসাইনের ফুফাতো ভাই হইত। কুফা হইতে যাত্রার সময় শিমার ইবনে যিয়াদের নিকট আবেদন

করিয়াছিল যেন তাহার আত্মীয় চতুষ্টয়কে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। ইবনে যিয়াদ শিমারের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিল। কারবালায় পৌঁছিয়া শিমার উক্ত চারি জনকে ডাকিয়া তাঁহাদের নিরাপত্তার কথা শুনাইয়া দিল। শুনিয়া তাহারা বলিতে লাগিলেন, আক্ষেপের বিষয়, তুমি আমাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছ, অথচ রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহামান্য বংশধরের জন্য নিরাপত্তা নাই।"

শিমার আমর ইবনে সাদকে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পত্র পৌঁছাইয়া দিল। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণভয়ে ইবনে যিয়াদের নির্দেশ পালন করিতে শুরু করিলেন।

সৈন্য পরিচালনা শুরু

আসর নামাযের পর আমর ইবনে সাদ সৈন্যদিগকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সৈন্যদল নিকটবর্তী হইলে ইমাম শিবির হইতে হযরত আব্বাস বিশ জন অশ্বারোহীসহ অগ্রসর হইলেন। আমর ইবনে সাদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ইবনে যিয়াদের পত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে- পত্রের বিবরণ এইরূপ। হযরত আব্বাস হযরত ইমামকে খবর দেওয়ার জন্য শিবিরের দিকে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে উভয়পক্ষের উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে মৌখিক বচসা শুরু হইয়া গেল। বর্ণনাকারীগণ এই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হযরত ইমামের পক্ষ হইতে হাবীব ইবনে নাজ্জার বলিলেন, "আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম লোক হইবে তাহারা, যাহারা হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আওলাদ ও কুফার তাহাজ্জুদ-গোজার লোকদের রক্তে হাত রঞ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে।"

ইবনে সাদের শিবির হইতে ওরওয়া ইবনে কায়স উত্তর দিল, শাবাশ, নিজেদের মহিমাকীর্তন করিতে থাক। মুখ ভরিয়া নিজেদের পবিত্রতার কথা ঘোষণা কর। যুহাইর ইবনে কাইয়েন বলিলেন, "হে ওরওয়া, স্বয়ং খোদা এই মানুষগুলিকে পবিত্র করিয়া দিয়াছেন এবং হেদায়েতের সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। খোদাকে ভয় কর এবং এই পবিত্র লোকগুলির হত্যার পথে ভ্রান্ত দলের সাহায্যকারী হইও না।" ওরওয়া বলিতে লাগিল, "হে যোহায়র, তুমি তো এই পরিবারের সমর্থক ছিলে না। ইতিপূর্বে তুমি কি ওসমানপন্থী ছিলে না?" যোহায়র বলিলেন, "হ্যাঁ, এই কথা সত্য, হোসাইনকে কখনও কোন পত্র লিখি নাই বা কোন কাসেদ তাঁহার নিকট প্রেরণ করি নাই। তবে ভ্রমণ করার সময় তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাত হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে দেখামাত্র রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা এবং তাঁহার প্রতি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভালবাসার কথা স্মরণ হইয়া গিয়াছে। আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম, তাঁহারা কত

শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখে গমন করিতেছেন। খোদা আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিলেন। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আমি ইঁহার সহযোগিতা করিব এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের যে অধিকার তোমরা হরণ করিয়া বসিয়া আছ তাহা উদ্ধার করার চেষ্টা করিব।"

হযরত ইমাম ইবনে যিয়াদের পত্রের মর্ম শুনিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন, যদি সম্ভবপর হয়, তবে উহাদিগকে আজকের মত ফিরিয়া যাইতে বল– যেন আজকের মত প্রাণ ভরিয়া আল্লাহর এবাদত করিয়া লইতে পারি। তাঁহার দরবারে প্রার্থনা ও গোনাহের মাফী চাহিয়া নিতে পারি। কেননা, তিনি জানেন, আমি তাঁহার এবাদত ভালবাসি। তাঁহার কিতাব ভক্তিভরে পাঠ করি। হযরত আব্বাস সৈন্যদলকে এই উত্তর শুনাইয়া দিলেন। সৈন্যগণ সেই দিনের মত পিছাইয়া গেল।–(ইবনে জরীর, ইয়াকুবী)

সঙ্গী-সাথীদের দৃঢ়তা

শত্রু সৈন্যগণ চলিয়া যাওয়ার পর হযরত ইমাম রাত্রি বেলায় সঙ্গী-সাথীগণকে খুৎবা দিলেন ঃ আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন করিতেছি। সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে সর্বাবস্থায়ই তাঁহার শুকরিয়া আদায় করি। ইলাহী, তোমার শোকর, তুমি আমাদের ঘরকে নবুওয়তের আলো দ্বারা সম্মানিত করিয়াছ। কোরআনের প্রজ্ঞা দান করিয়াছ। ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা দিয়াছ এবং আমিদিগকে দর্শন, শ্রবণ ও শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা দান করিয়াছ। অতঃপর ভাইসব, আজকে ভূপৃষ্ঠে আমার সঙ্গী-সাথীদের চাইতে ভাল লোক আরও আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। আমার পরিবার-পরিজনের চাইতে অধিক সমবেদনাশীল পরিবার-পরিজনও আজকের দুনিয়ায় আর কাহারও আছে কিনা সেই কথাও আমি জানি না। ভাইসব, তোমাদের সকলকে আল্লাহ্ আমার পক্ষ হইতে যোগ্য পরিণামফল দান করুন। আমার মনে হয় আগামীকল্যই আমার ও উহাদের মধ্যে শেষ ফয়সালা হইয়া যাইবে। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমার অভিমত এই যে, তোমরা সকলেই রাত্রের অন্ধকারে চুপি চুপি বাহির হইয়া যাও। আমার পরিবার-পরিজনের হাত ধরিয়া যে যে দিকে পার নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাও। আমি সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদিগকে বিদায় দিতেছি। আমার পক্ষ হইতে আর কোনই অভিযোগ থাকিবে না। উহারা কেবল আমাকেই চায়, আমার জীবন লইয়া উহারা তোমাদের কথা ভুলিয়া যাইবে।

এই কথা শুনিয়া হযরত ইমামের পরিবার নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। হযরত আব্বাস বলিতে লাগিলেন— "কেন? আপনার পরও আমাদের জীবিত থাকার লোভে? আল্লাহ যেন আমাদিগকে সেই দুর্দিন না দেখান।"

হযরত ইমাম মুসলিম ইবনে আকীলের আত্মীয়-স্বজনকে বলিলেন, "হে আকীলের আত্মীয় স্বজন, মুসলিম ইবনে আকীলের হত্যাই যথেষ্ট হইয়াছে, তোমরা চলিয়া যাও। আমি হৃষ্টচিত্তে তোমাদিগকে বিদায় দিতেছি।"

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, জনসাধারণ কি বলিবে; এই কথাই বলিবে নাকি যে, উহারা তাহাদের নেতা এবং বিপদগ্রস্ত বন্ধু-বান্ধবকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। আমরা তাহাদের উপর কোন তীর পর্যন্ত নিক্ষেপ করি নাই, বর্শা বা তরবারি পর্যন্ত চালাই নাই। না না, আল্লাহর শপথ, এইরূপ হইবে না। আমরা আপনার জন্য জান-মাল, পরিবার-পরিজন সবকিছুই কোরবান করিয়া দিব। আপনার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিব, আপনার যে পরিণাম দাঁড়ায় আমাদেরও তাহাই হইবে। আপনার পর যেন খোদা আমাদিগকে আর জীবিত না রাখেন।

হযরত ইমামের অন্যান্য সঙ্গী-সাথীগণও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুসলিম ইবনে আওসাজা আসাদী বলিলেন, "আমরা আপনাকে ছাড়িয়া যাইব? অথচ আপনার প্রতি আমাদের কর্তব্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই। আল্লাহর শপথ, কিছুতেই নহে। আমি আমার বর্শা শত্রুদের বক্ষে ভাঙ্গিব। হস্তদ্বয় যে পর্যন্ত কবজির সহিত থাকে সেই পর্যন্ত তরবারি চালনা করিব। হাত খালি হইয়া গেলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে মৃত্যুর কোলে লুটাইয়া পড়িব।"

সাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হানাফী বলিলেন, "যে পর্যন্ত খোদার নিকট এই কথা প্রমাণিত না হয় যে, আমরা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আমানত পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছি; সেই পর্যন্ত আমরা আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আল্লাহর শপথ, এই কথা যদি জানিতে পাই যে, আমাকে হত্যা করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে, আমার দেহের প্রজ্বলিত ছাই ভস্ম বাতাসে উড়ানো হইবে, একবার নয়, সত্তর বার আমার উপর এই পৈশাচিক অত্যাচার করা হইবে, তথাপি আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিব না।"

যোহায়র ইবনে কাইয়েন বলিলেন, আল্লাহর শপথ, আমাকে যদি সহস্রবারও করাত দ্বারা কর্তন করা হয়, তথাপি আপনার সাহচর্য ত্যাগ করিব না। আমার জীবন দিয়াও যদি আপনার এই পবিত্র খান্দানের একটি শিশুও বাঁচিয়া থাকে, তবুও উহা আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। –(ইবনে জরীর, কামেল ইত্যাদি)

হযরত যয়নবের অস্থিরতা

হযরত যয়নুল আবেদীন হইতে বর্ণিত আছে, আমার পিতার শাহাদাতের পূর্বরাত্রে আমি বসিয়া ছিলাম। আমার ফুফী হযরত যয়নব আমার নিকটেই বসিয়া ছিলেন। তখন

হঠাৎ করিয়া পিতা আমাদের তাঁবুতেই সকল সঙ্গী-সাথীগণকে সমবেত করিলেন। তাঁবুতে হযরত আবু জর গেফারীর গোলাম হোধবী তরবারি ধার দিতেছিলেন, আর আমার পিতা কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন–

يا دهراف لك مـن خليل # كم لك بالاشر اق والاصيل

من صاحب اوطالب قتيل # والدهر لايقنع بالبديل

وانما الامر الى الجليل # وكل حى سالك السبيل

– "হে যমানা, আক্ষেপ তোর জন্য! তুই কত বড় পরম বন্ধু। সকাল-সন্ধ্যা তোর হাতে কত ধ্বংস হইতেছে। যমানা কাহাকেও খাতির করে না, কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিদানও গ্রহণ করে না। আমার সকল সমাধান আল্লাহর হাতে। প্রত্যেক জীবিত বস্তুই তো মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইতেছে।"

পিতা তিন চারিবার এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন। আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল; চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু অতিকষ্টে আমি অশ্রু সংবরণ করিলাম। বুঝিতে পারিলাম, বিপদ কিছুতেই দূর হইতেছে না। আমার ফুফী এই কবিতা শ্রবণ করিয়া অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া হযরত ইমাম বলিতে লাগিলেন, ভগ্নী! এ কি শুরু করিলে! শেষ পর্যন্ত এরূপ না হয় যে, প্রবৃত্তি আর শয়তানের অধৈর্য আমাদের উপর জয়যুক্ত হইয়া যাইবে।" ফুফী বলিলেন, "যেখানে আপনি নিজ হস্তে নিহত হইতে যাইতেছেন, সেখানে কিরূপে ধৈর্য ধরা যায়।" হযরত ইমাম বলিলেন, "খোদার মীমাংসা এইরূপ।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার অধীরতা আরও বর্ধিত হইল। দুঃখে শোকে তিনি একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া হযরত ইমাম ধৈর্য ও দৃঢ়তা সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভগ্নী, খোদাকে ভয় কর। খোদার মহান শক্তি দেখিয়া সান্ত্বনা গ্রহণ কর। দুনিয়ার প্রত্যেক জীবের জন্য মৃত্যু রহিয়াছে। আকাশের ফেরেশ্তারাও চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে না। প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হইবে। তারপরও মৃত্যুর কথা ভাবিয়া এমন দুঃখ ও অধীরতা কেন? দেখ, আমাদের এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রসূলে খোদা জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ! তাঁহার জীবন হইতে আমরা সর্বাবস্থায় ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং খোদার বিধানের উপর ভরসা রাখারই শিক্ষা পাই। কোন অবস্থায়ই আমাদের এই পথ পরিত্যাগ করা উচিত নহে।"

এবাদতের রাত্রি

হযরত ইমাম শিবিরের সকলকে লইয়া এ রাত্রিটি নামায, দোয়া ও রোনাজারি করিয়া কাটাইয়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রুসৈন্যরা সারা রাত্রি আমাদের শিবিরের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। হযরত হোসাইন (রা.) তখন উচ্চৈঃস্বরে কোরআনের আয়াত পড়িতেছিলেন, আয়াতের অর্থ হল– "শত্রুরা মনে করে, আমাদের একটু বিরাম তাহাদের জন্য আনুকূল্যের সৃষ্টি করিতেছে, আমরা কেবল এই জন্য অবসর দিতেছি, যেন তাহাদের পাপের বোঝা আরও বর্ধিত হয়। আল্লাহ্ মুমিনদিগকে এরূপ অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিবেন না। তিনি পবিত্রকে অপবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দিবেন।"

শত্রুদের জনৈক অশ্বারোহী সৈন্য এই আয়াত শ্রবণ করতঃ চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল ঃ "কাবার প্রভুর শপথ, আমরাই পবিত্র, তোমাদের নিকট হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া নেওয়া হইয়াছে।"

শিমারের ধৃষ্টতা

শত্রুসৈন্যদের মধ্য হইতে শিমার যিল জোশান অশ্বারোহণ করিয়া বাহির হইল। ইমাম বাহিনীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "হে হোসাইন, কেয়ামতের পূর্বেই তুমি আগুন জ্বালাইয়া ফেলিয়াছ!" হযরত ইমাম জবাব দিলেন, "হে রাখাল সন্তান, তুইই আগুনের বেশী যোগ্য!" মুসলিম ইবনে আওসাজা নিবেদন করিলেন, আমাকে অনুমতি দিন, তীর নিক্ষেপ করিয়া পাপিষ্ঠকে শেষ করিয়া দেই। হতভাগ্য বড় কায়দায় আসিয়াছে। হযরত ইমাম নিষেধ করিয়া বলিলেন, "না না, আমি প্রথম যুদ্ধ করিতে চাহি না।"– (ইবনে জরীর)

আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ

শত্রুবাহিনীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া হযরত ইমাম হাত তুলিয়া আল্লাহর দরবারে দোয়া করিতে লাগিলেন, "ইলাহী, সব বিপদে তোমার উপরই আমার ভরসা। যে কোন সংকটে তুমিই আমার পৃষ্ঠপোষক। কত কঠোর বিপদ আসিয়াছে, অন্তর দুর্বল হইয়া আসিয়াছে, ভাবনা শক্তি স্থবির হইয়া গিয়াছে, বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, শত্রুরা আনন্দের জয়ধ্বনিতে মত্ত হইয়াছে, কিন্তু আমি সর্বাবস্থায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, তুমি সব সময় আমার প্রতি সাহায্যের হাত প্রশস্ত করিয়াছ। তুমিই সর্বকল্যাণের অধিকারী, তুমিই দয়ার একমাত্র মালিক। আজকের দিনেও তোমারই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি।" –(শরহে নাহজুল বালাগাহ)

শত্রুর সম্মুখে বক্তৃতা

শত্রুবাহিনী একেবারে নিকটবর্তী হইলে পর হযরত ইমাম একটি উষ্ট্রীর উপর দাঁড়াইয়া কোরআন সম্মুখে রাখিয়া বক্তৃতা দিতে শুরু করিলেন, "লোকসকল, আমার কথা শোন, তাড়াহুড়া করিও না। আমাকে কিছু বলিতে দাও। আমার কৈফিয়ত বর্ণনা করিতে দাও। আমার এখানে আগমনের কারণ শ্রবণ কর; যদি আমার কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য হয়, তোমরা যদি উহা গ্রহণ করিয়া আমার শত্রুতা হইতে বিরত হও, তবে উহা তোমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। আর যদি আমার কৈফিয়ত যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে না পার বা ন্যায়বিচার করিতে না চাও, তবে আমার আর কোন আপত্তি থাকিবে না। তোমরা সকলে মিলিয়া তখন আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িও। আমাকে সামান্য সময় না দিয়াই সকলে আক্রমণ করিও। আমি সর্বাবস্থায়ই কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখি। তিনি সৎকর্মশীলদের পৃষ্ঠপোষক।"

হযরত ইমামের বক্তৃতা শুনিয়া আহলে বায়তসহ শিবিরের সকলে অস্থির হইয়া উঠিলেন।...... তাঁবুর ভিতর হইতে ক্রন্দনের আওয়াজ আসিতে শুরু করিল। হযরত ইমাম স্বীয় ভ্রাতা হযরত আব্বাস ও পুত্র আলীকে প্রেরণ করিয়া সকলকে শান্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বলিলেন, এখনও তাহাদের অনেক ক্রন্দন বাকি রহিয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দীর্ঘজীবী করুন।" হযরত ইবনে আব্বাস শেষ পর্যন্ত পরিবার-পরিজনকে মদীনায় রাখিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। এই মুহূর্তে তাঁবুর ভিতর হইতে ক্রন্দনের আওয়াজ শুনিয়া হযরত ইবনে আব্বাসের কথা স্মরণ হইল। অতঃপর পুনরায় বক্তৃতা করিতে শুরু করিলেন, "লোক সকল, আমার বংশমর্যাদার কথা স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ আমি কে? এরপর আঁচলে মুখ লুকাইয়া অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর। ভাবিয়া দেখ, তোমাদের পক্ষে আমার মর্যাদার সম্পর্ক কর্তন করা, আমাকে হত্যা করা সমীচীন হইবে কি? আমি কি তোমাদের মহামান্য নবী-কন্যার পুত্র, তাঁর পিতৃব্য-পুত্রের সন্তান নই? সাইয়্যেদুশ-শোহাদা হযরত হামযা কি আমার পিতার পিতৃব্য ছিলেন না? হযরত জাফর তাইয়ার কি আমার পিতৃব্য নহেন? তোমরা কি আল্লাহর রসূলের প্রখ্যাত বাণী শোন নাই, আমার ও আমার ভ্রাতা সম্পর্কে যে তিনি বলিতেন, 'জান্নাতে শ্রেষ্ঠ যুবক হইবেন হাসান ও হোসাইন।' আমার এই ভাষণ যদি সত্য হয়, অবশ্যই ইহা সত্য, কেননা আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতে পারি, জ্ঞান হওয়ার পর হইতে এই পর্যন্ত আমি কখনও মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ করি নাই।

বল, ইহার পরও কি নাঙ্গা তরবারি হাতে তোমাদের পক্ষে আমার সম্মুখীন হওয়া উচিত হইবে? যদি তোমরা আমার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পার, তবে তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া লও। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীকে জিজ্ঞাসা কর! আবু সায়ীদ খুদরীর নিকট জিজ্ঞাসা কর; সাহল ইবনে সাদ সায়েদীকে জিজ্ঞাসা কর, যায়েদ ইবনে আরকাম অথবা আনাস ইবনে মালেকের নিকট জানিয়া লও। তাঁহারা বলিয়া দিবেন, তাঁহারা আমার এবং আমার ভ্রাতা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছেন কিনা? এই কথাও কি আমার রক্ত প্রবাহ বন্ধ করিতে পারে না? আল্লাহর শপথ, এই মুহূর্তে ভূ-পৃষ্ঠে আমি ব্যতীত আর কোন নবী-দুহিতার পুত্র অবশিষ্ট নাই। আমি তোমাদের নবীর দৌহিত্র। তোমরা কি কাহারও হত্যার অপরাধে আমার জীবন নাশ করিতে চাও। আমার অপরাধ কি?"

কুফাবাসীদের উদ্দেশে

হযরত ইমাম জনতাকে বার বার জিজ্ঞাস করিলেন, কিন্তু কেহ কোন প্রকার উত্তর দিল না, অতঃপর তিনি বিশিষ্ট কুফাবাসীদের এক একজনের নাম ধরিয়া ডাকিতে শুরু করিলেন, "হে আশআস ইবনে বারী, হে হেজাব ইবেন জাবের, হে কায়স ইবনে আশআস, হে ইয়াযিদ ইবনে হারেস, তোমরা কি আমাকে লিখ নাই, ফল পাকিয়া গিয়াছে, যমীন শস্যশ্যামল হইয়া উঠিয়াছে, নহর উথচাইয়া উঠিয়াছে, এমতাবস্থায় আপনি যদি কুফায় আগমন করেন তবে নিজের শক্তিশালী বাহিনীর নিকট আগমন করিবেন। শীঘ্র আসুন!

এই কথা শুনিয়া উহারা মুখ খুলিল, বলিতে লাগিল, কখনও নয়। আমরা কখনও আপনাকে এমন কথা লিখি নাই।

হযরত ইমাম চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "সুবহানাল্লাহ, কত বড় মিথ্যা কথা। আল্লাহর শপথ, তোমরাই এই কথা লিখিয়াছিলে।"

অতঃপর তিনি আবার বলিতে লাগিলেন— "লোকসকল, তোমরা যখন আমাকে অপছন্দ করিতে শুরু করিয়াছ তখন আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি যেখান হইতে আসিয়াছিলাম সেখানে ফিরিয়া যাই।"

এই কথা শুনিয়া কায়স ইবনে আশআস বলিতে লাগিল, ইহা কি ভাল নয় যে, আপনি আপনার জ্ঞাতিদের নিকট আত্মসমর্পণ করুন; তাঁহারা আপনি যাহা কামনা করেন, আপনার সহিত তদ্রূপ ব্যবহারই করিবেন! তাঁহাদের পক্ষ হইতে আপনার কোন অপকার করা

হইবে না।

হযরত ইমাম জবাব দিলেন, তোমরা সকলে একই থলির উপাদানবিশেষ। তোমরা কি চাও, বনী হাশেম তোমাদের নিকট মুসলিম ইবনে আকীল ব্যতীত আরও একটি খুনের প্রতিশোধ দাবী করুক? কখনই নহে! আল্লাহর শপথ, আমি হীনভাবে নিজেকে উহাদের হাতে সমর্পণ করিতে পারি না।

কুফাবাসীদের প্রতি যোহায়রের আবেদন

যুহাইর ইবনে কাইয়েন অশ্ব ছুটাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কূফাবাসীগণ, আল্লাহর আযাবকে ভয় কর। প্রত্যেক মুসলমানের উপর তাহার ভাইয়ের প্রতি উপদেশ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। দেখ, এখন পর্যন্ত আমরা সকলেই ভাই ভাই। সকলে একই ধর্ম এবং একই পথের উপর রহিয়াছি। যে পর্যন্ত তরবারি কোষমুক্ত না হয়, তোমরা আমাদের নসীহত ও হিতাকঙ্ক্ষার অধিকারী রহিয়াছ, কিন্তু তরবারির সম্মুখে আসার পরই পরস্পরের এই ভ্রাতৃবন্ধন কাটিয়া যাইবে এবং আমরা পরস্পর পৃথক দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া যাইব। দেখ, আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের নবীর সন্তানদের মধ্যে এক অগ্নি পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। আমি তোমাদিগকে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আহলে বায়তের সহযোগিতা এবং ভ্রান্ত ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি। বিশ্বাস কর, এই শাসকদের দ্বারা কখনও তোমাদের মঙ্গল সাধিত হইবে না। ইহারা তোমাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া দিবে, হস্তপদ কাটিয়া ফেলিবে। তোমাদের চেহারা বিনষ্ট করিয়া দিবে, তোমাদিগকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া বৃক্ষশাখে ফাঁসিতে ঝুলাইবে। উহারা সৎকর্মশীলদের একজন একজন করিয়া হত্যা করিয়া ফেলিবে। আদি, হানী ইবনে আমর প্রমুখের বেদনাময় ঘটনা এখনও তেমন পুরাতন হয় নাই যে, তোমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছ।"

কূফাবাসীগণ এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া যোহায়রকে গালি দিতে এবং ইবনে যিয়াদের প্রশংসাবাদ করিতে শুরু করিল। উহারা উদ্ধত কণ্ঠে জবাব দিল, "আল্লাহর শপথ! হোসাইনকে হত্যা অথবা আমাদের আমীরের নিকট বন্দী করিয়া না নেওয়া পর্যন্ত আমরা অন্য কথা চিন্তা করিব না।" যোহায়র উত্তর দিলেন, ভাল কথা! যদি ফাতেমা তনয় অপেক্ষা সুমাইয়ার পুত্র ইবনে যিয়াদ তোমাদের অনুগ্রহপ্রাপ্তির বেশী যোগ্য হইয়া থাকে, তবে অন্ততঃ রসূল-সন্তানের এতটুকু সম্মান রক্ষা কর, তাঁহাকে তোমরা হত্যা করিও না। তাঁহাকে এবং তাঁহার জ্ঞাতি ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়াকে পরস্পর বুঝাপড়া করিতে ছাড়িয়া দাও। যেন তাঁহরা পরস্পর পরস্পরের সহিত মীমাংসা করিয়া লওয়ার সুযোগ পান। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, ইয়াযিদকে খুশি করার জন্য হযরত হোসাইনের রক্ত প্রবাহিত

করা মোটেও জরুরী নহে।" -(ইবনে জরীর)

হোর ইবনে ইয়াযিদের মত পরিবর্তন

আদী ইবনে হারমালা বর্ণনা করেন, ইবনে সাদ যখন সৈন্যবাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন তখন হোর ইবনে ইয়াযিদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেনাপতি, আপনি কি সত্যই হযরত হোসাইনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন?" ইবনে সাদ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ। এমন যুদ্ধ, যদ্দারা অন্ততঃ এতটুকু হইবে যে, মস্তক উড়িয়া যাইবে, হাত কাটিবে।"

হোর বলিলেন, "যে তিনটি শর্ত তিনি পেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন একটাও কি গ্রহণযোগ্য নহে?"

ইবনে সাদ বলিলেন, "খোদার শপথ, আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি অবশ্যই উহা মঞ্জুর করিতাম, কিন্তু কি করিব; তোমাদের শাসনকর্তা মঞ্জুর করেন না।" এই কথা শোনার পর হোর নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট কোররা ইবনে কায়েস নামক স্বীয় গোত্রের এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হোর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ঘোড়াকে পানি পান করাইয়াছ? পরে কোররা বলিয়াছেন, হোরের এই প্রশ্ন শুনিয়াই আমি বুঝতে পারিয়াছিলাম, তিনি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে চাহেন না, বরং আমাকে কোন প্রকারে বিদায় করিতে চান যেন আমি পরে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করিতে না পারি। সুতরাং "আমি ঘোড়াকে পানি পান করাই নাই, এখন আমি যাইতেছি; এই কথা বলিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলাম। আমি চলিয়া যাওয়ার পরই তিনি হযরত ইমাম হোসাইনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে শুরু করিলেন।"

তাঁহার স্বগোত্রীয় মোহাজের ইবনে আওস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হোসাইনকে আক্রমণ করিতে চাও? এই কথা শুনিয়া হোর চুপ করিয়া গেলেন। মোহাজেরের সন্দেহ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার মৌন ভাব সন্দেহজনক। আমি কোন যুদ্ধেই তোমার এই অবস্থা দেখি নাই। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কুফার সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ কে? তবে তোমার নাম ব্যতীত আমার মুখে অন্য কোন ব্যক্তির কথা আসিবে না, কিন্তু এই সময় তুমি এ কি শুরু করিলে?" হোর গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, "খোদার শপথ, আমি বেহেশ্‌ত অথবা দোযখের পথ গ্রহণ করা সম্পর্কে ভাবিতেছিলাম। আল্লাহর শপথ, আমি বেহেশ্‌তই বাছাই করিয়াছি। তৎপর আমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও আর ভাবনা নাই।" এই কথা বলিয়াই তিনি দ্রুত হযরত ইমামের সৈন্যবাহিনীতে যাইয়া মিশিয়া গেলেন। হযরত হোসাইনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মহামান্য রসূল-সন্তান, আমি হতভাগ্যই আপনাকে ফিরিয়া যাইতে দেই নাই। সারা পথ আপনার পশ্চাতে

থাকিয়া এই ভয়ানক স্থানে অবতরণ করিতে আপনাকে বাধ্য করিয়াছি। খোদার শপথ, আমার ধারণাও ছিল না, উহারা আপনার কোন শর্তই মঞ্জুর না করিয়া এই পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিবে। আল্লাহর শপথ, যদি এই কথা আমি জানিতে পারিতাম, তবে কখনও এই কাজ করিতাম না। আমি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আপনার নিকট তওবা করার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। আপনার পদতলে উৎসর্গ হইয়া আমি স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; আপনার ধারণায় আমার তওবার পক্ষে কি উহা যথেষ্ট হইবে? হযরত ইমাম বলিলেন, খোদা তোমার তওবা কবুল করুন, তোমাকে ক্ষমা করুন, অতঃপর তোমার নাম কি? তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, 'হোর ইবনে ইয়াযিদ'।

হযরত ইমাম বলিলেন, "হোর (স্বাধীন)? তোমার মাতা তোমাকে যেরূপ স্বাধীন নাম রাখিয়াছেন, তেমনি দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি স্বাধীনই থাকিবে।"

কুফাবাসীদের প্রতি হোরের আবেদন

অতঃপর হোর শত্রুবাহিনীর সম্মুখে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, লোকসকল, হোসাইনের পেশকৃত শর্তগুলির মধ্য হইতে যে কোন একটি মানিয়া নিয়া এই মহাপরীক্ষা হইতে কেন মুক্তি লাভ করিতেছ না?

লোকেরা জবাব দিল, আমাদের নেতা আমর ইবনে সাদ উপস্থিত আছেন, তিনিই উত্তর দিবেন।

আমর বলিলেন, আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এইগুলি মঞ্জুর করার।

অতঃপর হোর কুফাবাসীকে লক্ষ্য করিয়া নিতান্ত উত্তেজনাময় বক্তৃতা দিলেন। কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করিয়া সকলকে ধিক্কার দিলেন, কিন্তু কুফাবাসীগণ তদুত্তরে তীর বর্ষণ শুরু করিল। নিরুপায় হইয়া তিনি তাঁবুর দিকে ফিরিয়া আসিলেন।

যুদ্ধ শুরু

এই ঘটনার পর আমর ইবনে সাদ ধনুক উঠাইয়া ইমাম বাহিনীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করতঃ বলিতে লাগিলেন, তোমরা সাক্ষী থাকিও; সর্বপ্রথম তীর আমি নিক্ষেপ করিয়াছি। অতঃপর ব্যাপকভাবে তীর বর্ষিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ তীরবৃষ্টি হওয়ার পর যিয়াদ ইবনে আবিহে, আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের গোলাম ইয়াসার ও সালেম ময়দানে আসিয়া ইমাম বাহিনীকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিল। প্রাচীন যুদ্ধনীতিতে উভয়পক্ষের দুই একজন বাহির হইয়া মল্লযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার প্রচলন ছিল। ইমাম শিবির হইতে হাবীব ইবনে নাজ্জার এবং বারীর ইবনে হাজবীর বাহির হইতে চাহিলেন, কিন্তু হযরত ইমাম

তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া কালবী দাঁড়াইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠদেহী এই লোকটি কুফা হইতে আসিয়া হযরত ইমামের মুষ্টিমেয় বাহিনীতে যোগ দান করিয়াছিলেন। হযরত ইমাম তাঁহার দিকে ভাল করিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, তুমি নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি, তুমি যাইতে পার। আবদুল্লাহ সামান্যতেই শত্রু শিবিরের উভয় মল্লযোদ্ধাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার স্ত্রী শিবিরের সম্মুখে যষ্টিহস্তে দাঁড়াইয়া যুদ্ধে উৎসাহ দিতেছিলেন। স্বামীকে জয়যুক্ত হইতে দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে ময়দানের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। হযরত ইমাম এই বীর নারীকে বিরত করিয়া বলিলেন, আল্লাহ আহ্‌লে বায়তের তরফ হইতে তোমাকে ইহার প্রতিফল দান করুন; তবে স্ত্রীলোকদের জন্যে যুদ্ধের ময়দান নহে।

মল্লযোদ্ধাদের নিপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইবনে সাদের দক্ষিণ ভাগের রক্ষীদল ইমাম বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইয়া দিল। ইমাম বাহিনী দৃঢ়হস্তে বর্শা ধারণা করিলেন। তাঁহাদের এই দৃঢ়তার সম্মুখে শত্রুবাহিনীর ঘোড়সওয়ার বাহিনী অগ্রসর হইতে পারিল না। নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। ইমাম বাহিনী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন। শত্রুদের কয়েকটি লোক হতাহত হইল।

ব্যাপক আক্রমণ

দেখিতে দেখিতে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উভয়পক্ষ হইতে দুই একজন করিয়া বীর বাহির হইয়া আসিতে লাগিল এবং পরস্পরের মধ্যে অস্ত্রের বাহাদুরী দেখাইতে লাগিল, কিন্তু সৈন্যদের যে কেহই ইমাম বাহিনীর সম্মুখে আসিতেছিল, তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূ-শয্যায় লুটাইয়া পড়িতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া শত্রু বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি আমর ইবনে হাজ্জাজ চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মূর্খের দল, কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, বুঝিতেছ না? তাহারা জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছে। বিক্ষিপ্তভাবে উহাদের সম্মুখে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। এইভাবে আর কেহ অগ্রসর হইও না। তাহারা মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রাণী, প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেও মিস্‌মার হইয়া যাইবে। এই যুক্তি আমর ইবনে সাদের মনঃপূত হইল। সে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ বন্ধ করিয়া ব্যাপকভাবে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দিল। চারিদিক হইতে শত্রুসৈন্যরা পঙ্গপালের ন্যায় ইমাম্ বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর আক্রমণের তীব্রতা কিছুটা স্তিমিত হইলে দেখা গেল, ইমাম বাহিনীর বিখ্যাত বীর মুসলিম ইবনে আওসাজা আহত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন। তখনও তাঁহার শ্বাস অবশিষ্ট ছিল। হযরত ইমাম ছুটিয়া গিয়া লাশের নিকট পৌঁছিলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, মুসলিম,

তোমার উপর খোদার রহমত হউক। তাহাদের কিছু আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়াছেন আর কিছু অপেক্ষা করিতেছেন। মুসলিমই ইমাম বাহিনীর তরফ হইতে প্রথম শহীদ।

অতঃপর দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হইল শিমারের নেতৃত্বে। মাত্র বত্রিশ জন ঘোড়সওয়ার ইমাম বাহিনীর পক্ষ হইতে প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুবাহিনী অনুভব করিল, এই তেজবীর্যের সম্মুখে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচশত তীরন্দাজ আমদানী করতঃ আক্রমণ তীব্রতর করা হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিকের তীরবৃষ্টির সম্মুখে মুষ্টিমেয় ইমাম বাহিনীর ঘোড়াগুলি অচল হইয়া গেল। অশ্বারোহী সৈন্যগণ নিরুপায় হইয়া পদাতিকরূপে ময়দানে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

হোরের বীরত্ব

আইয়ুব ইবনে মাশরাহ বর্ণনা করেন, হোর ইবনে ইয়াযিদের ঘোড়া আমি স্বয়ং আহত করিয়াছিলাম। তীরের পর তীর বর্ষণ করিয়া ঘোড়াকে একেবারে অচল করিয়া দেওয়ার পর হোর মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। তরবারি হস্তে হোরকে তখন ভীষণমূর্তি সিংহের ন্যায় দেখাইতেছিল। বিদ্যুৎ গতিতে তরবারি চালনা করিতে করিতে তিনি কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন, "তোমরা আমার অশ্ব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছ, ইহাতে কি আসে যায়? আমি সম্ভ্রান্ত সন্তান, সিংহের চাইতে ভয়ানক।"

তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ

যুদ্ধ ভীষণ গতিতে চলিতেছিল। দ্বিপ্রহর গড়াইয়া চলিয়াছিল, কিন্তু শত্রুবাহিনী কিছুতেই জয়যুক্ত হইতে পারিতেছিল না। কেননা, ইমাম-বাহিনী তাঁবু কেন্দ্র করিয়া একস্থানে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। এই অবস্থায় আমর ইবনে সাদ ইমাম শিবিরে আক্রমণ চালাইল, কিন্তু মাত্র কয়েকজন সৈন্য এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন। এইবার শত্রুগণ তাঁবুতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। ইমাম বাহিনী অধীর হইয়া উঠিলেন। হযরত ইমাম বলিতে লাগিলেন, তাঁবু জ্বালাইয়া দাও। ইহাতে আমরা আরও একত্রিত হইয়া প্রতিরোধ করিতে সুযোগ পাইব। পরিণামে হইলও তাহাই।

উম্মে ওয়াহাবের শাহাদাত

এই সময় যোবায়র ইবনে কাইয়েন শিমারের উপর ভীষণভাবে আক্রমণ চালাইয়া দিলেন। শত্রুবাহিনীর পদ শিথিল হইয়া আসিল, কিন্তু এই পর্বতপ্রমাণ শত্রুব্যূহের সম্মুখে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষ আর কতক্ষণ টিকিয়া থাকিবেন। সামান্য সময় অতিবাহিত

হইতে না হইতেই শত্রু সৈন্যদের বিরাট একদল আসিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ততক্ষণে ইমাম বাহিনীর অনেকেই শাহাদতের পেয়ালা পান করিয়া লইয়াছেন। কয়েকজন বিখ্যাত বীর চিরনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। কুফার বিখ্যাত বীর আবদুল্লাহ ইবনে ওমায়র পর্যন্ত নিহত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বীর পত্নী উম্মে ওয়াহাবও স্বামীর সঙ্গে শহীদ হইয়া গেলেন। তিনি ময়দানে বসিয়া আহত স্বামীর পরিচর্যা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, তোমার জন্য জান্নাত মোবারক হউক। এই বীর মহিলাকে শিমার হত্যা করিয়া ফেলিল।

নামাযে বাধাদান

আবু তামামা আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইমাম বাহিনীর অসহায় অবস্থা দর্শন করিয়া হযরত ইমামের নিকট নিবেদন করিলেন, "শত্রুরা একেবারেই নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর শপথ, যে পর্যন্ত আমার শরীরের রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকিবে, আপনার কোন ক্ষতি হইতে দিব না। তবে আমার শেষ আরজু; নামায পড়ার পর প্রভুর দরবারে হাজির হইতে চাই।"

হযরত ইমাম বলিলেন, "শত্রুদের বল, আমাদিগকে নামাযের সময় দিক, কিন্তু শত্রুরা এই আবেদন মঞ্জুর না করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিল।"

হাবীব ও হোরের শাহাদাত

ইমাম বাহিনীর উপর চরম সংকট নামিয়া আসিতেছিল। শত্রুবাহিনী সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া মহা উল্লাসে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। দেখিতে দেখিতে ইমাম বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি হাবীব ইবনে হাজ্জারও নিহত হইলেন, হাবীবের পরই মহাবীর হোর কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিলেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না।

যোহায়রের পতন

দেখিতে দেখিতে যোহরের সময় শেষ হইয়া আসিল। হযরত ইমাম মুষ্টিমেয় সঙ্গী-সাথীসহ নামায আদায় করিলেন। নামাযের পর শত্রু বাহিনীর চাপ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গেল। যোহায়র ইবনে কাইয়েন বীরত্বগাথা গাহিয়া ময়দানে অবতরণ করিলে। তিনি হযরত ইমামের বাহুতে হাত রাখিয়া গাহিতে লাগিলেন, "চল, তোমাকে আল্লাহ হেদায়েত দান করিয়াছেন। তুমি আজ স্বীয় মাতামহ আল্লাহর রসূলের (সা.) সহিত সাক্ষাত করিবে।" হাসান, আলী মোরতাজা আর বীর যুবক জাফর তাইয়ারের সহিত সাক্ষাত হইবে। যিন্দা শহীদ আসাদুল্লাহ হামযাও মিলিত হইবেন।

তৎপর বীরবিক্রমে শত্রুব্যূহে প্রবেশ করতঃ শত্রু নিপাত করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন।

ধীরে ধীরে ইমাম বাহিনী নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল। অবশিষ্টরা অবস্থা সঙ্গীন দেখিলেন, শত্রুর প্রতিরোধ আর সম্ভবপর নহে। বীরগণ সিদ্ধান্ত করিলেন, একে একে লড়াই করিয়া হযরত ইমামের সম্মুখেই প্রাণ বিলাইয়া দিবেন। গেফারী গোত্রের দুই ভাই বীরত্বগাঁথা গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইলেন–

"বনী গেফার ও নাযার কবিলা এই কথা ভালভাবেই জানিয়া ফেলিয়াছে, আমরা তরবারির আঘাতে পাপীদের টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিব।"

"হে জাতি, তরবারি ও বর্শার সাহায্যে সম্ভ্রান্তদের সহযোগিতা কর।"

ইহাদের পর দুই জন জাবের গোত্রীয় তরুণ আসিয়া ক্রন্দন করিতে শুরু করিল। হযরত ইমাম স্নেহভরে বলিলেন, "বৎসগণ, কাঁদিতেছ কেন? কয়েক মুহূর্ত পরই তোমাদের চক্ষু চিরতরে শীতল হইয়া যাইবে। ভ্রাতৃদ্বয় ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমরা জীবনের ভয়ে ক্রন্দন করিতেছি না; শত্রুরা আপনাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। অথচ আমরা আপনার কোনই উপকারে আসিতে পারি নাই।" তৎপর ইহারা বীরত্বের সহিত শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বার বার মুখে বলিতেছিলেন, হে রসূল সন্তান, আপনার উপর আল্লাহ শান্তি বর্ষণ করুন। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই দুই বাহাদুরের পতন হইল।

ইহাদের পর হানযালা ইবনে আশআস আসিয়া হযরত ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে জাতি, আমার ভয় হয়, আদ ও সামুদের ন্যায় তোমরাও চরম দুর্দিনের সম্মুখীন না হও। হোসাইনকে হত্যা করিও না! খোদা তোমাদের উপর আযাব নাযিল করিবেন।" শেষ পর্যন্ত ইনিও শহীদ হইয়া যান।

একে একে সকল সঙ্গীই চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইবার বনী হাশেম ও নবী বংশের পালা আসিল। সর্বপ্রথম হযরত ইমামের পুত্র আলী আকবর ময়দানে অবতরণ করিলেন। মুখে বলিতেছিলেন, "আমি আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী, কাবার প্রভুর শপথ, আমি নবী করীম (সা.)-এর নিকটবর্তী হওয়ায় বেশী অধিকারী। খোদার শপথ. পিতৃপরিচয়হীন ব্যক্তিগণ আমাদের উপর রাজত্ব করিতে পারিবে না।"

ইনিও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত মুররা ইবনে মালকাজ আল আবাদী নামক এক দুর্বৃত্তের আঘাতে শহীদ হন। জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখিতে পাইলাম, প্রভাতী সূর্যকিরণের ন্যায় এক পরমা সুন্দরী মহিলা তাঁবু হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। তিনি চিৎকার করিতে করিতে বলিতেছিলেন। "হায় আমার ভাই, হায় আমার ভ্রাতুষ্পুত্র!!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা উত্তর দিল, হযরত যয়নব

বিনতে ফাতেমা (রা.), কিন্তু হযরত হোসাইন তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁবুর ভিতর রাখিয়া আসিলেন। তৎপর আলী আকবরের লাশ আনিয়া তাঁবুর সম্মুখে শোয়াইয়া দিলেন।

—(ইবনে জরীর)

শহীদ নওজোয়ান

অতঃপর আহলে বায়ত ও বনী হাশেমের অন্যান্য ব্যক্তিগণও বীরবেশে প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক অপূর্ব সুদর্শন তরুণ ময়দানে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে হালকা জামা ও পায়ে হালকা ধরনের চটি ছিল। তরুণ যোদ্ধার চেহারা এমন সুন্দর ছিল যে, দ্বাদশীর চাঁদ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। সিংহের মত বীরবিক্রমে তিনি ময়দানে অবতরণ করিয়া শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আমর ইবনে সাদ ইযদী তাঁহার মাথায় তরবারির আঘাত করিল। তরুণ 'হায় চাচা,' বলিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। আওয়াজ শুনিয়া হযরত হোসাইন (রা.) ক্ষুধার্ত বাজপক্ষীর ন্যায় ছুটিয়া গেলেন এবং বিদ্যুদ্বেগে তরবারি চালনা করিতে করিতে আক্রমণকারীর দিকে অগ্রসর হইলেন। হযরত ইমামের তরবারির আঘাতে হতভাগ্য আক্রমণকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সে চিৎকার করিয়া সঙ্গীগণকে ডাকিতে শুরু করিল। একদল শত্রুপক্ষীয় সৈন্য আসিয়া আক্রমণকারীকে বাঁচাইতে চাহিল, কিন্তু উহাদের পদতলেই সে পিষ্ট হইয়া গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, ময়দান পরিষ্কার হইলে পর দেখিতে পাইলাম, হযরত হোসাইন (রা.) তরুণের শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। যন্ত্রণায় তরুণ হস্তপদ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেছেন। হযরত হোসাইন (রা.) বলিতেছেন, যে তোমাকে হত্যা করিয়াছে তাহার সর্বনাশ হউক। কাল কেয়ামতের ময়দানে সে তোমার নানাকে কি জবাব দিবে? তোমার চাচার জন্য ইহার চাইতে বড় আক্ষেপ আর কি হইতে পারে, তুমি তাঁহাকে ডাকিলে আর সে আসিতে পারিল না, অথবা আসিলেও তোমার কোন উপকারে আসিল না। আফসোস! তোমার চাচার শত্রু অনেক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন বন্ধু অবশিষ্ট নাই! অতঃপর তিনি এই তরুণের লাশ তাঁবুর নিকট আনিয়া আলী আকবরের সহিত শোয়াইয়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তরুণটি কে? সকলে জবাব দিল, ইনি কাসেম ইবনে হাসান (রা.)।

সদ্যোজাত শহীদ

এর পর হযরত হোসাইন (রা.) আবার নিজ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় তাঁহার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁবুর ভিতর হইতে সদ্যোজাত শিশুকে আনিয়া তাঁহার

কোলে দেওয়া হইল। তিনি শিশুর কানে আজান দিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর আসিয়া শিশুর কণ্ঠনালীতে বিঁধিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কচি শিশুর প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া গেল। হযরত হোসাইন (রা.) শিশু শহীদের কণ্ঠ হইতে তীর টানিয়া বাহির করিলেন। হাতে তাজা খুন লইয়া তাঁহার সর্বশরীরে ছিটাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর শপথ, খোদার নিকট তুমি হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রীয় চাইতেও প্রিয়। আর মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর দৃষ্টিতে হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম হইতেও প্রিয়। ইলাহী, আমার উপর হইতে তুমি যখন বিজয়ের হাত উঠাইয়া লইয়াছ তখন যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই কর।– (আইয়ুব ঃ ইবনে জরীর)

বনী হাশেমের শহীদগণ

এইভাবে একে একে অধিকাংশ বনী হাশেম গোত্রীয়গণ শহীদ হইয়া গেলেন। ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিকগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ (১) মোহাম্মদ ইবনে আবি সায়ীদ ইবনে আকীল। (২) আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে আকীল। (৩) আবদুল্লাহ ইবনে আকীল। (৪) আবদুর রহমান ইবনে আকীল। (৫) জাফর ইবনে আকীল। (৬) মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর। (৭) আওন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর। (৮) আব্বাস ইবনে আলী। (৯) আবদুল্লাহ ইবনে আলী। (১০) ওসমান ইবনে আলী। (১১) মোহাম্মদ ইবনে আলী। (১২) আবু বকর ইবনে আলী। (১৩) আবু বকর ইবনুল হাসান। (১৪) আবদুল্লাহ ইবনে হাসান। (১৫) কাসেম ইবনে হাসান। (১৬) আলী ইবনে হাসান। (১৭) ওবায়দুল্লাহ ইবনে হাসান।

বীর বালক

একে একে সবাই শেষ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর ছিল হযরত হোসাইনের পালা। তিনি সম্পূর্ণ একাকী ময়দানে দণ্ডায়মান ছিলেন। শত্রুরা তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কেহই আঘাত করিতে সাহস পাইতেছিল না। প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেছিল যেন এই মহাপাপের বোঝা তাহার স্কন্ধে পতিত না হয়। শিমার সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতেছিল। চারিদিক হইতে শত্রুরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। আহ্‌লে রসূল (সা.)-এর তাঁবুতে স্ত্রীলোকগণ এবং কয়েকজন অল্প বয়স্ক শিশু মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁবুর ভিতর হইতে একটি বালক হযরত ইমামকে এইরূপ শত্রু পরিবেষ্টিত দেখিয়া উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া গেল। সে তাঁবুর খুঁটি ভাঙ্গিয়া শত্রুসৈন্যের দিকে দিশাহারাভাবে ছুটিয়া চলিল। হযরত যয়নব ছুটিয়া আসিয়া বালকটিকে ধরিয়া ফেলিলেন। হযরত ইমামও

বালককে দেখিতে পাইয়া ভগ্নীকে বলিলেন, ইহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখ। আসিতে দিও না, কিন্তু ক্ষিপ্ত বালক হযরত যয়নবের হাত ছাড়াইয়া হযরত হোসাইনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক এই মুহূর্তেই বাহর ইবনে কা'ব নামক এক পাপিষ্ঠ হযরত ইমামের উপর তরবারি উঠাইল। উহা দেখিতে পাইয়া বালক চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, হে পাপিষ্ঠ, আমার চাচাকে হত্যা করিতে চাস? এই কথা শুনিয়া পাষণ্ড অবোধ বালকের উপর উত্তোলিত তরবারি ছাড়িয়া দিল। বালক হাত দিয়া আঘাত প্রতিরোধ করিতে চাহিল, কিন্তু হাতখানা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া গেল। যন্ত্রণায় বালক চিৎকার করিয়া উঠিল। হযরত ইমাম বীর বালককে বুকে জড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, ধৈর্য ধর! আল্লাহ তোমাকে তোমার পুণ্যাত্মা আপনজনদের নিকট পৌছাইয়া দিবেন, হযরত রসূলে খোদা (সা.), হযরত আলী, হযরত জাফর ও হযরত হাসান (রা.) পর্যন্ত।"

হযরত ইমামের শাহাদাত

এইবার হযরত ইমামের উপর সর্বদিক হইতে আক্রমণ শুরু হইল। হযরত ইমাম ভীষণ বেগে তরবারি চালনা করিতে লাগিলেন! যেদিকে তিনি যাইতেছিলেন, শত্রু সৈন্যদের কাতারের পর কাতার পরিষ্কার হইয়া যাইতেছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার নামক এক ব্যক্তি এই যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি বর্শা দ্বারা হযরত হোসাইনকে আক্রমণ করি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তাঁহার নিকট পৌছিয়া গিয়াছিলাম। ইচ্ছা করিলেই আমি তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিতাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, এই মহাপাপ কেন কাঁধে লইতে যাইব? দেখিতে পাইলাম, ডান বাম সবদিক হইতেই তাঁহার উপর আক্রমণ চলিতেছে, কিন্তু তিনি যেদিকে ফিরিতেন, শত্রুরা সেই দিক হইতেই পলায়ন করিতে থাকিত। হযরত ইমাম তখন গায়ে জামা ও মাথায় পাগড়ি পরিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। আল্লাহর শপথ, আমি ইতিপূর্বে এমন প্রশস্ত হৃদয় মানুষ আর কখনও দেখি নাই, যাহার চক্ষের সম্মুখে আত্মীয়, বান্ধব পরিবার-পরিজন সকলেই একে একে প্রাণ দিল। সেই দুঃখসাগরে সন্তরণরত মানুষটিই এমন দৃঢ়তা ও বীরত্ব সহাকারে যুদ্ধ করিতেছিলেন যে, যেদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, শত্রুসৈন্যগণ ব্যাঘ্রতাড়িত মেষপালের ন্যায় ছুটিয়া প্রাণরক্ষা করিতেছিল। দীর্ঘক্ষণ এই অবস্থা চলিল। এই সময় হযরত ইমামের ভগ্নী হযরত যয়নব চিৎকার করিতে করিতে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি বলিতেছিলেন, হায়! হায়!! আকাশ যদি মাটিতে ভাঙ্গিয়া পড়িত! ইতিমধ্যে আমর ইবনে সাদ হযরত ইমামের একেবারে নিকটে পৌছিয়া গেলেন। হযরত যয়নব বলিতে লাগিলেন, আমর, আবু আবদুল্লাহ (হযরত হোসাইন) কি

তোমাদের সম্মুখেই নিহত হইয়া যাইবেন। আমর তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন, কিন্তু অশ্রুতে তাহার দাড়ি ও গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল।

যুদ্ধ করিতে করিতে হযরত ইমাম ভীষণভাবে পিপাসিত হইয়া গেলেন। পানির জন্য তিনি ফোরাতের দিকে চলিলেন, কিন্তু শত্রুরা তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিল না। একটি তীর আসিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে বিদ্ধ হইল। হযরত ইমাম তীরের ফলক টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। হাত উপরে তুলিবার সময় তাঁহার উভয় হাত রক্তে ভরিয়া উঠিল! তিনি রক্ত আকাশের দিকে ছিটাইতে ছিটাইতে খোদার শোকর আদায় করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ইলাহী, আমার অভিযোগ একমাত্র তোমারই দরবারে। দেখ দেখ, তোমার রসূল দৌহিত্রের সহিত কি ব্যবহার হইতেছে।"

হযরত ইমাম ফোরাতের পথ ছাড়িয়া তাঁবুর দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। শিমার একদল সৈন্যসহ এই দিকেও তাঁহার পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। হযরত ইমাম অনুভব করিলেন, পাপিষ্ঠরা তাঁবু লুণ্ঠন করিতে চাহে। বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি ধর্মের কোন মমতা অথবা শেষ বিচারের কোন ভয় নাও থাকিয়া থাকে, তবু অন্ততঃ মানবতার দিকে চাহিয়া হইলেও কুফার এই অসভ্যদের কবল হইতে আমার তাঁবুটি রক্ষা করিও।" শিমার উত্তর দিল, "আচ্ছা তাই করা হইবে, আপনার তাঁবু রক্ষা করা হইবে।"

সময় অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছিল। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রুরা ইচ্ছা করিলে বহু পূর্বেই তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু এই পাপ কেহ বহন করিতে চাহিতেছিল না। শেষ পর্যন্ত শিমার চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, দেরী করিতেছ কেন? শীঘ্র কাজ শেষ করিয়া ফেলিতেছ না কেন? ইহার পর আবার চারিদিক হইতে আক্রমণ শুরু হইল। হযরত ইমাম উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে হত্যা করার জন্য কেন একে অপরকে উত্তেজিত করিতছ? আল্লাহর শপথ, আমার পর এমন কোন লোক থাকিবে না যাহাকে হত্যা করিলে আল্লাহ আজকের চাইতে বেশী অসন্তুষ্ট হইবেন।"

শেষ সময় নিকটবর্তী হইল। জোরআ ইবনে শরীফ তামিমী তাঁহার বাম হস্তে আঘাত করিল, তৎপর পার্শ্বদেশে তরবারি চালাইল। হযরত ইমাম বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে চাহিলেন। এতদ্দর্শনেই শত্রুরা ভয়ে পিছাইয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যেই সেনান ইবনে আনাস নাখয়ী আসিয়া বর্শা মারিল। হযরত ইমাম মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। পাপিষ্ঠ অন্য এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিল, "মাথা কাটিয়া ফেল।" লোকটি অগ্রসর হইল, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। পাপাচারী দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিতে লাগিল, "তোর হাত নষ্ট হইয়া যাউক!" এই কথা বলিয়া নিজেই লাফাইয়া পড়িল এবং হযরত

ইমামের মাথা কাটিয়া দেহ হইতে পৃথক করিয়া লইল। জাফর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী বর্ণনা করেন, নিহত হওয়ার পর দেখা গেল, হযরত ইমামের শরীরে ৩৩টি তীর ও ৪৩টি তরবারির আঘাত রহিয়াছে।

মহাপাতকী

হযরত ইমামের হন্তা সেনান ইবনে আনাসের মস্তিষ্কে একটু বিকৃতি ছিল। হযরত ইমামকে হত্যা করার সময় উহার চরিত্রে এক আশ্চর্য অবস্থা দেখা দিয়াছিল। যে কেহ হযরতের লাশের নিকটবর্তী হইতে চাহিত, তাহাকেই সে আক্রমণ করিত। সে ভয় পাইতেছিল, ইতিমধ্যে অন্য কেহ তাঁহার মস্তক কাটিয়া না নেয়। পাপাত্মা শেষ পর্যন্ত মস্তক কর্তন করিয়া খাওলা ইবনে ইয়াযিদ আসবেহী নিকট অর্পণ করিল। স্বয়ং দৌড়াইয়া গিয়া আমর ইবনে সাদের নিকট চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল— "আমাকে স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়া ডুবাইয়া দাও, আমি মস্ত বড় বাদশাহকে হত্যা করিয়াছি! আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি যাঁহার পিতা-মাতা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার বংশমর্যাদা সবচাইতে ভাল।"

আমর ইবনে সাদ উহাকে তাঁবুর ভিতর ডাকিয়া নিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, চুপ কর! তুই একটি আস্ত পাগল! তৎপর লাঠি দ্বারা উহাকে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "পাগল কোথাকার, এমন কথা বলিতেছিলে! খোদার শপথ, ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ শুনিতে পাইলে এখনই তোকে হত্যা করিত।"– (ইবনে জরীর)

হত্যার পর

হত্যার পর কূফাবাসীরা হযরত ইমামের শরীরের কাপড় পর্যন্ত খুলিয়া লইয়া গেল! তৎপর ইমাম পরিবারের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাঁবুতে হযরত যয়নুল আবেদীন অসুস্থ অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। ইতিমধ্যে শিমার একদল সৈন্যসহ তাঁবুতে পৌঁছিয়া বলিতে লাগিল, ইহাকেও কেন হত্যা করিয়া ফেলিতেছ না? শিমারের সঙ্গীরা বলিল, শিশুদের কেন আর হত্যা করিবে? এমন সময় আমর ইবনে সাদ আসিয়া নির্দেশ দিলেন, কেহ যেন স্ত্রী-লোকদের তাঁবুর দিকে অগ্রসর না হয়, অথবা এই রুগ্ন বালককে কিছু না বলে। যদি কেহ তাঁবুর কোন কিছু লুণ্ঠন করিয়া থাক তবে এখনই ফিরাইয়া দাও।

এই কথা শুনিয়া হযরত যয়নুল আবেদীন রুগ্ন কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমর ইবনে সাদ, আল্লাহ তোমাকে সৎপরিণাম দান করুন। তোমার নির্দেশেই আমি এখনকার মত বাঁচিয়া গেলাম।"

আমর ইবনে সাদের উপর নির্দেশ ছিল, হযরত হোসাইনের লাশ যেন ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করিয়া ফেলা হয়। হত্যার পর এখন লাশের পালা আসিল। আমর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই কাজের জন্য প্রস্তুত আছ? দশ ব্যক্তি প্রস্তুত হইল এবং ঘোড়া ছুটাইয়া পবিত্র লাশ পিষিয়া ফেলিল। এই যুদ্ধে ইমাম পক্ষের ৭২ জন শহীদ হইলেন! ইবনে যিয়াদের ৮৮ ব্যক্তি নিহত হইল।— (ইবনে জরীর, কামেল, ইয়াকুবী)

দ্বিতীয় দিন আমর ইবনে সাদ যুদ্ধের ময়দান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। আহলে বাইতের হতাবশিষ্ট শিশু ও স্ত্রীলোকগণকে সঙ্গে লইয়া কুফায় রওয়ানা হইয়া গেলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী কোররা ইবনে কায়স বর্ণনা করেন, আহলে বায়তের স্ত্রীলোকগণ হযরত হোসাইন (রা.) এবং অন্যান্য শহীদের পিষ্ট বিক্ষিপ্ত লাশ দেখিয়া সমস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন! চারিদিক হইতে হায় হায় রব উঠিল! আমি ঘোড়ার গতি পরিবর্তন করিয়া তাঁহাদের নিকটবর্তী হইলাম। জীবনে আমি এত সুন্দরী স্ত্রীলোক আর কোথাও দেখি নাই। আমি হযরত যয়নব বিনতে ফাতেমা (রা.)-এর বিলাপ কখনও ভুলিতে পারিব না! তিনি বলিতেছিলেন ঃ "মোহাম্মদ (সা.), তোমার উপর আকাশের ফেরেশ্তাদের দরূদ ও সালাম! চাহিয়া দেখ, তোমার হোসাইন বালুকারাশির উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। মাটি ও রক্তে সর্বাঙ্গ রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। সোনার শরীর টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। আর তোমার আদরের কন্যারা আজ বন্দী! তোমার বংশধর নিহত। মরুভূমির বাতাস তাহাদের উপর ধুলা নিক্ষেপ করিতেছে।" বর্ণনাকারী বলেন, হযরত যয়নবের এই বিলাপ শুনিয়া শত্রু-মিত্র এমন কেহ ছিল না যাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে নাই! – (ইবনে জরীর)

শহীদানের সকলের মস্তক কাটিয়া একত্রিত করা হইয়াছিল। শিমার, কায়স ইবনে আশ্আস, আমর ইবনে হাজ্জাজ, আস মোররা ইবনে কায়স প্রভৃতি মিলিয়া এই মস্তকগুলি ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট লইয়া গেল।

ইবনে যিয়াদের সমীপে শির মোবারক

মোবারক ইবনে মোসলেম খাওলা ইবনে ইয়াযিদের সহিত হযরত হোসাইনের শির ইবনে যিয়াদের নিকট লইয়া আসিয়াছিল। তাহার বর্ণনা ঃ হযরত হোসাইনের শির মোবারক ইবনে যিয়াদের সম্মুখে রাখা হইল। দরবার-ঘরে অসংখ্য দর্শকের ভীড় ছিল। ইবনে যিয়াদ একটি যষ্টি দ্বারা বার বার হযরত হোসাইনের ওষ্ঠদ্বয়ে আঘাত করিতেছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "ইবনে যিয়াদ, এই পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় হইতে যষ্টি সরাইয়া লও! আমার এই দুই

চক্ষু অসংখ্যবার রসূলে খোদা (সা.)-কে নিজ মুখে এই পবিত্র ওষ্ঠ চুম্বন করিতে দেখিয়াছে।" এই কথা বলিয়া তিনি শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া ইবনে যিয়াদ রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, "খোদা তোমাকে আরও রোদন করান, যদি তুমি বৃদ্ধ স্থবির হইয়া না যাইতে, তবে এখনই তোমার মস্তক উড়াইয়া দিতাম!"

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) এই কথা বলিতে বলিতে দরবার হইতে বাহির হইয়া গেলেন, "আরববাসীগণ, আজকের পর হইতে তোমরা গোলামীর শিকলে আবদ্ধ হইয়া গেলে। তোমরা হযরত ফাতেমার পুত্রকে হত্যা করিয়াছ। আর ইবনে মাজানাকে (ইবনে যিয়াদ) নিজেদের শাসনকর্তা নির্বাচিত করিয়াছ। সে তোমাদের সৎ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিয়া দুষ্ট প্রকৃতির লোকদিগকে বশ করিয়া লইয়াছে। তোমরা হীনতা গ্রহণ করিয়া লইয়াছ। যাহারা হীনতা অবলম্বন করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেন।"

কোন কোন বর্ণনায় এই দুষ্কর্ম ইয়াযিদের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যষ্টি দ্বারা হযরত হোসাইনের মুখে আঘাতের ধৃষ্টতা ইবনে যিয়াদেরই অপকীর্তি!

ইবনে যিয়াদ ও হযরত যয়নব

বর্ণনাকারী বলেন, আহ্‌লে বায়তের শিশু ও স্ত্রীলোকগণকে যখন ইবনে যিয়াদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তখন হযরত যয়নব নিতান্ত জীর্ণ পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁহাকে চেনা যাইতেছিল না। কয়েকজন পরিচারিকা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? কিন্তু তিন বার জিজ্ঞাসা করার পরও তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। শেষ পর্যন্ত জনৈক পরিচারিকা বলিল, "হযরত যয়নব বিন্‌তে ফাতেমা (রা.)।" পাপিষ্ঠ ওবায়দুল্লাহ্ চিৎকার করিয়া বলিল, "সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি তোমাদিগকে অপদস্থ ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তোমাদের নামে অপমানের কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া হযরত যয়নব বলিলেন, "সহস্র প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মোহাম্মদ (সা.) দ্বারা আমাদিগকে সম্মান দান করিয়াছেন এবং আমাদিগকে পবিত্রতার মর্যাদা দিয়াছেন। তুই যেইরূপ বলিয়াছিস সেইরূপ নয়। পাপী সর্বাবস্থায়ই হীন লাঞ্ছিত। পাপীর নামেই কলঙ্কের ছাপ পড়িয়া থাকে।" ইবনে যিয়াদ বলিল, তুমি দেখ নাই, খোদা তোমার খান্দানের সহিত কি ব্যবহার করিয়াছেন?

হযরত যয়নব বলিলেন, "ইহাদের ভাগ্যে শাহাদাতের মৃত্যু লিখা ছিল, এই জন্য তাঁহারা বধ্যভূমিতে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। সত্বরই আল্লাহ তাঁহাদের সহিত তোমাকেও একস্থানে একত্রিত করিবেন। তোমরা পরস্পর আল্লাহর দরবারেই এই ব্যাপারে বুঝাপড়া

করিতে পারিবে।"

ইবনে যিয়াদ রাগে অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার ক্রোধ দেখিয়া আমর ইবনে হারীস বলিলেন, "আমীর, আত্মহারা হইবেন না। এ তো নারী মাত্র। নারীর কথায় রাগান্বিত হইয়া উঠা উচিত নহে।"

কিছুক্ষণ পর ইবনে যিয়াদ পুনরায় বলিল, "আল্লাহ তোমাদের বিদ্রোহী সরদার এবং তোমাদের পরিবারের দাম্ভিকদের তরফ হইতে আমার অন্তর শীতল করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া হযরত যয়নব আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন; "ওবায়দুল্লাহ, তুমি আমাদের নেতাকে হত্যা করিয়াছ। সমস্ত খান্দান সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। এই পবিত্র পরিবারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছ। ইহাতে যদি তোমার অন্তর শীতল হইয়া থাকে, তবে তাহাই হউক।"

ইবনে যিয়াদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ইহা বীরত্বের ব্যাপার। তোমার পিতাও বীর ও কবি ছিলেন।"

হযরত যয়নব বলিলেন, নারীর পক্ষে বীরত্বের কথায় ফল কি? বিপদ আমাকে বীরত্বের কাহিনী বিস্মৃত করিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি যাহা বলিয়াছি উহা অন্তরের আগুন মাত্র।

ইমাম যয়নুল আবেদীন

অতঃপর ইবনে যিয়াদের দৃষ্টি হযরত আলী যয়নুল আবেদীন ইবনে হোসাইনের দিকে নিবদ্ধ হইল। তিনি অসুস্থ ছিলেন। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি? ইমাম বলিলেন ঃ আলী ইবনে হোসাইন। ইবনে যিয়াদ আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আলী ইবনে হোসাইনকে কি আল্লাহ এখনও নিহত করেন নাই?

যয়নুল আবেদীন কোন উত্তর দিলেন না। ইবনে যিয়াদ বলিল, উত্তর দাও না কেন?

তিনি জবাব দিলেন, আমার আর এক ভাইয়ের নামও আলী ছিল। লোকেরা ভুলক্রমে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ইবনে যিয়াদ বলিল, লোকেরা নহে, আল্লাহ হত্যা করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া হযরত যয়নুল আবেদীন কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, আয়াতের অর্থ হইল–

"আল্লাহ জীবনসমূহকে মৃত্যু দেন তাহার নির্দিষ্ট সময়ে। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন জীবই মৃত্যুবরণ করিতে পারে না।"

কোরআনের আয়াত শ্রবণ করিয়া ইবনে যিয়াদ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, তবে খোদা এখনই তোমার মৃত্যু দান করিতেছেন! এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা

করিতে উদ্যত হইল। হযরত যয়নব অধীর কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি, যদি তুমি মুমিন হইয়া থাক এবং এই বালককে সত্যই হত্যা করিতে চাও, তবে ইহার সঙ্গে আমাকেও হত্যা করিয়া ফেল!"

ইমাম যয়নুল আবেদীন উচ্চ স্বরে বলিলেন, "হে ইবনে যিয়াদ, এই স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে যদি তোমার অন্তরে সামান্য মর্যাদাবোধও থাকিয়া থাকে, তবে আমার মৃত্যুর পর ইহাদের সঙ্গে কোন খোদাভীরু লোককে প্রেরণ করিও, যিনি ইসলামী রীতি-নীতি অনুযায়ী ইহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন।"

ইবনে যিয়াদ দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া হযরত যয়নবকে দেখিতেছিল। লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, রক্তের সম্পর্ক কি আশ্চর্য জিনিস! স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া মনে হয়, সত্যই সে বালকের সহিত মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত। থাক, বালককে ছাড়িয়া দাও এবং উহাকেও স্ত্রীলোকদের সহিত যাইতে দাও।-(ইবনে জরীর, কামেল)

ইবনে আফিফের শাহাদাত

এই ঘটনার পর ইবনে যিয়াদ কূফার জামে মসজিদে জনসাধারণকে সমবেত করিয়া খুৎবা দিতে শুরু করিল। সর্বপ্রথম সে সেই খোদার প্রশংসা করিল যিনি 'সত্য' প্রকাশ করিয়াছেন এবং 'সত্যপন্থীদিগকে' জয়যুক্ত করিয়াছেন। "আমীরুল মোমেনীন (?) ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়া এবং তাঁহার জামাত জয়যুক্ত হইয়াছে এবং মিথ্যাবাদী (?) হোসাইন ও তাহার সঙ্গীদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন....।"

এই কথা শুনিয়া আবদুল্লাহ্ ইবনে আফীফ ইনুদী (ইনি হযরত আলীর একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। জঙ্গে জামালে ইহার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল) উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "খোদার শপথ হে ইবনে মারজানা, মিথ্যাবাদীর সন্তান মিথ্যাবাদী তো তুই। হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রা.) নহেন। এই কথা শুনিয়া ইবনে যিয়াদ তাঁহার গর্দান উড়াইয়া দেয়।"

ইয়াযিদের সম্মুখে

তৎপর ইবনে যিয়াদ হযরত ইমাম হোসাইনের শির মোবারক একটি বংশদণ্ডে বিদ্ধ করিয়া জাহর ইবনে কায়সের হাতে ইয়াযিদের নিকট প্রেরণ করিল। গার ইবনে রবিয়া বলেন ঃ জাহর ইবনে কায়স যে সময় উপস্থিত হয়, তখন আমি ইয়াযিদের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ইয়াযিদ জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি?

জাহর বলিতে লাগিল ঃ "হোসাইন ইবনে আলী (রা.) আঠার জন আহ্লে বায়ত এবং

ষাট জন সঙ্গীসহ আমাদের নিকট উপস্থিত হন। আমরা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিলাম এবং বলিলাম, আমাদের নিকট যেন আত্মসমর্পণ করেন, অন্যথায় আমরা যুদ্ধ করিব, কিন্তু আত্মসমর্পণ করার চাইতে তিনি যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আক্রমণ করিলাম। চারিদিক হইতে যখন অগণিত তরবারি তাহাদের উপর পড়িতে লাগিল, তখন তাহারা চারিদিকে এমনভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন যেমন বাজের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কবুতর পলায়ন করিতে থাকে। তৎপর আমরা উহাদের সকলকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলাম। এই পর্যন্ত তাহাদের দেহ সূর্যতাপ ও বাতাসের দ্বারা বোধ হয় শুষ্ক ও শৃগালের খাদ্যে পরিণত হইয়াছে।"

বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা শুনিয়া ইয়াযিদের চক্ষু অশ্রু প্লাবিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হোসাইনকে হত্যা করা ব্যতীতও আমি তোমাদের আনুগত্যে সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম। ইবনে সুমাইয়ার (ইবনে যিয়াদ) উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হউক। খোদার শপথ, যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকিতাম, তবে অবশ্যই হোসাইনকে ক্ষমা করিয়া দিতাম। আল্লাহ্ হোসাইনকে রহমতের কোলে আশ্রয় দিন।" কাসেদকে তিনি কোন প্রকার পুরস্কার দিলেন না।-(ইবনে জরীর, কামেল, তারীখে কবীর, যাহবী)

ইয়াযিদের গোলাম কাসেম ইবনে আবদুর রহমানের বর্ণনা ঃ হযরত হোসাইন (রা.) এবং আহ্‌লে বায়তের শহীদানের শির যখন ইয়াযিদের সম্মুখে রাখা হইল, তখন তিনি এই মর্মে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, ঃ

"তরবারি এমন লোকের মস্তকও দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে, যাঁহারা আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অথচ উহারাই সত্য বিস্মৃত জালেম ছিল।" তৎপর বলিলেন "আল্লাহর শপথ হে হোসাইন, আমি যদি সেখানে থাকিতাম, তবে কখনও তোমাকে হত্যা করিতাম না।"

দামেশকে

হযরত হোসাইনের শির প্রেরণ করার পর ইবনে যিয়াদ আহ্‌লে বায়তকেও দামেশকে প্রেরণ করিল। পাপাত্মা শিমার এবং মাহ্যার ইবনে সালাবা এই কাফেলার সরদার ছিল। ইমাম যয়নুল আবেদীন সমগ্র রাস্তায় চুপ করিয়া রহিলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। ইয়াযিদের প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ইবনে সালাবা চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা আমীরুল মোমেনীনের নিকট পাপী নীচদিগকে হাযির করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া ইয়াযিদ রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, মাহযারের মাতার চাইতে অধিক নীচ ও দুষ্ট সন্তান বুঝি আর কোন মাতা জন্ম দেন নাই। তৎপর ইয়াযিদ সিরিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দরবারে আহ্বান করিলেন। আহ্‌লে বায়তকেও বসাইলেন এবং

সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন; "হে আলী, তোমার পিতাই আমার সাথে সম্পর্ক কর্তন করিয়াছেন। তিনি আমার অধিকার বিস্মৃত হন। আমার রাজত্ব কাড়িয়া নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তোমরা দেখিয়াছ।"

এই কথার উত্তরে হযরত ইমাম যয়নবল আবেদীন কোরআনের আয়াত পাঠ করিলেন ঃ "তোমাদের এমন কোন বিপদ নাই যাহা পূর্ব হইতেই লিখিয়া রাখা হয় নাই। ইহা আল্লাহর পক্ষে নিতান্ত সহজ এই জন্য যে, তোমরা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আক্ষেপ না কর এবং সাফল্য লাভ করিয়া আত্মাভিমানী হইয়া না যাও। আল্লাহ অহঙ্কারী দাম্ভিকদিগকে পছন্দ করেন না।" এই উত্তর ইয়াযিদের মনঃপুত হইল না। তিনি স্বীয় পুত্র খালেদ দ্বারা এর উত্তর দিতে চাহিলেন, বল না কেন- "তোমাদের উপর এমন কোন বিপদ আসে নাই, যাহা তোমাদের হস্তদ্বয় সঞ্চয় করে নাই এবং আল্লাহ অধিকাংশকে ক্ষমা করেন।"- (কোরআন)

অতঃপর ইয়াযিদ অন্যান্য শিশু ও স্ত্রীলোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহাদিগকে ডাকিয়া নিজের নিকটে বসাইলেন। তাহাদের বিষাদ-মলিন চেহারা দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, খোদা ইবনে যিয়াদের সর্বনাশ করুন। যদি তোমাদের সহিত তাহার কোন প্রকার সম্পর্ক থাকিত তবে এই অবস্থায় সে তোমাদিগকে আমার নিকট প্রেরণ করিত না।

হযরত যয়নবের স্পষ্টবাদিতা

হযরত ফাতেমা বিন্‌তে আলী হইতে বর্ণিত আছে, আমরা যখন ইয়াযিদের সম্মুখে নীত হইলাম তখন ইয়াযিদ আমাদের উপর অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেন। আমাদিগকে তিনি কিছু দিতে চাহিলেন। তখন এক সুদর্শন সিরীয় তরুণ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, আমীরুল মোমেনীন, এই মেয়েটিকে আমাকে দিয়া দিন। এই বলিয়া সে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। আমি তখন নিতান্ত অল্পবয়স্কা ছিলাম। আমি বড় বোন হযরত যয়নবকে আঁকড়াইয়া ধরিলাম। হযরত যয়নাব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তুই নীচ! ইহার উপর তোর অথবা ইয়াযিদের কোনই অধিকার নাই।"

এই কথা শুনিয়া ইয়াযিদ রাগান্বিত হইয়া গেলেন। বলিতে লাগিলেন, তুমি বাজে বকিতেছ; আমি ইচ্ছা করিলে এখনই ইহা করিতে পারি। যয়নব বলিলেন, "কখনও নহে। আল্লাহ তোমাদিগকে এই অধিকার কখনও দেন নাই। যদি তুমি আমাদের দ্বীন হইতে বিচ্যুত হইয়া যাও অথবা আমাদের দ্বীন ছাড়িয়া অন্য দ্বীন গ্রহণ কর, তবে অবশ্য অন্য

কথা।"

এই কথা শুনিয়া ইয়াযিদ আরও বেশী রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, দ্বীন হইতে তোমার পিতা ও ভ্রাতা বাহির হইয়া গিয়াছেন।

হযরত যয়নব দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলিলেন ঃ "আল্লাহর দ্বীন হইতে, আমার ভ্রাতার দ্বীন হইতে, আমার পিতা ও মাতামহের দ্বীন হইতে তুমি ও তোমার পিতা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

ইয়াযিদ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "খোদার দুশমন, তুমি মিথ্যাবাদিনী।" হযরত যয়নব বলিতে লাগিলেন, "তুমি জোর করিয়া শাসক হইয়া বসিয়াছ! উদ্ধত আত্মগরিমায় অপরকে গালি দিতেছ! গায়ের বলে খোদার সৃষ্ট জীবকে অবনত করিয়া রাখিতেছ।"

হযরত ফাতেমা বিন্‌তে আলী (রা.) বলেন, এই কথা শুনিয়া বোধহয় ইয়াযিদ লজ্জিত হইয়া গেলেন। অতঃপর আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই সিরীয় তরুণটি পুনরায় উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং সেই কথা বলিতে লাগিল। এইবার ইয়াযিদ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "দূর হ হতভাগা! খোদা তোকে মৃত্যুর সওগাত দান করুন।"

ইয়াযিদের পরামর্শ

দীর্ঘক্ষণ দরবারে নীরবতা বিরাজ করিল। তৎপর ইয়াযিদ সিরীয় আমীরদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ইহাদের সম্পর্কে কি পরামর্শ দাও! কেহ কেহ মন্দ কথা উচ্চারণ করিল, কিন্তু নোমান ইবনে বেশর বলিলেন, ইহাদের সহিত তদ্রূপ ব্যবহারই করুন, আল্লাহর রসূল ইহাদেরকে এই অবস্থায় দেখিয়া যাহা করিতেন। এই কথা শুনিয়া হযরত ফাতেমা বিন্‌তে আলী (রা.) বলিলেন, ইয়াযিদ, ইহারা সকলেই রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কন্যার সমতুল্য।

এই কথা শুনিয়া ইয়াযিদের অন্তরও গলিয়া গেল। তিনি ও দরবারের সকলে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না! শেষ পর্যন্ত তিনি নির্দেশ দিলেন, ইহাদের থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিয়া দাও।

ইয়াযিদ পত্নীর শোক

ততক্ষণে এই ঘটনার খবর ইয়াযিদের অন্তঃপুরে গিয়া পৌঁছিল। ইয়াযিদ-পত্নী হেন্দা বিন্‌তে আবদুল্লাহ অধীর হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। মুখে নেকাব দিয়া দরবারে আসিয়া ইয়াযিদকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমীরুল মোমেনীন, হোসাইন ইবনে ফাতেমা বিন্‌তে রসূল (সা)-এর শির আসিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাইলাম।

ইয়াযিদ বলিলেন, হ্যাঁ, তোমরা প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন কর! মাতম কর! বিলাপ কর!

রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র এবং কোরায়শ গোত্রের সবচাইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য মাতম কর! ইবনে যিয়াদ বড় তাড়াহুড়া করিয়াছে। তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে! খোদা উহাকেও হত্যা করুন।"

আত্মপ্রসাদ

তৎপর ইয়াযিদ দরবারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা জান কি– এই বিপর্যয় কিসের ফল? উহা হোসাইনের ভুলের পরিণাম। তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমার পিতা ইয়াযিদের পিতার চাইতে উত্তম ব্যক্তি। আমার মাতা ইয়াযিদের মাতার চাইতে উত্তম মহিলা। আমার মাতামহ ইয়াযিদের মাতামহ হইতে উত্তম ব্যক্তি এবং আমি স্বয়ং ইয়াযিদ হইতে উত্তম। সুতরাং আমি ইয়াযিদের চাইতে রাজত্বের বেশী হকদার। অথচ তাঁহার পিতা আমার পিতার চাইতে উত্তম– এই কথা ভাবা তাঁহার উচিত ছিল না। কারণ মোয়াবিয়া ও আলীর মধ্যে লড়াই হইয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুনিয়া দেখিয়াছে, কাহার পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হইয়াছে!

তাহাছাড়া তাঁহার মাতা আমার মাতার চাইতে নিঃসন্দেহে উত্তম ছিলেন। হযরত ফাতেমা বিনতে রসূল (সা.) আমার মাতার চাইতে অনেক গুণেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মাতামহও আমার মাতামহের চাইতে উত্তম ছিলেন। খোদার শপথ, আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই অন্য কাহাকেও রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাইতে উত্তম অথবা তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু হোসাইনের ইজতেহাদে ভুল হইয়াছে। তিনি এই আয়াত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আল্লাহ রাজত্বের মালিক, তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যাঁহাকে ইচ্ছা রাজত্ব হইতে বঞ্চিত করেন। যাঁহাকে ইচ্ছা সম্মান দেন, যাঁহাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন। তাঁহার হাতেই মঙ্গল, তিনি সব কিছুর উপর মহাশক্তিমান।– (কোরআন)

অতঃপর আহ্‌লে বায়তের সম্মানিত মহিলাদিগকে ইয়াযিদের অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হইল। অন্তঃপুরবাসিনীগণ তাহাদিগকে এইরূপ দুরবস্থায় দেখিয়া আত্মহারা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রতিকারের চেষ্টা

কিছুক্ষণ পর ইয়াযিদ অন্তঃপুরে আসিলে ফাতেমা বিন্‌তে আলী (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়াযিদ, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কন্যাগণ কি এই পরিবারের বাঁদীতে পরিণত হইবেন?

ইয়াযিদ বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্রী! এইরূপ কেন ভাবিতেছ?

ফাতেমা বলিলেন, খোদার শপথ, আমাদের কানের একটি বালিও অবশিষ্ট রাখা হয় নাই।

ইয়াযিদ বলিলেন, তোমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে আমি তাহার দ্বিগুণ দিব। তৎপর যে যাহা বলিলেন, তাহার দ্বিগুণ তিন গুণ দেওয়া হইল। তারপর হইতে ইয়াযিদ প্রত্যহ খাওয়ার সময় হযরত যয়নুল আবেদীনকে সঙ্গে লইয়া খাইতে বসিতেন। একদিন তিনি হযরত হোসাইনের শিশুপুত্র আমরুকেও ডাকিয়া নিলেন। খাইতে বসিয়া স্বীয় পুত্র খালেদকে দেখাইয়া তিনি আমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি উহার সহিত লড়াই করিবে?"

অবুঝ শিশু বলিয়া উঠিল ঃ "এই কথা নয়, আমার হাতে একটি ছোরা এবং উহার হাতে একটি ছোরা দিয়া দেখুন কেমন লড়াই শুরু করি।"

ইয়াযিদ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং আমরকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন— "সাপের বাচ্চা সাপই হইয়া থাকে।"

ইয়াযিদ আহ্লে বায়তকে কিছুদিন মেহ্মানের যত্নে রাখিলেন! সর্বদা দরবারে তাঁহাদের আলোচনা করিতেন এবং বলিতেন ঃ কি ক্ষতি ছিল, যদি আমি কষ্ট স্বীকার করিয়া হোসাইনকে আমার ঘরে ডাকিয়া আনিতাম, তাঁহার দাবীদাওয়া সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিতাম, ইহাতে আমার শক্তি যদি কিছুটা খাটোও হইয়া যাইত, তথাপি অন্ততঃ রসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্পর্কের মর্যাদা তো রক্ষা হইত। ইবনে যিয়াদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, হোসাইনকে সে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছে। হোসাইন তো আমার সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে সম্মত অথবা মুসলমানদের সীমান্ত পার হইয়া জেহাদ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইবনে যিয়াদ তাঁহার কোন কথাই মানিল না, তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাঁহাকে হত্যা করিয়া আমাকে সে সমগ্র জাতির সম্মুখে অভিশপ্ত করিয়া দিল। খোদার অভিশাপ ইবনে যিয়াদের উপর! খোদার অভিশাপ ইবনে যিয়াদের উপর!!

আহ্লে বায়তের বিদায়

আহ্লে বায়তকে মদীনার পথে বিদায় দেওয়ার সময় ইয়াযিদ হযরত যয়নুল আবেদীনকে আবার বলিলেন, "ইবনে যিয়াদের উপর খোদার অভিশাপ! আল্লাহর শপথ, আমি যদি হোসাইনের সম্মুখে থাকিতাম, তবে তিনি যে কোন শর্ত পেশ করিতেন, আমি তাহাই মঞ্জুর করিয়া নিতাম। আমি যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করিতাম। এইরূপ করিতে যাইয়া আমার কোন পুত্রের জীবন নাশ করিতে হইলেও দ্বিধা করিতাম না, কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে, বোধহয় তাহাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। দেখ, আমার

সহিত সর্বদা পত্রালাপ করিও। যে কোন প্রয়োজন মুহূর্তে আমাকে খবর দিও।"

আহ্‌লে বায়তের বদান্যতা

আহ্‌লে বায়তকে ইয়াযিদ বিশ্বস্ত লোক ও সৈন্য সমভিব্যহারে মদীনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাফেলার সরদার সমগ্র পথে এই সম্মানিত পরিবারের সহিত নিতান্ত সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করেন। মদীনায় পৌঁছার পর হযরত যয়নব বিনতে আলী ও হযরত ফাতেমা বিনতে হোসাইন হাতের কঙ্কণ খুলিয়া সেই ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমার সৎকর্মের এই পুরস্কার। আমাদের নিকট ইহার চাইতে বেশী কিছু নাই যে তোমাকে দান করিব।" লোকটি অলঙ্কার ফেরত দিয়া বলিল, আমি দুনিয়ার পুরস্কারের লোভে আপনাদের সেবা করি নাই। আল্লাহর রসূলকে স্মরণ করিয়াই এই সেবা করিয়াছি।

মদীনায় মাতম

আহ্‌লে বায়তের মদীনায় পৌঁছার বহু পূর্বেই এই হৃদয়বিদারক খবর মদীনায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল। বনী হাশেমের অন্তঃপুরবাসিনীগণ পর্যন্ত এই খবর শুনিয়া বিলাপ করিতে করিতে পথে বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত আকীল ইবনে আবু তালেব-কন্যা সকলের অগ্রে অগ্রে আসিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন ঃ

"নবী যখন তোমাদিগকে প্রশ্ন করিবেন, তখন কি জবাব দিবে? হে আমার শেষ উম্মত, তোমরা আমার পরে আমার আওলাদ ও খান্দানের সহিত কি ব্যবহার করিয়াছিলে? ইহাদের কতক বন্দী হইলেন আর কতক রক্ত-স্নাত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।"

মর্সিয়া

হযরত হোসাইনের শাহাদাতের শোকাবহ ঘটনা স্মরণ করিয়া অনেকেই মর্সিয়া রচনা করেন। সোলায়মান ইবনে কাত্তানের মর্সিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ঃ

"খান্দানে মোহাম্মদ (সা.)-এর গৃহের নিকট দিয়া আমি যাইতেছিলাম, তাঁহারা এমন করিয়া আর কখনও ক্রন্দন করেন নাই, যেমন কাঁদিলেন যেদিন তাঁহাদের মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করা হইল।"

"খোদা ইহাদের গৃহ ও তাহার অধিবাসীদের বিচ্ছিন্ন না করুন, যদিও এখন গৃহগুলি অধিবাসী হইতে শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে।"

"কারবালায় হাশেমী বীরদের শাহাদাত মুসলিম দুনিয়ার মস্তক হেঁট করিয়া দিয়াছে।"

"এই নিহতদের উপর দুনিয়ার আশা-ভরসা বাঁধা ছিল, কিন্তু সেই আশা-ভরসা আজ বিপর্যয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। হায়, এই বিপদ কত কঠিন! তোমরা কি দেখ না হোসাইনের বিচ্ছেদে ভূমি পর্যন্ত কেমন রুগ্ন হইয়া গিয়াছে! ভূমি কম্পন করিতেছে, তাঁহার বিরহে আকাশও রোদন করিতেছে, আকাশের সেতারারাও মাতম করিতেছে এবং সালাম প্রেরণ করিতেছে।"

মৃত্যুর দুয়ারে

হযরত আমর ইবনুল আস

হযরত আমর ইবনুল আসের বীরত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিজয় কাহিনীতে ইতিহাসের পাতা সমৃদ্ধ হইয়া আছে। মুসলমানদের মিসর বিজয় তাঁহারই দূরদর্শিতা ও অপূর্ব বিচক্ষণতার ফল। উমাইয়া বংশের খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁহার ভূমিকাই ছিল প্রধান। সমকালীন রাজনীতিতে তিনি সর্বদা অগ্রণী ছিলেন। ঐতিহাসিকগণের সর্বসম্মত অভিমত, আরবের তদানীন্তন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তিন ব্যক্তির মস্তিষ্কে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। আমর ইবনুল আস, মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ও যিয়াদ ইবনে আবিহে! ঘটনাক্রমে এই তিন মনীষীই একত্রিত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা মিলিয়া রাজনৈতিক সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা ইসলামী ইতিহাসের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিয়া দেন। হযরত আলী (রা.) এবং খেলাফতে রাশেদার শক্তিকে কেবলমাত্র আমীর মোয়াবিয়াই পরাজিত করেন নাই, উহাতে আমর ইবনুল আসের মস্তিষ্ক ছিল সবচাইতে বেশী কার্যকর। এহেন একজন রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় মৃত্যুকে স্বাগত জানাইয়া ছিলেন, নিম্নে আমরা সংক্ষেপে তাহাই বর্ণনা করিব।

একটি আশ্চর্য প্রশ্ন

আরবের এই বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া অনুভব করিলেন, জীবনের কোন আশাই আর নাই। তখন তিনি স্বীয় দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান ও কতিপয় বিশিষ্ট সৈনিককে আহ্বান করিলেন। শুইয়া শুইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আমি তোমাদের কেমন সঙ্গী ছিলাম?" সকলে একবাক্যে উত্তর দিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ, আপনি অত্যন্ত দয়াবান নেতা ছিলেন, প্রাণ খুলিয়া আমাদিগকে দান করিতেন, সর্বদা খুশি রাখিতেন। এই কথা শুনিয়া ইবনে আস গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই সব আমি কেবল এই জন্য করিতাম যেন তোমরা আমাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পার। তোমরা আমার সৈনিক ছিলে, আমি তোমাদের নেতা ছিলাম। শত্রুদের আক্রমণ হইতে আমাকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত থাকিত, কিন্তু মৃত্যুদূত এখনই আমার জীবন শেষ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। অগ্রসর হও এবং তাহাকে বিতাড়িত কর।" এই কথা শুনিয়া সকলে একে অপরের মুখ দেখিতে থাকিল। কাহারও মুখে কোন উত্তর আসিতেছিল না। কিছুক্ষণ পর তাহারা বলিল, "জনাব, আমরা আপনার মুখ হইতে এই রকম অবান্তর কথা শোনার জন্য কখনও প্রস্তুত ছিলাম না। আপনি ভালভাবেই জ

ানেন, মৃত্যুর সম্মুখে আমরা আপনার কোন কাজেই আসিতে পারি না।"

ইবনে আস দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "আল্লাহর শপথ, এই সত্য আমি ভালভাবেই জানিতাম। তোমরা আমাকে মৃত্যুর হাত হইতে কখনও বাঁচাইতে পারিবে না, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, পূর্ব হইতেই যদি এই কথা ভাবিতে পারিতাম। পরিতাপ, তোমাদের কাহাকেও যদি আমার ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীতে না রাখিতাম! হযরত আলীর মঙ্গল হউক, তিনি কি চমৎকার বলিতেন, "মানবের শ্রেষ্ঠ রক্ষক তাহার মৃত্যু।"

–(তাবাকাতে ইবনে সাদ)

প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া ক্রন্দন

এক বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমর ইবনুল আসকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় আক্রান্ত ছিলেন। হঠাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন? আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি আপনাকে এই সমস্ত সুসংসবাদ দেন নাই? অতঃপর তিনি সুসংবাদগুলি শুনাইতে লাগিলেন, কিন্তু ইবনে আস মাথায় ইশারা করিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ কালেমার সাক্ষ্য।

জীবনে আমি তিনটি স্তর অতিক্রম করিয়াছি। একসময় এমন ছিল, যখন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চাইতে বেশী আন্তরিক শত্রুতা আর কাহারও সহিত পোষণ করিতাম না। আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ছিল, যে কোন উপায়ে যদি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যা করিতে পারিতাম! এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হইত, তবে নিঃসন্দেহে জাহান্নামে যাইতে হইত।

তৎপর এমন এক সময় আসিল, যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামের আলো দিলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাযির হইয়া নিবেদন করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, হাত বাড়ান আমি আনুগত্যের শপথ করিতেছি। তিনি পবিত্র হাত বাড়াইলেন, কিন্তু আমি হাত টানিয়া নিলাম। আল্লাহর রসূল (সা.) বলিলেন, আমর, তোমার কি হইল! আমি নিবেদন করিলাম, একটি শর্ত আরোপ করিতে চাই! রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমার শর্ত কি? নিবেদন করিলাম, আমাকে পূর্ণভাবে আন্তরিক সান্ত্বনার কথা দিন। তিনি বলিলেন, হে আমর, তুমি কি জান না, ইসলাম তৎপূর্ববর্তী সকল গোনাহের অবসান ঘোষণা করে। অনুরূপ হিজরত এবং হজ্বও পূর্ববর্তী গোনাহ দূর করিয়া দেয় (ইবনে আসের এই বিখ্যাত উক্তি বোখারী ও মুসলিম উভয়েই

বর্ণনা করিয়াছেন)।

এই সময় আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমার নজরে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাইতে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেহ রহিল না। তাঁহার চাইতে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া আর কাহাকেও মনে হইল না।

আমি সত্য বলিতেছি, কেহ যদি আমাকে আল্লাহর রসূলের (সা.) শরীরের গঠন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি ঠিকমত বলিতে পারিব না। কারণ, অত্যধিক মর্যাদাবোধের দরুন আমি কখনও তাঁহার দিকে ঠিকমত চোখ তুলিয়া পর্যন্ত চাহিতে পারিতাম না। এই অবস্থায় যদি মৃত্যুবরণ করিতাম, তবে নিশ্চিতভাবে জান্নাতের অধিকারী হইতে পারিতাম। তৎপর এমন এক সময় আসিল যখন এদিক সেদিক অনেক কিছুই করিয়াছি। এখন নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না, আমার পরিণাম কি হইবে।

ধীরে ধীরে মাটি দিও

আমার মৃত্যুর পর শবযাত্রার সহিত যেন কোন ক্রন্দনকারিণী স্ত্রীলোক না যায়। আগুনও যেন বহন করা না হয়। সমাধিস্থ করার সময় আমার উপর ধীরে ধীরে মাটি ফেলিও। সমাধিস্থ করার পর একটি জন্তুর গোশ্‌ত বন্টন করিতে যতটুকু সময় অতিবাহিত হয় ততক্ষণ আমার কবরের নিকট অবস্থান করিও। কেননা তোমাদের বর্তমানে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হইতে পারিব। ইতিমধ্যে আমি বুঝিতে পারিব, আমি খোদার দরবারে কি জবাব দিব। -(তাবাকাতে ইবনে সাদ)

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার হুশ বজায় ছিল। মোয়াবিয়া ইবনে খাদিজ কুশল জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন?

উত্তর দিলেন, চলিয়া যাইতেছি। অস্বস্তি বেশী হইতেছে, ভাল থাকিতেছি কম, এই অবস্থায় আমার ন্যায় বৃদ্ধের বাঁচিয়া থাকা কি করিয়া সম্ভবপর?

-(ইকদুল ফরীদ, তাবাকাতে ইবনে সাদ)

হযরত ইবনে আব্বাসের সহিত কথোপকথন

একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন সালাম করিয়া স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি দুনিয়ার লাভ অল্প গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু দ্বীন বরবাদ করিয়াছি অধিক। যদি আমি যাহা লাভ করিয়াছি তাহা ছাড়িয়া, যাহা ত্যাগ করিয়াছি তাহা গ্রহণ করিতাম, তবে নিশ্চিতরূপে জিতিয়া যাইতাম। যদি সুযোগ পাই, তবে অবশ্যই এইরূপ করিব। যদি কোথাও পলাইয়াও যাইতে হয়, তবে তাহাই করিব। এইক্ষণ তো আমি নিক্ষেপণ যন্ত্রের ন্যায় আকাশ ও মাটির মধ্যস্থলে ঝুলিতেছি। হাতের জোরে উপরেও উঠিতে পারিতেছি না, পায়ের বলে নীচেও অবতরণ করিতে পারিতেছি না। ভ্রাতুষ্পুত্র, আমাকে এমন কোন উপদেশ দাও, যদ্দ্বারা কোন উপকার পাই।

ইবনে আব্বাস (রা.) জবাব দিলেন, আল্লাহর বান্দা, এখন সেই অবসর আর কোথায়? আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বয়ং বৃদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃস্থানে আসিয়া পৌছিয়াছে; যদি ক্রন্দন করিতে বলেন, প্রস্তুত আছি। ঘরে বসা লোক ভ্রমণের কথা কি করিয়া অনুভব করিবে?

আমর ইবনুল আস এই উত্তর শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। বলিতে লাগিলেন, কী ভীষণ সময়! আশি বৎসরেরও বেশী বয়স হইয়াছে। ইবনে আব্বাস, তুমিও আমাকে পরওয়ার. দেগারের অনুগ্রহ হইতে নিরাশ করিতেছ। হে খোদা, আমাকে তুমি খুব কষ্ট দাও। যেন তোমার ক্রোধ দূর হইয়া শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্টি ফিরিয়া আসে।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলিলেন, আপনি যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নূতন ছিল, আর এখন যাহা দিতেছেন তাহা পুরাতন। সুতরাং যাহা বলিতেছেন তাহা কি করিয়া সম্ভব?

এই কথা শুনিয়া তিনি একটু অধীর হইয়া উঠিলেন, বলিতে লাগিলেন ঃ ইবনে আব্বাস, আমাকে কেন নিরাশ করিতেছ? যাহা কিছু বলি তাহাই কাটিয়া দিতেছ।

মৃত্যুর অবস্থা

আমর ইবনুল আস অনেক সময় বলিতেন, এই সমস্ত লোকদের দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হই, মৃত্যুর সময় যাহাদের হুশ অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও কেন তাহারা মৃত্যু-যন্ত্রণার কথা বলিতে পারেন না! অনেকেরই এই কথা স্মরণ ছিল। তিনি স্বয়ং যখন এই অবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই কথা উত্থাপন করিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, স্বয়ং তাঁহার পুত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

এই কথা শুনিয়া আমর ইবনে আস দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিরেন, "মৃত্যুর স্বরূপ বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। মৃত্যু বর্ণনাতীত! আমি কেবলমাত্র একটু আভাস দিতে পারি, আমার মনে হইতেছে যেন আকাশ মাটির উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং আমি তাহার নীচে পড়িয়া ছটফট করিতেছি।"—(আল কামেল, ১ম খণ্ড)

মনে হইতেছে আমার মাথায় যেন পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমার পেটে যেন অসংখ্য খেজুরের কাঁটা পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুঁচের ছিদ্র দিয়া যেন আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বাহির হইতেছে।— (তাবাকাতে ইবনে সাদ)

এই অবস্থায় তিনি একটি সিন্দুকের দিকে ইশারা করিয়া স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে বলিতে লাগিলেন, "ইহা নিয়া যাও।"

তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ বিখ্যাত আবেদ ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই! তিনি বলিলেন, ইহাতে ধন-দৌলত রহিয়াছে। আবদুল্লাহ্ পুনরায় উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তৎপর আমর ইবনুল আস হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, ইহাতে স্বর্ণের পরিবর্তে যদি ছাগলের বিষ্ঠা থাকিত!— (আল্ কামেল)

দোয়া

শেষ সময় যখন ঘনাইয়া আসিল তখন উপরের দিকে হাত তুলিলেন। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রার্থনার সুরে বলিতে লাগিলেন, ইলাহী, তুমি নির্দেশ দিয়াছ, আর আমি তাহা পালন করি নাই। ইলাহী, তুমি নিষেধ করিয়াছ; আর আমি নাফরমানী করিয়াছি। ইলাহী, আমি নির্দোষ নই যে, তোমার নিকট ওজরখাহী করিব। শক্তিশালী নই যে, জয়ী হইব। তোমার রহমত যদি না আসে, তবে নিশ্চিতরূপে ধ্বংস হইয়া যাইব।

– (তাবাকাতে ইবনে সাদ)

অতঃপর তিন বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে বলিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর বিভীষিকায়

হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ

উমাইয়া খেলাফতের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফের চাইতে বেশী খ্যাতি আর কেহ অর্জন করিতে পারে নাই, কিন্তু এই খ্যাতি ন্যায়বিচার ও সহৃদয়তার নহে, সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কঠোর শাসনের মাধ্যমে তাহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে। ইসলামের ইতিহাসে হাজ্জাজের কঠোরতা উপমায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর উমাইয়া খেলাফতের ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া গিয়াছিল। হাজ্জাজই শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া তরবারি চালাইয়া সীমাহীন নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে এই পড়ন্ত ইমারতের ভিত্তি নূতন করিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন।

বনী উমাইয়ার সবচাইতে বড় প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)। তাহার নূতন রাজত্বের কেন্দ্রস্থল ছিল মক্কায়। তাহার অধিকারের সীমা সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফই এই প্রতিপক্ষকে চিরতরে শেষ করেন। তিনি মক্কা অবরোধ করেন, কাবার মসজিদে পর্যন্ত মেনজানিক দ্বারা প্রস্তর নিক্ষেপ করেন এবং শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।

ইরাক প্রথম দিক হইতেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কেন্দ্র ছিল। তথাকার রাজনৈতিক বিপর্যয় কখনও শেষ হইত না। একজনের পর একজন করিয়া শাসনকর্তা আসিতেন আর নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিষ্ঠুর তরবারি ইরাকের সকল বিশৃঙ্খলা চূড়ান্তভাবে দমন করিতে সমর্থ হয়। তাহার এই কৃতকার্যতা দেখিয়া

সমসাময়িক চিন্তাশীল লোকগণ আশ্চর্যান্বিত হইতেন। কাসেম ইবনে সালাম বলিতেন ঃ কূফাবাসীদের অহঙ্কার আত্মগরিমা কোথায় গেল? ইহারা আমীরুল মোমেনীন হযরত আলীকে হত্যা করে; হযরত হোসাইন ইবনে আলীর মস্তক কর্তন করে, মোখতারের ন্যায় প্রভাবশালী ব্যক্তিকে খতম করিয়া ফেলে, কিন্তু এই কুৎসিৎদর্শন মালাউনের (হাজ্জাজ) সম্মুখে সকলেই চরমভাবে লাঞ্ছিত হইয়া যায়। কূফায় এক লক্ষ আরব বাস করে, কিন্তু এই হতভাগা কেবলমাত্র ১২ জন অশ্বারোহীসহ আগমন করিয়া সকলকেই গোলামীর শিকলে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

কূফার ভূমিতে পা রাখিয়াই হাজ্জাজ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা আরবী সাহিত্যের এক স্মরণীয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। তিনি কূফাবাসীকে লক্ষ্য করিয়া এমন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ইরাকের জনসাধারণ চিরতরে শান্ত হইয়া গিয়াছিল।

হাজ্জাজের তরবারি ছিল যেমন নির্দয়, তাঁহার ভাষাও ছিল তেমনি অনলবর্ষী। কূফায় তাহার প্রথম বক্তৃতা শক্তিশালী ভাষাজ্ঞানেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তিনি বলেন– "আমি দেখিতে পাইতেছি, দৃষ্টি উর্ধ্বদিকে উঠিতেছে, মস্তক উন্নত হইতেছে, মস্তিষ্কের ফসল পরিপক্ক হইয়া উঠিতেছে, কর্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার দৃষ্টি ঐ বস্তু দেখিতেছে যাহা দাড়ি ও পাগড়ির মধ্যবর্তী স্থানে প্রবাহিত হইবে।" হাজ্জাজ মুখে যে কথা বলিয়াছিলেন কার্যক্ষেত্রেও তাহাই দেখাইয়া দিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, যুদ্ধ ব্যতীত কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থায়ই তিনি একলক্ষ পঁচিশ হাজার মানুষকে হত্যা করিয়াছিলেন। -(ইকদুল ফরিদ, আলবায়ান)

হাজ্জাজ অগণিত বিখ্যাত ব্যক্তি, যথা সায়ীদ ইবনে জুবাইর প্রমুখের মস্তক উড়াইয়া দেন। মদীনায় অগণিত সাহাবীর হাতে শীশার মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ন্যায় সাহাবীকে পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ন্যায় তাহারও নীতি ছিল, রাষ্ট্রের খাতিরে যে কোন জুলুম এবং যে কোন প্রকার নিষ্ঠুরতাকে তিনি অন্যায় মনে করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন— রাজ্য ন্যায়বিচার ও অনুকম্পা প্রদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয় না, কঠোরতার দ্বারাই উহার ভিত্তিমূল দৃঢ় হইয়া থাকে।

সেই যুগের সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তিগণ হাজ্জাজকে খোদার মূর্তিমান আযাব মনে করিতেন। হযরত হাসান বসরী বলিতেছেন ঃ হাজ্জাজ আল্লাহর মূর্তিমান অভিশাপ। উহাকে বাহুবলের সাহায্যে দূর করার চেষ্টা করিও না। খোদার নিকট বিনীতভাবে ক্রন্দন কর। কেননা, আল্লাহ বলেন ঃ "এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির মধ্যে ফেলিয়া দেই, কেননা তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট বিনম্র অনুকম্পা প্রার্থনা করে না।"

এই জন্যই তাহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত হাসান বসরী এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ সেজদায় পড়িয়া বলিতেছিলেন, এ জাতির ফেরাউনের মৃত্যু হইয়াছে।

এই নিষ্ঠুর লোকটি মৃত্যুকে কিভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, যে পথে তিনি অসংখ্য মানব সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, স্বয়ং তিনি সেখানে কি ভাবে প্রবেশ করেন, আমরা নিম্নে তাহাই পর্যালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

রোগশয্যায়

ইরাকে দীর্ঘ বিশ বৎসর দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন পরিচালনার পর ৫২ বছর বয়সে হাজ্জাজ রোগাক্রান্ত হন। তাহার অন্তর্নালীতে অসংখ্য কীট সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। শরীরে এমন অদ্ভুত ধরনের শৈত্য অনুভূত হইত যে, সর্বশরীরে আগুনের সেঁক দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহার শীত দূর হইত না।

জীবন সম্পর্কে যখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া গেলেন, তখন পরিবারের লোকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে বসাইয়া দাও এবং লোক সমবেত কর। লোক সমবেত হইলে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করিলেন ঃ মৃত্যুর ভয়াবহতা এবং কবরের ভীষণ একাকিত্বের কথা বর্ণনা করিলেন। দুনিয়া এবং তাহার নশ্বরতার কথা স্মরণ করিলেন। আখেরাত এবং তাহার কঠোরতার কথা ব্যাখ্যা করিলেন। স্বীয় জুলুম ও নিষ্ঠুরতার কথা স্বীকার করিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, "আমার পাপ আকাশ ও দুনিয়ার ন্যায় বিশাল, কিন্তু আমার প্রভুর উপর এতটুকু ভরসা আছে, তিনি দয়া করিবেন।"

"আমার আশা, তিনি ক্ষমার চক্ষেই আমাকে দেখিবেন, আর যদি তিনি ন্যায়বিচার করেন এবং আমাকে শাস্তির নির্দেশ দেন, তবে উহা তাঁহার পক্ষে মোটেই জুলুম হইবে না। যে প্রভুর উপর কেবল দয়া ও মঙ্গলের ভরসা করা হয়, তাঁহার পক্ষ হইতে কি কোন প্রকার জুলুমের আশঙ্কা করা যায়?"

এই বলিয়া তিনি শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরিবেশ এমন হইয়া উঠিল যে, উপস্থিত কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

খলিফার নামে পত্র

তৎপর তিনি স্বীয় কাতেবকে ডাকাইয়া খলিফা ইবনে আবদুল মালেকের নামে নিম্নলিখিত পত্র লিখাইলেন—

"আমি তোমার ছাগলপাল চরাইতাম। একজন বিশ্বস্ত শস্য রক্ষকের ন্যায় তোমার

শস্যভাণ্ডার প্রহরা দিতাম। হঠাৎ ব্যাঘ্রের আবির্ভাব হইল। সে ক্ষেত্র-রক্ষককে থাবা মারিয়া আহত করিয়া দিল এবং শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া দিল। আজ তোমার গোলামের উপর তদ্রূপ বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছে, যেরূপ হযরত আইউবের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। আমার মনে হয় নিষ্ঠুর বিশ্বপালক এই উপায়ে তাঁহার বান্দার গোনাহ্ ধৌত করিতে চাহেন" এবং শেষে এই কবিতা লিখিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ঃ

"যদি আমি তোমার খোদাকে সন্তুষ্ট দেখিতে পাই, তবেই আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া যাইবে।"

"সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র খোদার অস্তিত্বই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সকল কিছু ধ্বংস হইয়া যাউক, একমাত্র আমার জীবনই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"আমার পূর্বে অনেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, আজকের পর আমিও ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিব।"

"আমি যদি মরিয়া যাই, তবে আমাকে ভালবাসার সহিত স্মরণ রাখিও। কেন না তোমাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি অনেক পথই অবলম্বন করিয়াছিলাম।"

"যদি তা না পার তবে অন্ততঃ প্রত্যেক নামাযের পর স্মরণ রাখিও, উহা দ্বারা অন্ততঃ জাহান্নামের বন্দীর কিছু উপকার হইবে।"

"আমার পর তোমার উপর আল্লাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি অবতীর্ণ হউক, যতদিন জীবন অবশিষ্ট থাকে।"

মৃত্যু যন্ত্রণার বিভীষিকা

হযরত হাসান বসরী (র.) মৃত্যুশয্যায় হাজ্জাজকে দেখিতে আসিলেন। হাজ্জাজ তাঁহার নিকট কঠোর মৃত্যুযন্ত্রণার কথা উত্থাপন করিলেন। হযরত হাসান (র.) বলিলেন, আমি তোমাকে নিষেধ করি নাই যে, আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে নির্যাতন করিও না! আফসোস, তুমি আমার সেই বারণ কোনদিনই শোন নাই।

হাজ্জাজ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য দোয়া করিতে বলি নাই। আমি কেবলমাত্র এই দোয়া চাহিতেছি, খোদা যেন শীঘ্র আমার প্রাণ বাহির করিয়া এই আযাব হইতে মুক্তি দেন।

এই সময় আবু মানজার ইয়ালা তাহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাজ্জাজ, মৃত্যুর কঠোরতা ও বিভীষিকার মধ্যে তুমি কেমন অনুভব করিতেছ?

হাজ্জাজ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ইয়ালা, কি জিজ্ঞাসা কর? বড় ভীষণ বিপদ! ভীষণ কষ্ট! বর্ণনাতীত যাতনা; সহ্যাতীত বেদনা; সফর দীর্ঘ আর পাথেয় বড় অল্প! আহ্, আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি! প্রবল পরাক্রান্ত বিধাতা যদি আমার উপর দয়া প্রদর্শন না করেন তবে কি হইবে!

আবু মানজারের সত্য ভাষণ

আবু মানজার বলিলেন, "হে হাজ্জাজ, আল্লাহ কেবল তাঁহার সেই সমস্ত বান্দাদের উপরই দয়া প্রর্শন করেন, যাঁহারা সৎ ও দয়াশীল হইয়া থাকেন, তাঁহার সৃষ্টির প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে ভালবাসেন।" আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুমি ফেরাউন ও হামানের সমগোত্রীয় ছিলে। কেননা, তোমার চরিত্র বিভ্রান্ত ছিল। তুমি তোমার মিল্লাত পরিত্যাগ করিয়াছিলে। সত্যপথ হইতে তুমি স্খলিত হইয়া গিয়াছিলে, সৎ ব্যক্তিদের পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলে। তুমি সৎ ব্যক্তিদের হত্যা করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছ। তাবেঈনদের পবিত্র বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছ। আফসোস, তুমি আল্লাহর নাফরমানী করিয়া সৃষ্টজীবের আনুগত্য করিয়াছ। তুমি রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়াছ, অসংখ্য জীবনপাত করিয়াছ, লোকের মান-মর্যাদা বিনষ্ট করিয়াছ। অহঙ্কার ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করিয়াছ। তুমি মারওয়ান পরিবারের মর্যাদা বর্ধিত করিয়াছ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও লাঞ্ছিত করিয়াছ। তাহাদের ঘর আবাদ করিয়াছ আর নিজের ঘর বিরান করিয়াছ। আজ তোমার মুক্তি ও ফরিয়াদের জন্য কোন লোক অবশিষ্ট নাই। কেননা, তুমি আজকের এই কঠোর দিন ও তাহার পরের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলে। আল্লাহর হাজার শোকর, তিনি তোমার মৃত্যুর মাধ্যমেই এই জাতিকে মুক্তি ও শান্তি দান করিতেছেন। তোমাকে পরাজিত করিয়া জাতির হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছেন।"

আশ্চর্য প্রত্যাশা

বর্ণনাকারী বলেন, আবু মানজারের এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া হাজ্জাজ অভিভূত হইয়া গেলেন। দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলেন, তাহার চক্ষু অশ্রু প্লাবিত হইয়া উঠিল। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইলাহী, আমাকে ক্ষমা কর! কেননা, সকলেই বলে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে না! অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ঃ

হে খোদা! তোমার বান্দারা আমাকে নিরাশ করিয়াছে। অথচ আমি তোমার উপর গভীর প্রত্যয় ও ভরসা রাখি।

এই কথা বলিয়াই তিনি চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

হাজ্জাজ হয়ত আল্লাহর সীমাহীন দয়ার হাত দর্শন করিয়াই এই রকম আশ্চর্য প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এই জন্যই হযরত হাসান বসরীর নিকট যখন হাজ্জাজের এই শেষ প্রত্যাশার কথা বর্ণনা করা হয়, তখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, সত্যই কি সে এইরূপ বলিয়াছিল? লোকেরা বলিল, হ্যাঁ, তিনি এইরূপই বলিয়াছিলেন। তখন হযরত হাসান বলিয়াছিলেন, হইতেও পারে। অর্থাৎ হয়ত তাহাকেও আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন।

হযরত মোয়াবিয়ার জীবন-সন্ধ্যা

আমির মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের ব্যক্তিত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। আরব চরিত্রের দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পূর্ণ সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাঁহার মস্তিষ্কে। আরবের ইতিহাস তাঁহার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা কীর্তনে মুখর হইয়া রহিয়াছে। প্রায় সমগ্র জীবনই তাঁহার নেতৃত্ব রাজত্বের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। আর সর্বদাই তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সাফল্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। সমসাময়িক যুগে তিনি একজন কামিয়াব রাজনৈতিক নেতার আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

একটি আশ্চর্য প্রচেষ্টা

আমির মোয়াবিয়া যখন মারাত্মকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, চারিদিকে যখন ব্যাপকভাবে তাঁহার জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যের কথা প্রচারিত হইয়া গেল, তখন তিনি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। পুত্র ইয়াযিদকে তিনি তরবারির বলে মসনদের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন! ইয়াযিদ তখন রাজধানী হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এই পরিস্থিতিতে আমির মোয়াবিয়া (রা.) পরিচর্যাকারীগণকে নির্দেশ দিলেন ঃ "আমার চোখে ভালভাবে সুরমা লাগাও, মাথায় উত্তমরূপে তেল দাও!" তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করা হইল। সুরমা ও তেল ব্যবহারের দরুন চেহারার ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল। তৎপর নির্দেশ দিলেন, "আমার বিছানা নিচু করিয়া পৃষ্ঠদেশে তাকিয়া লাগাও এবং আমাকে তুলিয়া বসাইয়া দাও। তৎপর লোকদিগকে আসার অনুমতি দাও। সকলেই যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সালাম করিয়া চলিয়া যায়, কেহ যেন এখানে না বসে!"

নির্দেশমত শহরবাসীগণ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সকলেই সালাম করিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল; যাওয়ার পথে পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, কে বলে আমির মোয়াবিয়া মৃত্যুমুখে চলিয়াছেন? তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়াই তো মনে হইল। সব লোক চলিয়া গেলে পর আমির মোয়াবিয়া নিম্নের অর্থ সম্বলিত কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

"তিরস্কারকারী শত্রুভাবাপন্নদের সম্মুখে আমার দুর্বলতা প্রকাশ করিতে পারি না। আমি সব সময় তাহাদেরকে দেখাইতে চাই যে, বিপদ আমাকে কাবু করিতে পারে না।"

– (তাবারী)

নশ্বর দুনিয়া সম্পর্কে

রোগশয্যায় কোরায়শদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। আমীর মোয়াবিয়া তাঁহাদের সম্মুখে এইভাবে দুনিয়ার নশ্বরত্ব ব্যাখ্যা করিলেন, "দুনিয়া, আহ

দুনিয়া! ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি উহাকে ভালভাবেই দেখিয়াছি, গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছি। আল্লাহর শপথ, যৌবনে আমি দুনিয়ার মউজের দিকে ধাবিত হই এবং তাহার সকল স্বাদই নিঃশেষে গ্রহণ করি, কিন্তু আমি দেখিলাম, দুনিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ডিগবাজি খাইয়া তাহার রূপ পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে। এক এক করিয়া সকল বাধাই শিথিল করিয়া দিয়াছে। তৎপর কি হইল? দুনিয়া আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, আমার যৌবন ছিনাইয়া নিয়াছে, আমাকে বৃদ্ধে পরিণত করিয়াছে। হায়! এই দুনিয়া কত জঘন্য স্থান।" -(এহ্ইয়াউল উলুম)

রোগশয্যায় শায়িত হওয়ার পর আমীর মোয়াবিয়া (রা.) সর্বশেষ খুৎবা প্রদান করেন ঃ "লোকসকল, আমি এই দুনিয়ার ক্ষেত্রের শস্যবিশেষ! উহার মূল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাদের উপর শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম! আমার পর যত শাসনকর্তা আগমন করিবেন, সকলেই আমার চাইতে খারাপ হইবেন, যেইরূপ আমার পূর্ববর্তীগণ সকলেই আমার চাইতে উত্তম ছিলেন।" -(এহ্ইয়াউল উলুম)

আক্ষেপ

সময় যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন বলিতে লাগিলেন, আমাকে বসাইয়া দাও। তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল। তৎপর দীর্ঘক্ষণ যাবৎ যিকরে নিমগ্ন রহিলেন। সর্বশেষে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, মোয়াবিয়া, এতদিনে খোদাকে স্মরণ করিতেছ, যখন বার্ধক্য তোমাকে কোন কর্মেরই আর যোগ্য রাখে নাই, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল স্থবির হইয়া আসিয়াছে! ঐ সময় কেন স্মরণ কর নাই, যখন যৌবনের ডাল তাজা ও সবুজ ছিল!

তৎপর চিৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং দোয়া করিলেন, "হে প্রভু, কঠিন-হৃদয়, পাপী এই বৃদ্ধের উপর দয়া কর। ইলাহী, উহার স্খলনসমূহ ক্ষমা করিয়া দাও। উহার গোনাহ মাফ কর। তোমার সীমাহীন ধৈর্য ও ক্ষমার আশ্রয়ে উহাকে স্থান দাও। যে তোমাকে ব্যতীত আর কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করে নাই, তোমাকে ছাড়া আর কাহারও কোন ভরসা রাখে না।" -(এহ্ইয়াউল উলুম)

রোগশয্যায় স্বীয় দুই কন্যা তাঁহার পরিচর্যা করিতেছিলেন। একদিন ইহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা একটি পাপীকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতেছ। সে দুনিয়ায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ দুই হাতে একত্রিত করিয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপ, শেষ পর্যন্ত উহা দোযখে নিক্ষিপ্ত না হয়! তৎপর এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ঃ "আমি তোমাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের দ্বারে লাঞ্ছিত হওয়ার মত অবস্থা হইতে চিরতরে বাঁচাইয়া দিয়াছি।" -(তাবারী)

স্বীয় মহত্ত্বের উল্লেখ

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি আসহাব ইবনে রানীলার বিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করেন। যাহার মর্ম হইল– "তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহত্ত্ব এবং দানশীলতাও মরিয়া যাইবে। দানপ্রার্থীদের হাত ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং দ্বীন-দুনিয়ার নৈরাশ্য বরাদ্দ হইবে।"

এই কবিত শুনিয়া তাঁহার কন্যাগণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, কখনই নয়, আমীরুল মোমেনীন! খোদা আপনার মঙ্গল করুন, কখনও এইরূপ হইবে না। আমীর মোয়াবিয়া কোন উত্তর দিলেন না, কেবল একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার আবৃত্তিকৃত কবিতার অর্থ হইল– "মৃত্যু যখন নখ বিঁধাইয়া দেয়, তখন কোন প্রকার তাবিজই আর কাজে আসে না।"

অন্তিম উপদেশ

এই ঘটনার পর আমীর মোয়াবিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুশ হইলে স্বীয় পরিবার-পরিজনের লোকদিগকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "আল্লাহকে সর্বদা ভয় করিও! কেননা যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করেন। ঐ ব্যক্তির জন্য কোন প্রকার আশ্রয় নাই, যে আল্লাহর প্রতি ভীতি পোষণ করে না।"– (তাবারী)

অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিলে কাসেদ প্রেরণ করতঃ ইয়াযিদকে ডাকিয়া পাঠানো হইল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যাত্রা করিলেন, কিন্তু আসিয়া পৌঁছিতে পৌঁছিতে আমীরের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া গেল। ইয়াযিদ আসিয়াই পিতাকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি আর কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া ইয়াযিদ ক্রন্দন করিতে শুরু করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, "যদি দুনিয়ার কোন মানুষ সর্বদা জীবিত থাকিত, তবে নিঃসন্দেহে তাহাদের আমীর জীবিত থাকিতেন। কেননা, তিনি কোন অবস্থায়ই শক্তিহীন ও তুচ্ছ ছিলেন না।"

"তিনি ছিলেন বিশেষ বিজ্ঞ ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী, কিন্তু মৃত্যুর সময় কোন বুদ্ধি আর কাজে আসিল না।"

এই কথা শুনিয়া আমীর মোয়াবিয়া চক্ষু খুলিলেন এবং ইয়াযিদকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ "বৎস! যে বিষয়ে আমি খোদার দরবারে বিশেষ ভয় পোষণ করিতেছি, তাহা হইতেছে, তোমার জন্য আমার ব্যবস্থা। প্রিয় বৎস, একদা আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহিত কোন ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। অজু করার সময় আমি তাঁহাকে পানি ঢালিয়া দিয়াছিলাম। আমার পরিধানের জামা ছিঁড়া ছিল। বলিলেন, মোয়াবিয়া, তোমাকে কি একটা ভাল জামা দিব? আমি নিবেদন করিলাম, নিশ্চয়; দিন হুজুর! তিনি আমাকে নিজের

একটি জামা দান করিলেন, কিন্তু আমি উহা একদিনের বেশী পরিধান করি নাই। সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম। এখনও উহা আমার নিকট রক্ষিত আছে। আর একদিন আল্লাহর রসূল ক্ষৌর করাইলেন। আমি তাঁহার কিছু পবিত্র চুল ও নখ আনিয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম। আজ পর্যন্তও তাহা একটি শিশির মধ্যে আমার নিকট রক্ষিত আছে। দেখ, মৃত্যুর পর গোসল ও কাফন দেওয়া সমাপ্ত হইলে ঐ চুল ও নখ আমার চোখের উপর এবং মুখমণ্ডলে ছড়াইয়া দিও। তৎপর আল্লাহর রসূলের সেই জামাটি বিছাইয়া উহার উপর আমাকে কাফন দিও। আমার বিশ্বাস, কোন বস্তু যদি আমাকে সামান্য উপকার করে, তবে এই জিনিসগুলিই করিবে।" (ইস্তিয়াব, ইকদুল ফরীদ)

মৃত্যু যন্ত্রণা

মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পরও এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিলেন, "আমি যদি মরিয়া যাই, তবে কি কেহ চিরকাল জীবিত থাকিবে? মৃত্যু কি কোন পাপ?"– (ইস্তিয়াব)

ঠিক মৃত্যুর সময় তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ "আফসোস! যদি আমি রাজ্যপতি না হইতাম! আক্ষেপ! যদি আমি দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করিতে যাইয়া অন্ধ না হইতাম!

আক্ষেপ! আমি যদি সেই ভিখারীর ন্যায় হইতাম, যে সামান্যতে জীবন যাপন করে।"– (ইকদুল ফরীদ)

এই কথা বলিতে বলিতে মুসলিম জাহানের এই প্রতিভাবান ব্যক্তি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইয়াযিদের মর্সিয়া

আমীর মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াযিদ এই মর্সিয়া রচনা করিয়াছিলেন ঃ "কাসেদ যখন পত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল, তখন আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর সর্বনাশ হউক। পত্রে কি লিখা রহিয়াছে? কাসেদ বলিল, 'খলিফা ভীষণ অসুস্থ! ভীষণ কষ্ট পাইতেছেন।' তখন ভূমি যেন আমাকে লইয়া ধসিয়া যাইতে শুরু করিল, যেন উহার কোন স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। হেন্দা তনয় (মোয়াবিয়া) মারা গিয়াছেন? সঙ্গে সঙ্গে মর্যাদাও মরিয়া গিয়াছে। উভয়ে সর্বদা একত্রে থাকিতেন। এখন উভয়েই যাইতেছেন। যে পতনের দিকে চলিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও তাহাকে উঠানো যাইবে না। আর যে উঠিতেছে, তাহাকে সহস্র চেষ্টার পরও পতিত করা চলিবে না। সৌভাগ্য ও মর্যাদা যাহা দ্বারা রহমতের ধারা ভিক্ষা করিত, যদি মানুষের বুদ্ধির পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তবে তিনিই সকলের উপর থাকিতেন।"– (ইস্তিয়াব, তাবারী)

ইয়াযিদের খুৎবা

আমীর মোয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর দীর্ঘ তিন দিন ইয়াযিদ গৃহ হইতে বাহির হইলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি আসিয়া নিম্নোক্ত খুৎবা দিলেন ঃ

সর্বময় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি স্বীয় ইচ্ছায় কর্ম করেন। যাহাকে ইচ্ছা দেন যাহাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। কাহাকেও সম্মান দান করেন, কাহাকেও দেন লাঞ্ছনা।

"লোকসকল, মোয়াবিয়া আল্লাহর রজ্জুসমূহের অন্যতম ছিলেন। আল্লাহর যে পর্যন্ত ইচ্ছা ছিল উহা বিস্তৃত করিয়াছিলেন, যখন ইচ্ছা হইয়াছে কাটিয়া ফেলিয়াছেন। মোয়াবিয়া স্বীয় অগ্রবর্তীদের তুলনায় অধম এবং পরবর্তীদের তুলনায় উত্তম ছিলেন। আমি এখন আর তাঁহাকে নির্দোষ ও পবিত্রতম বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব না। তিনি তাঁহার প্রভুর নিকট পৌছিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহাকে তিনি ক্ষমা করেন, তবে তাঁহার অনুগ্রহ বলিতে হইবে। আর যদি মোয়াবিয়াকে তিনি শাস্তি দেন তবে উহা তাহারই পাপের শাস্তি হইবে। আমি তাহার পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আমি অবাধ্য বা দুর্বল নই। তোমরা কোন বিষয়ে অধীর হইও না। খোদা যদি কোন বিষয় পছন্দ না করেন, তবে তাহা শীঘ্রই পরিবর্তন করিয়া দেন। যদি পছন্দ করেন তবে তাহা সহজ করিয়া দেন।"

হযরত আবদুল্লাহ্ যুল বাজাদাইনের ইন্তেকাল

মৃত্যু মানব জীবনের শেষ মঞ্জিল। মৃত্যুকে জীবনের মুকুরও বলা চলে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মানুষ তাহার অতীত জীবনের একটি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। কোন লোক যদি তাহার অতীত জীবন হিংসা-দ্বেষ ও পরের অপকার করিয়া অতিবাহিত করিয়া থাকে, তবে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে তাহার কর্মফলের একটি খতিয়ান অবশ্যই লক্ষ্য করিবে। দেখিবে, মৃত্যুর কঠোর হস্ত জীবনের অতীত ইতিহাস জীবন্তরূপে তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে।

আর যদি কেহ জীবনের ব্রত হিসাবে প্রেম-প্রীতি ও পরোপকার গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে মৃত্যু তাহার কর্মফলকে পুষ্পহারের ন্যায় তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরে। সে দেখিতে পায়, জীবনের শেষ মঞ্জিলে তাহার কর্মফল আশীর্বাদরূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। ইসলামের এক বিস্মৃতপ্রায় ত্যাগী পুরুষ হযরত আবদুল্লাহ্ যুল বাজাদাইনের মৃত্যু এই শেষ মঞ্জিলে জীবনের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের একটি স্মরণীয় আদর্শ।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই ত্যাগী পুরুষের নাম ছিল আবদুল উজ্জা। শিশুকালেই তিনি পিতৃহারা হন। ধনী পিতৃব্য এই এতীমের লালন-পালন ভার গ্রহণ করেন। পিতৃব্যের

যত্নে যখন তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করেন, তখন পিতৃব্য তাঁহাকে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়া একটি সুখের সংসার পাতিয়া দেন।

যেই সময়ের কথা বলিতেছি, আল্লাহর রসূল তখন মদীনায় হিজরত করিয়াছেন। মদীনার দরবার হইতে তওহীদের বাণী আরবের প্রতি জনপদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবদুল্লাহর প্রকৃতিতে ছিল স্বাভাবিক সততা। ইসলামের বাণী কর্ণে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই সত্যবাণী কবুল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইসলামের বাণী আরবের পথে-প্রান্তরে যতই দ্রুত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাঁহার অন্তরের আবেগ ততই তীব্রতর হইতেছিল, কিন্তু পিতৃব্যের ভয়ে তিনি এই আবেগ প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। সবসময়ই তিনি পিতৃব্যের পানে চাহিয়া সময় কাটাইতেছিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, পিতৃব্য যদি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলেন তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অভীষ্ট পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

এই প্রতীক্ষায়ই আবদুল্লাহ যুল বাজাদাইনের দিন-সপ্তাহ-মাস এইভাবে বৎসরও কাটিয়া গেল, কিন্তু পিতৃব্যের মনোভাবের কোন পরিবর্তন তিনি দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে দেখিতে মক্কা জয়ের ঘটনাও অতীত হইয়া গেল। ইসলামের জয়যাত্রা আল্লাহর রহমতের সওগাত লইয়া আরবের পথে-প্রান্তরে পুষ্প বর্ষণ করিয়া চলিল। আল্লাহর রসূল পবিত্র কাবাগৃহ দেবদেবীমুক্ত করিয়া মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। এতদিনে আবদুল্লাহর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। একদিন তিনি পিতৃব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "পিতৃব্য, আমি দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবৎ আপনার ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় বসিয়া কাল কাটাইতেছিলাম, কিন্তু আপনার মনোভাবের কোন প্রকার পরিবর্তন না দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি। জীবনের প্রতি আর বেশী ভরসা আমি করিতে পারিতেছি না। এখন আমাকে অনুমতি দিন যেন ইসলাম গ্রহণ করিতে পারি।" যুল বাজাদাইন যে বিষয়ে ভয় করিতেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে তাহাই দেখা গেল। ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃব্য ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তিনি তর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি যদি শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করার স্পর্ধাই দেখাও, তবে আমি আমার সকল সম্পত্তি তোমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইব। তোমাকে পরিধানের জামাকাপড় পর্যন্ত এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে। তুমি শেষ পর্যন্ত এখান হইতে এমনভাবে বহিষ্কৃত হইবে যে তোমার শরীরে কাপড়ের একটি সূতাও অবশিষ্ট থাকিবে না।"

যুল বাজাদাইনের তখনকার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার মনে হইল দুনিয়ার গোটা জীবন ধারণের অবলম্বন যেন একটি মণ্ডাকার করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া

হইল এবং বলা হইল ঃ দেখ, এই তোমার জীবনের অবলম্বন, যদি চাও তবে উহা হযরত ইব্রাহীম খলিলের ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে নিজ হাতে কোরবানী করিয়া দাও। মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া যুল বাজাদাইন সবকিছু কোরবানী দিতেই প্রস্তুত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "পিতৃব্য, আমি অবশ্যই মুসলমান হইব, আমি হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর অনুকরণ অবশ্যই করিব, শেরেক ও মূর্তিপূজা আর অধিক দিন করিতে পারিব না। আপনার ধন - সম্পদ আপনার জন্য মোবারক হউক, আমার জন্য আমার ইসলাম রহিয়া গেল। অল্প কিছুদিন পরেই অবশ্য মৃত্যুর কঠোর হস্ত এই সব হইতে আমাকে ছিনাইয়া লইবে; সুতরাং আজই যদি তাহা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করি, তবে মন্দ কি? আপনি আপনার সম্পদ ফেরৎ নিন, এইসবের জন্য আমি সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

এই অবস্থায়ই তিনি তাঁহার মাতার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা পুত্রকে এমন দিগম্বর উলঙ্গ দেখিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং অস্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন, বৎস, তোমার এই অবস্থা হইল কেন? যুল বাজাদাইন বলিলেন, "মা, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি।" আল্লাহ! যুল বাজাদাইনের মুখে মুসলমান হইয়া যাওয়ার এই ঘোষণা কতই না চমৎকার শুনাইতেছিল! বাস্তবের সহিত ছিল এর কত গভীর সম্পর্ক। তিনি নিজ হাতে জীবন ধারণের উপযোগী পার্থিব সকল সম্পদ বিসর্জন দিয়া দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ প্রয়োজনটুকু পর্যন্ত কোরবান করিয়া ইসলামের জন্য এবং একমাত্র ইসলামের জন্যই জীবনের সকল বাঁধন, সকল অবলম্বন কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছিলেন! তাঁহার হাতে ছাগল, মেষ, উট, ঘোড়া কিছুই আর ছিল না! পরবর্তী মুহূর্তে মুখে দেওয়ার জন্য সামান্য খাবার, বিশ্রামের জন্য একটু আশ্রয়, পরিধানের এক টুকরা কাপড়, কিছুই আর তাঁহার অবশিষ্ট ছিল না। ঠিক এই অবস্থায় সংসারের সকল বাঁধন হইতে দূরে সরিয়া প্রকৃতির সন্তানের মতো তখন তাঁহার একমাত্র ধারণা ছিল, তিনি তওহীদবাদী মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি করিবে? তিনি বলিতে লাগিলেন, এখন আমি হযরত মোহাম্মদের (সা.) দরবারে গমন করিব। আমার অনুরোধ, আমাকে এক টুকরা কাপড় দাও, যেন কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিয়া তাঁহার দরবার পর্যন্ত পৌছিতে পারি। মাতা একখানা কম্বল আনিয়া দিলেন। যুল বাজাদাইন সেই কম্বলটিকে দুই টুকরা করিয়া এক টুকরা পরিধান করিলেন এবং আর এক টুকরা গায়ে জড়াইয়া লইলেন। এই অবস্থায় তিনি মদীনার পথে রওয়ানা হইয়া গেলেন।

রাতের অন্ধকার নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল। বিশ্ব প্রকৃতি নবারুণের সম্বর্ধনা করিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। পাখীকুল ছিলো আল্লাহর গুণগানে বিভোর। সুবহে সাদেকের আলোর কিরণ-স্নাত ভোরের বাতাস মসজিদে নববীর পবিত্র আঙ্গিনায় আসিয়া উঁকি মারিয়া

যাইতেছিল! ঠিক এই মুহূর্তে যুল বাজাদাইন মসজিদে নববীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। মসজিদের একটি দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস্ লাগাইয়া রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই আল্লাহর রসূল (সা.) মসজিদ প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। প্রাঙ্গণের প্রতিটি বালুকণা যেন তাঁহার খোশ আমদেদের তারানা গাহিয়া উঠিল! যুল বাজাদাইন রসূলের আগমনের কথা অনুভব করিলেন। মসজিদে পা রাখিয়াই রসূলুল্লাহ (সা.) যুল বাজাদাইনকে দেখিতে পাইলেন।

রসূলে খোদা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনি? যুল বাজাদাইন বলিলেন— এক নিঃস্ব মুসাফির; আপনার পবিত্র দর্শনপ্রার্থী। আমার নাম আবদুল উজ্জা।

আল্লাহর রসূল (সা.) তাঁহার আনুপূর্বিক ঘটনা শুনিলেন এবং বলিলেন, এখন হইতে আমার নিকট এই মসজিদেই অবস্থান করিতে থাকুন।

সেই দিন হইতে আল্লাহর রসূল এই ত্যাগী মহাপুরুষের নামকরণ করিলেন আবদুল্লাহ। মসজিদে নববীর আসহাবে সুফ্ফার সাধক শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেন এই ত্যাগী পুরুষও। আবদুল্লাহ তখন হইতে দিনরাত অন্যান্য সাথীদের সহিত মিলিয়া কোরআন পাক শ্রবণ করিতেন এবং উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে থাকিতেন।

একদিন হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলিলেন, বন্ধু! এত উচ্চকণ্ঠে কোরআন পাঠ করিবেন না, যাহাতে করিয়া অপরের নামাযে বিঘ্ন জন্মায়।

এই কথা শুনিয়া রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, ওমর (রা.), তাহাকে কিছু বলিও না, ইনি আল্লাহর এবং তাঁহার রসূলের জন্য সব কিছুই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।

হিজরী নবম সনে শোনা গেল, আরবের সমস্ত খৃষ্টান সম্প্রদায় রোম সম্রাটের নেতৃত্বে একত্রিত হইয়া মুসলমানদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়াছে। আরবে তখন ভীষণ গরম পড়িয়াছিল। এই সময় আল্লাহর রসূল সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রীর জন্য চারিদিকে আবেদন করিলেন। হযরত ওসমান (রা.) ২৯০০ উট, ১০০ ঘোড়া এবং এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা চাঁদা দিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) চল্লিশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা প্রেরণ করিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) সমস্ত সম্পত্তি দুই ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ যুদ্ধের জন্য জমা দিলেন।

হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) তাঁহার সর্বস্ব দিয়া দিলেন। হযরত আবু আকীল আনসারী সারারাত্র পরিশ্রম করিয়া সর্বমোট চারি সের খেজুর জমা করিলেন। তন্মধ্য হইতে দুই সের পরিবার-পরিজনের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট দুই সের খেজুর যুদ্ধ ফান্ডে দিয়া দিলেন।

আল্লাহর রসূল ত্রিশ হাজার তওহীদের সন্তানসহ অগ্নিবর্ষী মরুভূমির উপর দিয়া মদীনা

হইতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাহন এত অল্প ছিল যে, প্রতি আঠারো জন ব্যক্তি মিলিয়া একটি করিয়া উট পাইয়াছিলেন। রসদসামগ্রী এতই অপ্রতুল ছিল যে, আল্লাহর এই বাহিনী গাছের পাতা খাইয়া প্রবল প্রতাপশালী রোম সম্রাটের সুসজ্জিত বিপুল সৈন্যবাহিনীর সহিত লড়াই করিতে মনজিলের পর মনজিল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ যুল বাজাদাইন খোদার রাহে জেহাদ করতঃ শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এত অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর বিলম্ব সহ্য হইতে ছিল না। একসময় তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন আমি যেন শহীদ হইতে পারি।"

রসূলুল্লাহ (সা.) বলিলেন, তুমি কোন একটা গাছের ছাল আন। আবদুল্লাহ খুশী মনে একটি গাছের ছাল তুলিয়া আনিলেন। আল্লাহর রসূল (সা.) তখন ছালটুকু আবদুল্লাহর বাহুতে বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "আয় আল্লাহ, আমি কাফেরদের পক্ষে আবদুল্লাহর রক্ত হারাম করিয়া দিতেছি।" আবদুল্লাহ রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি যে শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষী।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিলেন, যখন তুমি আল্লাহর পথে বাহির হইয়াছ, তখন জ্বরে ভুগিয়া মরিলেও শহীদ হইবে।

ইসলামী ফৌজ যখন তাবুক প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইল, তখন সত্য সত্যই আবদুল্লাহ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া গেলেন। জ্বর তাঁহার জন্য শাহাদাতেরই পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছিল। আল্লাহর রসূল (সা.) খবর শুনিয়া বিশিষ্ট সাহাবীগণের সহিত তশরীফ আনিলেন।

হযরত ইবনে হারেস মোযানী বর্ণনা করেন, তখন রাত্রিকাল ছিল। হযরত বেলাল (রা.) প্রদীপ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.) আবদুল্লাহ যুল বাজাদাইনের পবিত্র লাশ কবরে প্রবেশ করাইতেছিলেন এবং খোদ আল্লাহর রসূল কবরের ভিতর দাঁড়াইয়া এই ত্যাগী পুরুষের লাশ গ্রহণ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন– "তোমাদের এই ভাইকে সম্মানের সহিত কবরে প্রবেশ করাও।"

লাশ যখন কবরে রাখা হইল, তখন আল্লাহর রসূল বলিতে লাগিলেন, উহার উপর আমি নিজ হাতে পাথর বিছাইয়া দিব। আল্লাহর রসূলের পবিত্র হাতেই এই মর্দে মুমিনের কবর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হইল। পাথর বিছানো শেষ হইলে হাত উঠাইয়া মুনাজাত করিতে লাগিলেন, "আয় আল্লাহ, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি এই মৃতের প্রতি প্রীত ছিলাম। তুমিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিও।"

হযরত ইবনে মসউদ (রা.) এই দৃশ্য দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "আফসোস! এই কবরে যদি আজ আমি সমাহিত হইতাম।"

হযরত খুবাইবের শাহাদাত

সাধারণতঃ শত্রু যদি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবে মানুষ স্বস্তি অনুভব করে, কিন্তু মুসলমানগণ যখন জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন, স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ কাফেরদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া মক্কা হইতে তিন শত মাইল দূরবর্তী মদীনায় যাইয়া আশ্রয় নিলেন, তখন কাফের শক্তি যেন আরো অধীর হইয়া উঠিল। কেননা, তাহারা মনে করিতেছিল, দূরে বসিয়া মুসলমানগণ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পাইবেন। আরববাসীগণ আল্লাহর রসূল (সা.)-কে জানিতে সুযোগ পাইবে, ধীরে ধীরে তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিতে থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত এই বিন্দু সাগরে পরিণত হইয়া প্রবল শক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। শেষ পর্যন্ত ইসলামের এই প্লাবনের সম্মুখে তাহাদের ভুয়া নেতৃত্ব তৃণ-খণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে।

মদীনায় পৌছিয়া মুসলমানদের পক্ষে প্রতিশোধ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হইল না। মক্কার কোরায়শগণ মানসিক অস্থিরতার চাপে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সংঘর্ষ সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইল, কিন্তু বদর ও ওহুদের ময়দানে শক্তি পরীক্ষার পর যখন তাহাদের ক্ষমতার মিথ্যা আত্মাভিমানও নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন চারিদিক হইতে তাহারা ব্যাপকভাবে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতে শুরু করে। তাহারা 'আজল' ও 'কারা' গোত্রের সাত ব্যক্তিকে রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করতঃ এই প্রস্তাব পেশ করে, আপনি যদি কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবী প্রেরণ করেন, তবে আমরা গোত্রের সকল লোকই ইসলাম গ্রহণ করিব। রসূলে খোদা (সা.) হযরত আসেম ইবনে ছাবেত (রা.)-এর নেতৃত্বে দশ জন বিশিষ্ট সাহাবীর একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিলেন।

অপরদিকে এক স্থানে কাফেরদের দুইশত যোদ্ধা মুসলমানদের এই সংক্ষিপ্ত জামাতটির অপেক্ষা করিতেছিল। মুসলমানদের জামাত যখন তথায় পৌছিল তখন নাঙ্গা তরবারি বিজলীর শক্তিতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল। মুসলমানগণ যদিও কোরআনের বাণী প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু একেবারে নিরস্ত্র ছিলেন না। সংকট দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুইশত তরবারির সম্মুখে দশটি তরবারিও কোষমুক্ত হইল এবং উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম শুরু হইয়া গেল। আট জন সাহাবী বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত খুবাইব ইবনে আদী এবং যায়েদ ইবনে দাসেনা (রা.) নামক দুই সিংহপুরুষ গ্রেফতার হইয়া গেলেন। সুফিয়ান হোযালী এই দুই বীরকে মক্কায় লইয়া গিয়া নগদ মূল্যে মক্কার হিংস্র পশুদের নিকট বিক্রয় করিয়া আসিল।

উভয় বন্দীকেই হারেস ইবনে আমেরের গৃহে রাখা হইল। কাফেররা এইরূপ নির্দেশ দিল, তাহাদের রুটি বা পানি কিছুই যেন দেওয়া না হয়। হারেস অক্ষরে অক্ষরের নির্দেশ পালন করিল। বন্দীদের জন্য খাবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

একদিন হারেসের শিশুপুত্র একটি ছুরি লইয়া খেলিতে খেলিতে বন্দী হযরত খুবাইবের নিকট পৌছিয়া গেল। দীর্ঘ কয়েকদিনের ক্ষুৎপিপাসায় কাতর আল্লাহর এই নেক বান্দা হারেসের শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাহার হাত হইতে ছুরি লইয়া মাটিতে রাখিয়া দিলেন। ইতিমধ্যেই হারেসের স্ত্রী আসিয়া দেখিল, খুবাইব শিশু ও ছুরি সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছেন। স্ত্রীলোকটি মুসলিম চরিত্র সম্পর্কে কিছুই জানিত না। এই মারাত্মক অবস্থা দেখিয়া ভয়ে আতঙ্কে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল এবং অধীর কণ্ঠে চীৎকার করিতে শুরু করিল। হযরত খুবাইব (রা.) স্ত্রীলোকটির অধীরতা অনুভব করিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগ্নী, আপনি শান্ত হউন, আমি এই নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করিব না। মুসলমান জুলুম করে না।" এই কথা বলিয়াই হযরত খুবাইব শিশুটিকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন। শিশু ছুটিয়া গিয়া মায়ের কোলে উঠিয়া পড়িল।

কোরায়শ দল কয়েকদিন অপেক্ষা করিল, কিন্তু অনাহারে যখন মৃত্যু হইল না তখন তাঁহাকে হত্যা করার জন্য তারিখ ঘোষণা করা হইল। খোলা ময়দানে একটি কাষ্ঠফলক পোঁতা হইল। কোরায়শ দল ফলকটির চারিধারে তরবারি ও বর্শা উঠাইয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ তরবারি ভাজিতে ছিল। কেহ কেহ ধনুকে তীর সংযোজন করিতেছিল। এমতাবস্থায় ঘোষণা করা হইল, খুবাইবকে আনা হইতেছে। মুহূর্তে ময়দান সরগরম হইয়া উঠিল। উৎসুক দর্শকের দল চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে শুরু করিল। কিছু লোক অস্ত্র ঠিক করিতে করিতে বন্দীর উপর আক্রমণ করিয়া পৈশাচিক উপায়ে রক্ত প্রবাহিত করার জন্য প্রস্তুত হইল।

বীর মুসলিম হযরত খুবাইব (রা.) এক পা এক পা করিয়া বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে শূলের নীচে আনিয়া খাড়া করা হইল। এক ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, খুবাইব, আমরা তোমার এই বিপদে দুঃখ অনুভব করিতেছি। এখনও যদি তুমি ইসলাম ত্যাগ কর তবে তোমাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

হযরত খুবাইব (রা.) সম্বোধনকারীর দিকে মুখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইসলামই যদি অবশিষ্ট না থাকে, তবে জীবন রক্ষা অর্থহীন। এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক জবাব জনতার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল। ক্ষণিকের জন্য উত্তেজিত জনতা স্তব্ধ নীরব হইয়া গেল!

দ্বিতীয় এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল, "খুবাইব, কোন অন্তিম ইচ্ছা থাকিলে বলিতে পার।"

হযরত খুবাইব (রা.) জবাব দিলেন, "মাত্র দুই রাকাত নামায পড়িতে চাই; অন্য

কোন ইচ্ছা নাই।" জনতা জানাইয়া দিল, ভাল কথা– শীঘ্র সারিয়া নাও। ফাঁসির রজ্জু প্রস্তুত ছিল, হযরত খুবাইব (রা.) উহার নীচে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া শেষ বারের মত প্রিয়তমের এবাদত করিতে প্রস্তুত হইলেন। হৃদয়ের নিষ্ঠা ও অনুরাগ নিংড়ানো এই মুখ প্রিয়তমের গুণগান করিতে যাইয়া বন্ধ হইতে চাহিল না। যে দুই হাত মহান আল্লাহর সম্মুখে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা আর খুলিতে চাহিল না। রুকুর উদ্দেশে অবনত কোমর আর সোজা হইতে চাহিল না। মাটির বিছানা হইতে সেজ্‌দার অনুরাগ শেষ হইল না! চক্ষুযুগল হইতে এত বিনয়ের অশ্রু প্রবাহিত হইতে চাহিল, যেন শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু অশ্রু হইয়া চোখের কোণে নামিয়া আসে। আল্লাহর এই উষর পৃথিবী যেন অশ্রুর সিঞ্চনীতে জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরিয়া উঠে!

হযরত খুবাইবের প্রেমিক অন্তর আত্মনিবেদনের আনন্দে মত্ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি অন্তর হইতে এক নূতন আহ্বান শুনিতে পাইলেন, এই আহ্বান বুঝি একমাত্র শহীদের অন্তরই অনুভব করিতে পারে। তিনি যেন অনুভব করিলেন, নামায অধিক লম্বা করিলে কাফেরগণ এই কথা ভাবিতে শুরু করিবে, তাঁহার মুসলিম অন্তর বুঝি মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া গিয়াছে। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কাফেরদের তরফ হইতে কোন জবাব আসিল না, কিন্তু তাহাদের অগণিত তীরের তীক্ষ্ম মুখ এবং উত্তোলিত তরবারির তীক্ষ্মধার যেন সজীব হইয়া সালামের জবাব দিয়া উঠিল। তিনি বাম দিকে মুখ ফিরাইয়াও সালামের বাণী উচ্চারণ করিলেন। কাফেরকুলের নির্বাক জামাত উহারও কোন জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু অগণিত বর্শার সুচিতীক্ষ্ম ফলক যেন বলিয়া উঠিল, হে ইসলামের অমর মোজাহেদ, তোমার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক।

মরদে মোজাহেদ হযরত খুবাইব (রা.) সালাম ফিরাইয়া শূলের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাফেররা তাঁহাকে কাষ্ঠের সহিত বন্ধন করতঃ তীক্ষ্মধার তীর ছুঁড়িয়া তাঁহার খোদা প্রেমের শেষ পরীক্ষা লইতে শুরু করিল। একব্যক্তি অগ্রসর হইয়া তাঁহার সর্বশরীরে বর্শা ফলক দ্বারা হালকাভাবে ছিদ্র করিয়া দিল। অল্পক্ষণ পূর্বেই নামাযের বিছানায় মরদে মুমিনের যে পবিত্র রক্ত অশ্রুর বন্যায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাই শত ছিদ্র দিয়া বাহির হইতে শুরু করিল। হযরত খুবাইবের এই ধৈর্য কি অপূর্ব! শূলের স্তম্ভের সহিত তাঁহার সর্বশরীর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে। তৎপর এক একটি তীর আসিয়া তাঁহার শরীরে এপার ওপার হইয়া যাইতেছে। তীক্ষ্মধার বর্শা তাঁহার বুকের পাঁজর ভেদ করিয়া বিদ্ধ হইতেছে। এক একটি আঘাত তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিন্তু এই অবস্থায়ও তিনি ইসলামের কঠোর স্বীকারোক্তিতে অটল রহিয়াছেন। দুঃখ-বেদনার এই প্রলয়ও তাঁহার অন্তরকে ইসলামের উপর হইতে হটাইতে পারিতেছে না।

এই সময় আর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার বুকে বর্শা রাখিল। ধীরে ধীরে তাহা এতটুকু বিদ্ধ করিল যে, অর্ধেকটুকু ফলক তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। এই সময় আক্রমণকারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তোমার স্থানে যদি মোহাম্মদকে বাঁধিয়া তোমাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে তুমি কি উহা পছন্দ করিবে?" ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হযরত খুবাইব (রা.) একটি একটি করিয়া অস্ত্রের কঠিন আঘাত সহ্য করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট পাপাত্মার এই একমাত্র বাক্যবাণ যেন সহ্য হইল না। যবানের এক এক ফোঁটা রক্ত যদিও ইতিপূর্বেই নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তবুও এই শুষ্ক মুখেই নূতন শক্তি দেখা দিল। জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি বলিতে লাগিলেন, "নিষ্ঠুর! খোদা জানেন, আমি তিলে তিলে প্রাণ দিয়া দিতে পারি, কিন্তু আল্লাহর রসূলের পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার দৃশ্যও সহ্য করিতে আমি প্রস্তুত নই।"

নামায পড়ার পর হইতে হযরত খুবাইবের উপর যে কঠিন বিপদ নামিয়া আসিতেছিল তাহার প্রত্যেকটি আঘাতই তিনি অম্লান বদনে সহ্য করিয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহার প্রশান্ত যবান হইতে এক একটি আঘাতের সহিত এক একটি কবিতা বাহির হইয়া আসিতেছিল। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলিতেছিলেন,—

১. লোক দলে দলে আমার চারিদিকে সমবেত হইয়াছে। কবিলা, জামাত সকলেরই যেন এখানে উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

২. এই সমাবেশ একমাত্র শত্রুতা প্রদর্শনের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা আমার বিরুদ্ধে জিঘাংসা বৃত্তিরই প্রদর্শন করিতেছে মাত্র এবং আমাকে এখানে মৃত্যুর খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

৩. ইহারা এই প্রদর্শনীতে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে সমবেত করিয়া একটি উচ্চ মঞ্চে একত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

৪. ইহারা বলে, যদি ইসলাম অস্বীকার করি তবে আমাকে মুক্ত করিয়া দিবে, কিন্তু আমার পক্ষে ইসলাম পরিত্যাগের চাইতে মৃত্যু কবুল করা যে অনেক সহজ। আমার চক্ষু হইতে যদিও অশ্রু ঝরিতেছে, তথাপি আমার অন্তর সম্পূর্ণ শান্ত।

৫. আমি শত্রুর সম্মুখে মস্তক অবনত করিব না, কাহারও বিরুদ্ধে ফরিয়াদও করিব না। আমি ভীত হইব না। কেননা, আমি জানি, আমি আল্লাহর সান্নিধ্যেই যাইতেছি।

৬. আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, কেননা আমি জানি, সর্বাবস্থায়ই মৃত্যু আসিবে। আমার কেবলমাত্র একটি ভয় আছে এবং তাহা দোযখের আগুনের ভয়।

৭. আরশের মালিক আমার দ্বারা সেবা করাইয়াছেন এবং দৃঢ়তা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছেন। কাফেররা এখন আমার শরীর টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে, এতক্ষণে আমার সকল আশাই শেষ হইয়া গিয়াছে।

৮. আমি আমার এই অসহায়তা, নিঃসঙ্গতার জন্য কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই ফরিয়াদ করিতেছি। জানি না আমার মৃত্যুর পর উহাদের কি ইচ্ছা! যত কিছুই হউক, আল্লাহর পথে যখন আমি জীবন দান করিতেছি, তখন উহারা যাহা কিছুই করুক না কেন, ইহাতে আমার আর কোন ভাবনা নাই।

৯. আমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখি। তিনি আমার শরীরের এক এক টুকরা গোশ্‌তের মধ্যে বরকত দান করিবেন। "হে আল্লাহ, আমার উপর যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, তোমার রসূলকে তাহা জানাইয়া দাও।"

হযরত সায়ীদ ইবনে আমের হযরত ওমর ফারুকের কর্মচারী ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। একদিন হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি কোন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি সম্পূর্ণ সুস্থই রহিয়াছি। কোন প্রকার রোগে ভুগিতেছি না। হযরত খুবাইবকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয়, তখন আমি দর্শকদের দলে ছিলাম। সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা স্মরণ হইলে পর আমার সংজ্ঞা থাকে না। অন্তর কাঁপিতে কাঁপিতে আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের শাহাদাত

হযরত আবদুল্লাহর পিতা ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মাতা হযরত আস্‌মা, মাতামহ হযরত আবু বকর সিদ্দিক, খালা উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা এবং দাদী ছিলেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফুফী হযরত সাফিয়া।

তিনি মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র সাত আট বৎসর বয়সেই তিনি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতে বায়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। মুসলমানদের সাইপ্রাস বিজয় তাঁহারই দূরদর্শিতার ফল। জঙ্গে জামালে তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকার পক্ষে প্রাণ খুলিয়া যুদ্ধ করেন। জঙ্গে সিফ্‌ফিনের সময় নিরপেক্ষ ছিলেন। হযরত ইমাম হাসান (রা.) যখন হযরত মোয়াবিয়ার অনুকূলে খেলাফতের দাবী পরিত্যাগ করেন, তখন তিনিও বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে হযরত মোয়াবিয়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নেন, কিন্তু আমীর মোয়াবিয়া (রা.) যখন ইয়াযিদকে খেলাফতের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন তিনি ঘোর বিরোধিতা শুরু করেন। ফলে আমীর মোয়াবিয়া (রা.) স্বয়ং মদীনায় আগমন করতঃ হযরত ইমাম হোসাইন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখকে ডাকাইয়া আলোচনার ব্যবস্থা করেন। আলোচনা সভায় সকলে মিলিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে প্রধান মুখপাত্র নির্বাচিত করেন। এই সভায় উভয় পক্ষে যে

আলোচনা হইয়াছিল তাহার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

আমীর মোয়াবিয়া (রা.) বলিলেন ঃ আপনারা আমার আন্তরিকতা, সমবেদনা ও ক্ষমাগুণ সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকেফহাল আছেন। ইয়াযিদ আপনাদেরই ভাই ও পিতৃব্য পুত্র। আপনারা তাহাকে নামেমাত্র খলিফা মানিয়া নিন এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ, যথা রাজস্ব, বিচার বিভাগ প্রভৃতি পরিচালনা নিজ হস্তে গ্রহণ করুন। ইয়াযিদ কখনও আপনাদের কোন কাজে বাধার সৃষ্টি করিবে না। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, কেহ কোন জবাব দিলেন না।

আমীর মোয়াবিয়া (রা.) বলিলেন, "ইবনে যুবাইর, আপনি সকলের মুখপাত্র, আপনিই উত্তর দিন।"

হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) জবাব দিলেন, আপনি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের পথ অবলম্বন করুন; আমরা সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ আনুগত্যে মাথা নত করিয়া দিব।

আমীর মোয়াবিয়া (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের নীতি কি ছিল?

ইবনে যুবাইর (রা.) বলিলেন, আল্লাহর রসূল কাহাকেও স্বীয় খলিফা নিযুক্ত করেন নাই। মুসলিম সাধারণ তাঁহার পর হযরত আবু বকরকে খলিফা নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

আমীর মোয়াবিয়া (রা.) উত্তর দিলেন, "আজ আমাদের মধ্যে হযরত আবু বকরের ন্যায় ব্যক্তিত্ব কোথায়? আমি যদি তাঁহাদের পথ অবলম্বন করিতে যাই তবে মতবিরোধ আরও বর্ধিত হইয়া যাইবে।"

ইবনে যুবাইর (রা.) বলিলেন, তবে অন্ততঃ হযরত আবু বকর অথবা হযরত ওমরের নীতি অনুসরণ করুন।

আমীর মোয়াবিয়া (রা.) বলিলেন, তাঁহাদের নীতি বলিতে আপনি কি বুঝাইতে চান?

ইবনে যুবাইর (রা.) বলিলেন, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁহার কোন আত্মীয়কে খলিফা নির্বাচিত করেন নাই। তৎপর হযরত ওমর ফারুক (রা.) এমন ছয় ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেন যাঁহারা তাঁহার কোন আত্মীয় হইতেন না! আমীর মোয়াবিয়া (রা.) বলিলেন, ইহা ছাড়া আপনারা অন্য কোন প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) বলিলেন, 'কখনই নয়।'

এরপর আমীর মোয়াবিয়া (রা.) কঠোরতর নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি তাঁহাদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া বলপূর্বক মদীনাবাসীদের নিকট হইতে ইয়াযিদের পক্ষে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি ইয়াযিদকে অন্তিম উপদেশ

দিয়া যান, "যে ব্যক্তি শৃগাল-সুলভ বুদ্ধিমত্তা লইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবেন, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর। যদি তিনি আপোসে মানিয়া নেন, তবে ভাল। অন্যথায় কাবু পাওয়ার পরই তাঁহাকে খতম করিয়া ফেলিও।"

আমীর মোয়াবিয়ার ইন্তেকালের পর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) যখন শহীদ হইয়া গেলেন, তখন হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) তেহামা, হেজায ও মদীনার লোকদের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতঃ পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিলেন এবং ইয়াযিদের কর্মচারীদিগকে এই সমস্ত এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ইয়াযিদ মুসলিম ইবনে ওকবাকে বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুসলিম সর্বপ্রথম মদীনা জয় করিয়া লুণ্ঠন করে। তৎপর আবু কুবাইস পর্বতে শিবির স্থাপন করতঃ কাবাব মসজিদে প্রস্তর ও অগ্নি বর্ষণ শুরু করে। বিরাট শত্রুবাহিনী চারিদিক হইতে মক্কা শহর ঘিরিয়া ফেলে। ঠিক সেই সময় ইয়াযিদের ইন্তেকাল হইয়া যায় এবং তৎপুত্র মোয়াবিয়া স্বয়ং রাজত্বের দাবী পরিত্যাগ করেন। ফলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.) স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা হইয়া গেলেন।

আমীর মোয়াবিয়া (রা.) যেদিন ইয়াযিদকে বলপূর্বক মুসলিম দুনিয়ার খলিফা নিযুক্ত করেন, সেই দিন হইতেই ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়াছিল। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবে আবার ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হইল। আমীর মোয়াবিয়ার ইজতেহাদী ভুলের জন্য ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই ঘটনার পর তাহার প্রতিকার হওয়ার এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের এই উজ্জ্বল সম্ভাবনার সূচনা মুহূর্তে হযরত ইবনে যুবাইরের দ্বারা এমন কয়েকটি ভুল সংঘটিত হইল যে, দেখিতে দেখিতে এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা আবার চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ভুলগুলি সমালোচকদের দৃষ্টি সাধারণতঃ নিম্নরূপ ঃ

১. সিরিয়া দেশীয় সেনাপতি হোসাইন ইবনে নোমায়র তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি এক সম্মিলিত বাহিনীসহ সিরিয়ায় গমন করি, সেইখানকার জনসাধারণ আপনার প্রতি খেলাফতের আনুগত্য প্রদর্শন করার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিব, কিন্তু হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) তাঁহাকে বলিলেন, "ইহা তখনই হইতে পারে যখন আমি এক একজন হেজাযবাসীর রক্তের প্রতিশোধস্বরূপ অন্ততঃ দশ জন সিরীয়কে হত্যা করিয়া লইব।" এই কথা শুনিয়া হোসাইন ইবনে নোমায়র নিরাশ হইয়া স্বীয় সৈন্যবাহিনীসহ সিরিয়ায় ফিরিয়া গেলেন।

২. মারওয়ান এবং অন্যান্য উমাইয়া বংশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মদীনায় ইবনে যুবাইরের হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ইবনে যুবাইর (রা.) মদীনায়

পদার্পণ করিয়াই তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন। এইভাবে তাহাদের পক্ষে সিরিয়ায় পৌঁছিয়া বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ মিলিল। শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত লোক সিরিয়ায় চলিয়া গেলেন এবং তথায় মারওয়ানকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া ইবনে যুবাইরের এলাকায় আক্রমণ করিতে শুরু করিলেন। তাহারা দামেশক, মিসর, ফিলিস্তিন, হেমস্ প্রভৃতি স্থান হইতে ইবনে যুবাইরেরর আঞ্চলিক শাসকর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

৩. বনী সাকীফের মোখতার সাকাফী নামক এক ক্ষমতালোভী ব্যক্তি হযরত হোসাইন হত্যার আওয়াজ উত্থাপন করিল। ইবনে যুবাইর (রা.) সহজেই এই দলকে বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বরং মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ কতিপয় আহলে বায়তের প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ অথবা দেশান্তরিত করিয়া দেন। ফলে মোখতার সাকাফীর পক্ষে শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ হইল। তিনি কুফা হইতে ইবনে যুবাইরের নিযুক্ত শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করিয়া কুফা ও সমগ্র ইরাকে ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। শেষ পর্যন্ত এই ফেৎনা বহু রক্তপাত ও দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর বিদূরিত হয়, কিন্তু এই সুযোগেই মারওয়ানের স্থলাভিষিক্ত আবদুল মালেক সিরিয়া প্রদেশ ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। ইবনে যুবাইর (রা.) কর্তৃক সিরিয়া আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ইহারা কুফা আক্রমণ করিয়া সমগ্র ইরাক প্রদেশ দখল করিয়া ফেলেন। এতদিনে আবদুল মালেক ইবনে যুবাইরের সহিত শেষ বোঝাপড়া করার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই উদ্দেশে তিনি একদা এক বিরাট জনসভা আহ্বান করতঃ উত্তেজনাময় এক বক্তৃতা দান করিলেন এবং উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইবনে যুবাইরকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে?

জনতার মধ্য হইতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উঠিয়া বলিলেন, এই জন্য আমি প্রস্তুত আছি।

আবদুল মালেক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোন বীরপুরুষ আছে কি যে ইবনে যুবাইরকে খতম করার দায়িত্ব নিতে পারে?

হাজ্জাজ পুনরায় বলিলেন, আমি এই দায়িত্ব বহন করিতে প্রস্তুত আছি। আবদুল মালেক পুনরায় বলিলেন, এমন কে আছে, যে ইবনে যুবাইরের মস্তক কাটিয়া আনিবে? এইবারও হাজ্জাজ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করুন।"

শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্ব হাজ্জাজের উপরই অর্পণ করা হইল। হিজরী ৭২ সনে তিনি বিরাট এক সৈন্যবাহিনীসহ মক্কা আক্রমণ করিলেন। হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) পবিত্র কাবার প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাজ্জাজ চারিদিক হইতে কাবা অবরোধ করিয়া প্রবল বেগে প্রস্তর ও গোলাগুলি বর্ষণ করিতে শুরু করিলেন। উদ্ধত সিরীয় সৈন্যগণ

কর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রস্তররাশি পবিত্র কাবার দেওয়ালে লাগিয়া দেওয়াল ফাটিয়া পড়িতে লাগিল; ইবনে যুবাইর নিতান্ত প্রশান্ত মনেই এই প্রস্তর ও অগ্নি বৃষ্টি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এইভাবে দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) প্রতি নামাযের সময় শান্ত মনে নামাযে দাঁড়াইয়া যাইতেন, চারিদিকে নিক্ষিপ্ত প্রস্তররাশি বর্ষণ ও অগ্নি প্রজ্বালন তিনি ধূলা-বালির চাইতে অধিক গুরুত্ব দিতেন না, কিন্তু এইভাবে অবরুদ্ধ থাকিয়া শেষ পর্যন্ত রসদ একেবারেই শেষ হইয়া গেল। নিরুপায় সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের অশ্বসমূহ জবেহ করিয়া খাইতে শুরু করিলেন। নগরের অভ্যন্তরে এমন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, প্রায় প্রতি ঘর হইতেই ক্ষুধাতুর জনতার ক্রন্দনের রোল উঠিল। হযরত ইবনে যুবাইরের সৈন্যগণ অনশন কাতর হইয়া ধীরে ধীরে পলায়ন করতঃ হাজ্জাজের সৈন্যবাহিনীতে যাইয়া শরীক হইতে শুরু করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় এক হাজার সৈন্য যাইয়া শত্রু সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। স্বয়ং ইবনে যুবাইরের দুই পুত্র হামযা ও হাবীব পর্যন্ত যাইয়া হাজ্জাজের সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। তৃতীয় পুত্র বীরত্বের সহিত লড়াই করিয়া শাহাদাত বরণ করিলেন।

ইবনে যুবাইর (রা.) তখন স্বীয় জননী হযরত আসমা বিনতে আবু বকরের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিলেন। এই সময় হযরত আসমার বয়স হইয়াছিল একশত বৎসরেরও অধিক। তাঁহার শরীরের কুঞ্চিত চামড়ায় যে পরিমাণ ভাঁজ পড়িয়াছিল, অন্তরেও বোধহয় সমপরিমাণেই আঘাত সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছিল। ইবনে যুবাইর (রা.) মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আম্মা, আমার সঙ্গী-সাথী এমনকি নিজ সন্তানগণও দল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন পর্যন্ত মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আমার সঙ্গে টিকিয়া আছেন। অন্যদিকে শত্রুরা আমার কোন দাবীই মানিতেছে না। এই অবস্থায় আপনার পরামর্শ কি?"

হযরত আসমা (রা.) বলিলেন, বৎস, তুমি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া থাক তবে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তোমার অন্যান্য সঙ্গী-সাথীগণ যেভাবে প্রাণ দিয়াছেন সেইভাবে প্রাণ দিয়া দাও। আর যদি তুমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকিয়া থাক, তবে তোমার ভাবা উচিত ছিল, নিজের এবং অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের জীবনপাত করার জন্য তুমি দায়ী হইতেছ।

ইবনে যুবাইর (রা.) বলিলেন, এখন আমার সকল সঙ্গীই আমাকে শেষ জবাব দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত আসমা (রা.) বলিলেন, সঙ্গী-সাথীদের অসহযোগিতা ধর্মভীরু ভদ্র মানুষের নিকট গুরুত্ব রাখে না। ভাবিয়া দেখ, দুনিয়ায় তুমি কতদিন থাকিতে পারিবে? সত্যের জন্য জীবন দিয়া দেওয়া সত্য উপেক্ষা করিয়া জীবিত থাকার চাইতে বহু গুণে শ্রেয়।

ইবনে যুবাইর (রা.) জবাব দিলেন, আমার ভয় হয়, বনী উমাইয়ার নিষ্ঠুর লোকগুলি হত্যা করার পর আমার মৃতদেহ শূলে বিদ্ধ অথবা অন্যান্য উপায়ে লাঞ্ছিত করিতে পারে।

হযরত আসমা (রা.) বলিলেন, "বৎস, ছাগল জবেহ করার পর তাহার চামড়া উঠাইবার সময় আর তাহার কোন প্রকার কষ্ট হয় না। যুদ্ধের ময়দানে গমন কর এবং খোদার সাহায্য চাহিয়া স্বীয় কর্তব্য করিতে থাক।"

হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) আনন্দাতিশয্যে মাতার মস্তক চুম্বন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "মা! আল্লাহর পথে কখনও দুর্বল প্রতিপন্ন হইব না! আমার উদ্দেশ্য কেবল আপনাকে এতটুকু নিশ্চয়তা দেওয়া, আপনার পুত্র কোন অসৎ পথে জীবন দান করে নাই।"

হযরত আসমা (রা.) বলিতে লাগিলেন, বৎস, সর্বাবস্থায়ই আমি ধৈর্য ও খোদার শুকরিয়া আদায় করিতে থাকিব। যদি জয়ী হইয়া ফিরিতে পার, তবে আমি তোমার বিজয় দেখিয়া খুশী হইব। আর যদি আমার নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ কর, তথাপি আমি ধৈর্য ধারণ করিব। যাও, আত্মোৎসর্গ কর। ফল খোদার হাতে।

ইবনে যুবাইর (রা.) বলিলেন, মা, আমার জন্য দোয়া করুন।

হযরত আসমা (রা.) হাত উঠাইয়া দোয়া করিলেন, "হে খোদা, আমি আমার পুত্রকে তোমার হাতে সমর্পণ করিতেছি। তাহাকে তুমি দৃঢ়তা এবং আমাকে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দান কর।"

দোয়া করার পর বৃদ্ধা মাতা তাঁহার কম্পিত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! একবার আমার কোলে আস, শেষবারের মত আমি তোমাকে বুকে ধারণ করি।

ইবনে যুবাইর (রা.) বলিতে লাগিলেন, আজকের সাক্ষাতই আমাদের শেষ সাক্ষাত। অদ্যই আমার জীবন সমাপ্ত হইতেছে। অতঃপর তিনি অবনত মস্তকে মায়ের বুকে আশ্রয় নিলেন। স্নেহময়ী মাতা এই সাহসী বীর পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস, নিজের কর্তব্য পালন কর। এই সময় ইবনে যুবাইর (রা.) বর্ম পরিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধা মাতা সর্বশরীরে লোহার পোশাক দেখিতে পাইয়া একটু বিমর্ষভাবে বলিলেন, বৎস, আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গকারীদের এইরূপ লোহার পোশাক লওয়া উচিত নহে।

এই কথা শুনিয়া হযরত ইবনে যুবাইর (রা.) লোহ-বর্ম শরীর হইতে খুলিয়া ফেলিলেন এবং স্বাভাবিক বেশে বীরত্ব গাঁথা গাহিতে গাহিতে সিরীয় সৈন্যদের দিকে চলিয়া গেলেন। শত্রু বাহিনীকে তিনি এমন ভীষণ বিক্রমে আক্রমণ করিলেন যে, ক্ষণিকের জন্য ময়দান কম্পিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সিরীয় সৈন্য ছিল গণনাতীত, ইহার

সম্মুখে তাঁহার মুষ্টিমেয় বাহিনী বেশীক্ষণ টিকিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া পিছু হটিয়া আসিতে হইল। এই সময় এক ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইবনে যুবাইর (রা.) পিছু হটিয়া রক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করুন, কিন্তু তিনি আহ্বানকারীর প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ এই বলিয়া সামনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ইবনে যুবাইর এত ভীরু কাপুরুষ নয় যে, বীর সঙ্গীদের মৃত্যু দেখিয়া ভয় পাইবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গী লইয়া তিনি সিংহবিক্রমে ময়দানে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং সিরীয় সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, শত্রুব্যূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার শরীর ছিল উন্মুক্ত ও অরক্ষিত। এই জন্য উল্কার বেগে তিনি যখন শত্রু সৈন্যকে ধাওয়া করিতেছিলেন, তখন শত্রুপক্ষের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত দেহ হইতে রক্ত ছিটিয়া পড়িতেছিল। এই সময় হাজ্জাজ গোটা সৈন্যবাহিনী একত্রে পরিচালিত করিলেন। তাহার বিশিষ্ট বাহাদুরদিগকে একত্রিত করতঃ তীব্র আক্রমণ চালাইয়া কাবা মসজিদের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছিয়া গেলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত ময়দানের প্রাধান্য হযরত ইবনে যুবাইরের বাহিনীরই আয়ত্তে ছিল। এই মুষ্টিমেয় বাহাদুর বাহিনী নারায়ে তকবীর উচ্চারণ করতঃ তরবারির বিজলী খেলিতে খেলিতে যেদিকে অগ্রসর হইতেন, সিরীয় সৈন্যদের কাতারের পর কাতার বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।

এই অবস্থা দেখিয়া হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় পতাকাবাহীকে অগ্রসর করাইয়া সঙ্গীদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। হযরত ইবনে যুবাইরও বাজপক্ষীর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া শত্রু বাহিনীর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ঠিক এই সময় কাবার মিনার হইতে আজানের আওয়াজ আসিল। আল্লাহু আকবর ধ্বনি কর্ণে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর এই বান্দা তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। শত্রু বাহিনীর সম্মুখে তাঁহার সামান্য কয়েকজন সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নামায হইতে ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মুষ্টিমেয় বাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পতাকা ভূলুণ্ঠিত এবং পতাকাবাহী নিহত হইয়া গিয়াছেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়াও তাঁহার অন্তর কাঁপিল না। একাকীই তিনি অগণিত শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করতঃ বিদ্যুৎগতিতে তরবারি চালনা শুরু করিলেন। এমন সময় সম্মুখ দিক হইতে একটি তীর আসিয়া তাঁহার মস্তক ভেদ করিয়া গেল। শিরস্ত্রাণ, মুখমণ্ডল ও দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই সময় তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন— "আমরা এমন নই যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার পর আমাদের পাদদেশে রক্ত ঝরিবে। আমরা বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দণ্ডায়মান হই, আর আমাদের বাহুতে রক্তের ফোয়ারা ছুটে।"

ইবনে যুবাইর (রা.) এই বীরত্বগাথা গাহিতে গাহিতেই তরবারি চালাইয়া যাইতেছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তরবারি চালাইয়া এই অবস্থায়ই তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পবিত্র রূহ দুনিয়ার বাঁধন ছাড়িয়া চিরদিনের মত বিদায় হইয়া গেল।

হাজ্জাজ প্রতিশ্রুতিমত তাঁহার মস্তক কর্তন করিয়া আবদুল মালেকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং দেহ শহরের বাহিরে উচ্চস্থানে ঝুলাইয়া দিলেন।

এই হৃদয়বিদারক খবর হযরত আসমার কানে গেল! তিনি হাজ্জাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যেন ইবনে যুবাইরের পবিত্র দেহ শূলি হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। হাজ্জাজ উত্তর দিলেন, কিছুতেই নয়; আমি এই দৃশ্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে চাই। হযরত আসমা (রা.) পুনরায় পবিত্র লাশের দাফন-কাফনের অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু হাজ্জাজ এই আবেদনেও কর্ণপাত করিলেন না।

কোরায়শগণ এই পথে চলিতেন এবং তাঁহাদের এই বীর সন্তানের শূলবিদ্ধ লাশ দেখিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইতেন। একদিন ঘটনাক্রমে হযরত আসমা (রা.) এই পথে যাইতে যাইতে পুত্রের লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় পাইলেন। স্নেহময়ী মাতা দীর্ঘক্ষণ লাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখনও কি এই বীর যোদ্ধার অশ্ব হইতে অবতরণ করার সময় আসে নাই?"

আল্লামা শিবলী নোমানী হযরত আসমার এই বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ লাশ শূলির উপর দীর্ঘ কয়েকদিন ঝুলিয়া রহিল। তাঁহার মাতা এতে কোন দুঃখ করিলেন না। ঘটনাক্রমে একদিন ঐদিক দিয়া যাইতেছিলেন, লাশ ঝুলন্ত দেখিয়া বলিলেন, "দীর্ঘক্ষণ যাবতই জাতির এই খতিব মিম্বরে আরোহণ করিয়াছেন, নামেন নাই। এই বীর এখনও যোদ্ধাবেশ ত্যাগ করেন নাই।"

জীবন সায়াহ্নে
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ

দুনিয়ার যে সমস্ত জাতিকে আল্লাহ পাক রাষ্ট্র পরিচালনার সৌভাগ্য দান করিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাঁহাদের ইতিহাসে ইসলামের শেষ আদর্শ খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের জীবন এক স্মরণীয় আদর্শ। জীবনের সাথে সাথে তাঁহার মৃত্যুও বিশ্বের সত্যাশ্রয়ী মানবগোষ্ঠীর জীবনে এক উজ্জ্বল আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে। আমরা নিম্নে এই মহাপুরুষের জীবন-সায়াহ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেক যখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি এ শর্তে

গভর্নর পদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, যেন আমাকে পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের ন্যায় জনসাধারণের উপর জুলুম করিতে বাধ্য করা না হয়।" জবাবে খলিফা বলিয়াছিলেন, আপনি যাহা ন্যায় ও সত্য মনে করেন তাহাই করিবেন। ইহাতে রাজকোষে এক পয়সাও যদি না আসে, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই।

খলিফার জবাব শুনিয়া হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) শাসনকর্তার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতঃ মদীনায় আগমন করিলেন। মদীনায় পদার্পণ করিয়াই তিনি ওলামায়ে কেরামের সবাইকে একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিলেন, "যদি আপনারা কোথাও অন্যায় বা জুলুম দেখিতে পান, তবে আমাকে অবহিত করিবেন।" বলাবাহুল্য, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) যে পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কেহ তাঁহার চরিত্রে সততা ও ন্যায়বিচার ছাড়া অন্য কোন কিছু দেখে নাই।

খলিফা সোলায়মানের যখন অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসে তখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) আশংকা করিতেছিলেন, সোলায়মান হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁহার উপরই খেলাফতের উত্তরাধিকার সমর্পণ করিয়া যাইবেন। এই জন্য তিনি বেশ চিন্তিতও হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন তিনি চিন্তিত মনে খলিফার উজিরে আজম রেজাবিস হায়াতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার ভয় হয়, খলিফা শেষ পর্যন্ত আমার উপরই খেলাফতের দায়িত্বভার চাপাইয়া না যান। এই ব্যাপারে আপনি যদি কিছু জানিয়া থাকেন তবে বলুন, পূর্ব হইতেই আমি উহার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করিয়া নিতে চাই। বিশেষতঃ খলিফার জীবদ্দশাতেই যেন তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি নিযুক্ত করার সুযোগ পান সেই ব্যবস্থা করাই ভাল।"

উজিরে আজম তখন ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-কে অন্য কথায় প্রবোধ দিয়া বিদায় করিলেন সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্দেহই বাস্তব রূপ ধারণ করিল। খলিফা সোলায়মানের অসিয়তনামা খোলা হইলে দেখা গেল, তিনি শেষ পর্যন্ত হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজকেই খলিফা পদের জন্য মনোনীত করিয়া গিয়াছেন।

খলিফা তখন পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই মনোনয়ন পরিবর্তন করারও আর উপায় ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) জনসাধারণকে মসজিদে সমবেত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকসকল, আমার ইচ্ছা এবং তোমাদের সম্মতি ব্যতিরেকেই আমাকে তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমি ক্ষমতা চাই না, আমি তোমাদিগকে স্বাধীনতা দিতেছি, যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের খলিফা নির্বাচিত করিয়া লও!" জনতার মধ্য হইতে সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠিল, "আমীরুল মোমেনীন, আমরা আপনাকেই আমাদের খলিফা নির্বাচিত করিতেছি।" হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) তখন বলিতে লাগিলেন, "সেই পর্যন্ত তোমরা আমাকে

খলিফা হিসেবে মান্য করিও যে পর্যন্ত আমি আল্লাহর নির্দেশের সীমা অতিক্রম না করি।"

খলিফা নির্বাচন সমাপ্ত হইল। উমাইয়া বংশের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) উত্তরাধিকারী হিসেবে জনগণের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন না; বরং জনগণই তাঁহাকে শাসনক্ষমতা দান করিল।

খলিফা নির্বাচিত হইয়া যাওয়ার পর সরকারী কর্মচারীগণ বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন। মসজিদ হইতে মহলে লইয়া যাওয়ার জন্য বিশেষ শাহী সওয়ার হাজির করা হইল। জাঁকজমকপূর্ণ বাহন দেখিয়া খলিফা বলিতে লাগিলেন, "এসবের প্রয়োজন নাই। আমার জন্য আমার পুরাতন খচ্চরই যথেষ্ট।" খচ্চরে আরোহণ করিয়াই নূতন খলিফা দারুল খোলাফার দিকে রওয়ানা হইলেন। পুরাতন রীতি অনুযায়ী কোতওয়াল বর্শা কাঁধে তাঁহার পশ্চাদগমন করিতে লাগিলেন। খলিফা কোতওয়ালকেও নিবৃত্ত করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন— আমিও একজন সাধারণ মুসলিম নাগরিক মাত্র; আমার জন্য এই আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই।

পূর্বের রীতি ছিল, আলেমগণ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া খলিফার জন্য বিশেষ দোআ করিতেন। নূতন খলিফা ঘোষণা করিলেন, আমার জন্য বিশেষ দোআর প্রয়োজন নাই। সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করিবেন। যদি খাঁটি মুসলমান হই, তবে স্বাভাবিকভাবেই এই দো'আ আমার উপরও আসিয়া পৌঁছিবে।

নূতন খলিফা জাঁকজমকপূর্ণ শাহী প্রাসাদে পৌঁছিলেন। তথায় মরুহুম খলিফার পরিবার-পরিজন তাঁহার জন্য স্থান ছাড়িয়া দেওয়ার অপেক্ষা করিতেছিলেন। খলিফা আসিয়া নির্দেশ দিলেন, আমার জন্য প্রাসাদের বাহিরে একখানি তাঁবুর ব্যবস্থা কর; আমি প্রাসাদে বাস করিতে চাহি না। নির্দেশ প্রতিপালিত হইলে পর খলিফা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার চেহারায় তখন দুশ্চিন্তার গভীর ছাপ লাগিয়াছিল। পরিচারিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ আপনাকে এমন উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাইতেছে কেন? খলিফা জবাব দিলেন, "আজ হইতে দেশের সকল নাগরিকের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে অর্পণ করা হইয়াছে। এই বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার আজ হইতে আমাকেই রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেকটি নিরন্ন ও বিধবার জন্য আজ হইতে আমাকেই জবাবদিহি করিতে হইবে। সুতরাং আমার চাইতে বেশী করুণার পাত্র আর কে, বলিতে পার?"

আমীর মোয়াবিয়ার শাসনকাল হইতে শুরু করিয়া খলিফা সোলায়মানের আমল পর্যন্ত মুসলমানগণ যে সমস্ত লাভজনক জায়গীর, উর্বর ভূমি ও চারণ ক্ষেত্র সম্বলিত এলাকা জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই উমাইয়া বংশের লোকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, সেই সময় হইতেই মুসলমানদের মধ্যে জমিদারী ও

জায়গীরদারী প্রথার সূচনা হয়। এইভাবে বলিতে গেলে তখনকার মুসলিম জনসাধারণের প্রাপ্য দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ বনী উমাইয়ার কবলে পুঞ্জীভূত হইয়া গিয়াছিল।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া খান্দানের লোকদিগকে ডাকিয়া নির্দেশ দিলেন, "তোমাদের অন্যায়ভাবে দখলকৃত সকল সম্পদ আসল মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।" নির্দেশ শুনিয়া খান্দানের লোকেরা আপত্তি করিতে লাগিল। তাহারা খলিফাকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিল, "আমাদের স্কন্ধে মস্তক থাকিতে এইরূপ হইতে পারে না।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া খলিফা মুসলিম জনসাধারণকে মসজিদে সমবেত করিলেন। স্বয়ং শাহী দলিল-দস্তাবেজসহ মসজিদে উপস্থিত হইলেন। খেলাফতের মীর-মুন্সীকেও হাযির করা হইল। নূতন খলিফা পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলে সম্পাদিত দানপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ একটি একটি করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন এবং ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "আজ হইতে আমি এই সমস্ত জায়গীর-জমিদারী আসল মালিক অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারীদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি!" ঘোষণা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট দলিলটি ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইভাবে সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কাটিয়া গেল। সর্বশেষ তিনি স্বীয় সকল সম্পত্তি বায়তুল মালে দাখিল করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

নবনির্বাচিত খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-এর স্ত্রী ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপ খলিফা আবদুল মালেকের কন্যা ফাতেমা। ঘরে আসিয়াই স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, "তোমার পিতা তোমাকে যৌতুকস্বরূপ যে সমস্ত মূল্যবান অলংকার ও মণি-মাণিক্য দান করিয়াছিলেন, সমস্তই বায়তুল মালে দাখিল করিয়া দাও। অন্যথায় আমার সহিত আজ হইতে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাও।" পতিপ্রাণা স্ত্রী নির্দেশ শ্রবণমাত্র সমস্ত অলংকারাদি বাইতুল মালে পাঠাইয়া দিলেন।

উমাইয়া খান্দানের স্থাবর সম্পত্তি ও জমিদারী-জায়গীর প্রভৃতি পূর্বেই বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইবার খলিফা ইয়াযিদ ইবনে মোয়াবিয়ার যুগ হইতে শুরু করিয়া সোলায়মানের যুগ পর্যন্ত যে পুঞ্জীভূত সম্পদ অন্যায়ভাবে আদায় করিয়া রাজকোষ বা অন্যান্য তহবিলে জমা করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই সমস্ত মূল মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ করার নির্দেশ জারি করিলেন। এই নির্দেশ মোতাবেক এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ হস্তান্তরিত হইল যে, খেলাফতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ ইরাকের রাজকোষ পর্যন্ত শূন্য হইয়া গেল। এমনকি ইরাকের দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য রাজধানী দামেশক হইতে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিল।

এমতাবস্থায় কোন কোন শুভাকাঙ্ক্ষী খলিফাকে পরামর্শ দান করিলেন, অন্ততঃ সন্তান-সন্ততির জন্য হইলেও কিছু সম্পত্তি অথবা সঞ্চয় রাখিয়া যান। প্রত্যুত্তরে খলিফা বলিয়াছিলেন, "আমি উহাদিগকে আল্লাহর হাতেই সমর্পণ করিয়া যাইতে চাই।"

উমাইয়া খান্দানের তরফ হইতে লিখিত এক প্রতিবাদ লিপিতে খলিফাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ ব্যক্তিগত ব্যাপারে অথবা স্বীয় শাসন আমলে আপনি যেরূপ ইচ্ছা আবশ্যক তদ্রূপই করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ববর্তী খলিফাদের কাজকর্মে আপনার পক্ষে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। এই প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য খলিফা খান্দানের লোকদিগকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বিতর্কমূলক ব্যাপারে যদি আমীর মোয়াবিয়া ও খলিফা আবদুল মালেকের আমলের পরস্পর বিরোধী দুইটি দলিল পাওয়া যায়, তবে কোন্ দলিলকে প্রাধান্য দিতে হইবে? উত্তরে সকলে বলিয়া উঠিলেন, এমতাবস্থায় আমীর মোয়াবিয়ার দলিলকে প্রাধান্য দিতে হইবে। তখন খলিফা বলিলেন, "আমি যে সমস্ত কাজ করিতেছি তাহার দলিল আরও প্রাচীন। আমি আল্লাহর প্রাচীন গ্রন্থ কোরআনের দলিল অনুযায়ীই এইরূপ করিতেছি।"

অন্য এক সময়ে এই প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত হইলে খলিফা বলিয়াছিলেন; পিতার মৃত্যুর পর যদি কোন পরিবারের বড় ভাই সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়া বসে, তখন আপনারা উহার কি প্রতিকার করিবেন? সকলে বলিল— আমরা ছোট ভাইদের প্রাপ্য দিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিব। খলিফা বলিলেন, "খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমলের পর উমাইয়া বংশীয় সকল ব্যক্তিগণ সমগ্র দরিদ্র মুসলিম জাতির সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করিয়া লইয়াছিলেন। এখন আমি সেই সমস্ত বঞ্চিতদের মধ্যে তাহাদের প্রাপ্য বণ্টন করিতেছি মাত্র।"

একবার উমাইয়া বংশের লোকেরা সমবেত হইয়া খলিফার পুত্রদের মারফত প্রস্তাব করিলেন, পূর্ববর্তী খলিফাগণ যেরূপ সরকারী দান ও উপহার-উপঢৌকন মারফত পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করিতেন, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজও যেন অনুরূপভাবে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করেন। উত্তরে খলিফা বলিলেন, "তোমরা আল্লাহর চাইতে আমার অধিক আপন নও। এখন যদি আমি তোমাদের সামান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য আল্লাহর আমানত নষ্ট করি, তবে তোমরা কি কেয়ামতের দিন আল্লাহর রোষানল হইতে আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে? জওয়াব শুনিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেই নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন।"

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর খলিফার পরিবার-পরিজনের সকল প্রকার অতিরিক্ত বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অভাব জর্জরিত পরিজন কিছু বৃত্তির তাকিদ করিতে আসিলে খলিফা বলিলেন, "দেখ, আমার ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি বা পৃথক আয়ের পথ নাই। তাহাছাড়া বায়তুল মালের সম্পদে তোমাদের যে অধিকার, দেশের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একজন সাধারণ মুসলমানের অধিকারের চাইতে তাহা মোটেই বেশী নয়। সুতরাং বায়তুল মাল হইতে তোমরা জনসাধারণের চাইতে একবিন্দুও অধিক আশা করিও

না। আল্লাহর শপথ, তোমরা দুনিয়ার সকল মানুষ মিলিয়াও যদি আমার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কর, তবুও আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে পারিব না।"

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) রাষ্ট্রের সকল দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া জনসাধারণের উপর নির্যাতনের সকল উৎস বন্ধ করিয়া দিলেন। পুলিশ বিভাগ হইতে বলা হইল, সন্দেহজনক ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করা না হইলে শান্তি রক্ষা সম্ভবপর হইবে না। জওয়াবে খলিফা বলিয়াছিলেন, "কেবলমাত্র শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করিয়া যাও। উহাতে যদি অপরাধমূলক কার্যকলাপ দূর না হয়, তবে তাহা চলিতে দাও।"

খোরাসানের শাসনকর্তার পত্র আসিল– "এই এলাকার জনসাধারণ নেহায়েত অবাধ্য। তরবারি বা বেত্রদণ্ড ব্যতীত উহাদিগকে বাধ্য রাখা সম্ভবপর হইবে না।" খলিফা জওয়াব দিলেন, "আপনার ধারণা ভুল। সদাচরণ ও ন্যায়বিচার অবশ্যই তাহাদিগকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম। আপনি সেই পথেই কাজ করিয়া যাইতে থাকুন।"

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) নির্দেশ জারি করিয়াছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কাহারও নিকট হইতে আর এক পয়সা জিযিয়া বাবদ আদায় করা চলিবে না। এই যুগান্তকারী ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য অ-মুসলমান প্রজা ইসলামে দীক্ষিত হইয়া গেল।

হাইয়ান ইবনে শোরাইহ নামক জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী রিপোর্ট দিলেন, খলিফার নির্দেশের পর এমন বিপুল পরিমাণ লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে যে, বর্তমানে জিযিয়ার আমদানী প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন আমাকে ঋণ গ্রহণ করতঃ মুসলমান প্রজাদের বৃত্তি পরিশোধ করিতে হইতেছে।" খলিফা জবাব দিলেন, যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করিতে হউক না কেন, মুসলমানদের নিকট হইতে জিযিয়া আদায় অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, আল্লাহর রসূল (সা.) মানবতার পথপ্রদর্শকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কর আদায়কারীরূপে নয়। আমি অন্তরের সহিত কামনা করি, রাষ্ট্রের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করুক, জিযিয়া আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাউক এবং আমার-তোমার মর্যাদা কৃষক-মজদুরদের স্তরে নামিয়া আসুক; আমরা সকলে মেহনত করিয়া জীবিকা অর্জন করিব।"

পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাগণ নও-মুসলিমদের নিকট হইতেও অ-মুসলমানদের মতো 'জিযিয়া' বা দেশরক্ষা কর গ্রহণ করিতেন। – (অনুবাদক)

পারস্যের গভর্নর আদী ইবনে আরতাতের কর্মচারীগণ স্থানীয় কৃষকদের ফলবাগান নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া সমস্ত ফল ভোগ করিত। এই কথা খলিফার কর্ণগোচর হইলে তিনি তিন ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতঃ গভর্নর আদীকে লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ

এই সমস্ত দুর্নীতি যদি তোমার জ্ঞাতসারে অথবা নির্দেশক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করিব না। আপাততঃ আমি তিন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি প্রেরণ করিতেছি, উহারা তদন্ত করিয়া সমস্ত বাগানের ফল আসল মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিবেন। তুমি উহাদের কাজে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

একবার ইয়ামানের বায়তুল মাল হইতে একটি স্বর্ণ-মুদ্রা হারাইয়া যাওয়ার খবর আসিল। ইহাতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তৎমুহূর্তেই তথাকার বায়তুল মালের তহবিল রক্ষককে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি তোমাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিতেছি না, তবুও তোমার ঔদাসীন্যকে এই জন্য দায়ী করিতেছি। সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ হইতে আমি উহার বিচারপ্রার্থী। তুমি শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক শপথ করিয়া বল, এই স্বর্ণমুদ্রা অপচয় হওয়ার পশ্চাতে তোমার কোন হাত নাই।"

সরকারী কর্মচারীগণ দফতরের কাজ করার সময় কাগজ, কলম, লেফাফা, বাতি প্রভৃতি সরকারী সাজসরঞ্জাম বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করিতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) এই সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি দিলেন এবং আবু বকর ইবনে হাযম প্রভৃতি কতিপয় সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশে লিখিলেন, "সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা অন্ধকার রাতে আলো ছাড়া মসজিদে নববীতে যাতায়াত করিতে। আল্লাহর শপথ, আজ তোমাদের অবস্থা তদপেক্ষা অনেক ভাল। কলম আরও সূক্ষ্ম করিয়া লও। লাইন আরও ঘন ঘন বসাও, দফতরের কাজে ব্যবহৃত সরকারী সাজসরঞ্জাম আরও সাবধানতার সহিত ব্যবহার কর। মুসলমানদের ভাণ্ডার হইতে এমন এক পয়সাও ব্যয় করিতে চাহিও না যদ্দারা সামান্যতম প্রত্যক্ষ উপকারও সাধিত হয় না।"

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) শাহী খান্দানের সর্বপ্রকার বিলাস-বৃত্তি, বিলাস-সামগ্রী ও অপব্যয় বন্ধ এবং শাহী খান্দানের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত সমস্ত সরকারী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ বায়তুল মালে জমা করিয়া দিলেন। অপরপক্ষে যে সমস্ত লোক উপার্জনক্ষম নহে তাহাদের সকল নাম সরকারী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। খলিফার তরফ হইতে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল, আমার কোন লোক যেন অনাহারে না থাকে। কোন কোন এলাকায় গভর্নরদের তরফ হইতে

অভিযোগ আসিল, বিপন্ন লোকদিগকে ব্যাপকভাবে বৃত্তি দান করিলে সরকারী ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) জওয়াব দিলেন, যে পর্যন্ত ভাণ্ডারে আল্লাহর সম্পদ রক্ষিত আছে সেই পর্যন্ত আল্লাহর বিপন্ন বান্দাদের মধ্যে বিতরণ কর। যখন একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে তখন উহা আবর্জনা দিয়া পূর্ণ করিয়া লও।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) স্বীয় শাসনমালে রাষ্ট্রের মুসলিম অ-মুসলিম নাগরিকদের অধিকার সমভাবে রক্ষা করিতেন। হীরা এলাকায় জনৈক মুসলমান একজন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে। খলিফা হত্যাকারীকে গ্রেফতার করিয়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাওয়ালা করিয়া দিলেন, উহারা ঘাতককে হত্যা করিয়া ফেলিল।

রবিয়া ইবনে শোবা নামক জনৈক সরকারী কর্মচারী সরকারী কার্য উপলক্ষে জনৈক অমুসলিম নাগরিকের অশ্ব বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করেন। খলিফার নিকট এই অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তিনি রবিয়াকে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের দণ্ড দেন।

খলিফা ওয়ালিদ স্বীয় পুত্র আব্বাসকে জনৈক যিম্মীর ভূমি জায়গীরস্বরূপ দিয়াছিলেন। উক্ত যিম্মী হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ-এর নিকট আসিয়া বিচার প্রার্থনা করে। খলিফা ওয়ালিদ-পুত্র আব্বাসকে ডাকিয়া এই ব্যাপারে তাঁহার বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দিলেন। আব্বাস জওয়াবে ওয়ালিদ-প্রদত্ত জায়গীরের দলিল-দস্তাবেজ পেশ করিলেন। দলিল দেখার পর খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) নির্দেশ দিলেন, যিম্মীর ভূমি ফিরাইয়া দাও। ওয়ালিদের দলিল আল্লাহর কিতাবের নির্দেশের চাইতে অধিক কার্যকর হইতে পারে না।

জনৈক খৃস্টান খলিফা আবদুল মালেকের পুত্র হেশামের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করে। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) বাদী-বিবাদীকে এক কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিচার শুরু করেন। হেশাম ইহাতে নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে করিলেন। ক্ষোভে, দুঃখে তাঁহার চেহারা লাল হইয়া গেল। উহা দেখিয়া হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) বলিতে লাগিলেন, সত্য ধর্ম ইসলামের আদালতে ছোট বড়, মুসলিম-খৃস্টানের কোন ভেদাভেদ নাই।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) সর্বমোট মাত্র দুই বৎসর ছয় মাস খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই মানুষ মনে করিতেছিল ঃ আসমান-জমিনের মধ্যে যেন ইনসাফের খোদায়ী দণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানুষের খোদা যেন আকাশ হইতে হস্ত প্রসারিত করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষ ও তাহার মানবতাকে প্রেম, স্বাধীনতা আর সমৃদ্ধির জয় মুকুট পরাইতে আগাইয়া আসিয়াছেন। সুখী মানুষ খয়রাত হাতে লইয়া পথে বাহির হইত, কিন্তু কোথাও গ্রহণকারী পাওয়া যাইত না। মানুষ বায়তুল মালের কর্মকর্তাদের নিকট দান-খয়রাত প্রেরণ করিত, কিন্তু কেহ তাহা গ্রহণ করিতে চাহিত না। ফলে কোন অভাবগ্রস্ত লোক তাঁহাদের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইত।

পারস্যের গভর্নর আদী ইবনে আরতাত খলিফাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, এখানে সুখ-সমৃদ্ধি এত বর্ধিত হইয়াছে যে, সাধারণ মানুষ এখন দাম্ভিক ও বিলাসী হইতে শুরু করিয়াছে। খলিফা জওয়াব দিলেন, জনসাধারণকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে শিক্ষা দাও।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই একদিকে যেমন দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিক সুখ-সমৃদ্ধির মনমাতানো গুঞ্জনে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক অন্যদিকে যে সাধক পুরুষের ত্যাগ-তিতিক্ষায় এই সমৃদ্ধির প্লাবন আসিয়াছিল, তিনি দিন দিন কৃশ রুগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার দিবসের বিশ্রাম ও রাত্রের নিদ্রা শেষ হইয়া গিয়াছিল। সর্বপ্রথম যখন তাঁহাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় তখন তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের সাজ-সরঞ্জাম এত ছিল যে, ত্রিশটি উট বোঝাই করিয়া তাহা মদীনায় প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার শরীর এমন সবল ছিল যে, কোমরবন্দ মাংসপেশীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত।

তাঁহার ভোগ-বিলাসের বহরও ছিল কাহিনীর মত। যে কোন মূল্যবান কাপড় তিনি দুইবার পরিধান করিতেন না। তখনকার দিনে চারিশত টাকা মূল্যের জামাও তাঁহার পছন্দ হইত না। তিনি এত দুর্মূল্য সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিতেন যে, অনেক সময় তাহা খলিফার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যও পাওয়া যাইত না। খলিফা ওয়ালিদের উজিরে আজম রেজা বিন হায়াত বর্ণনা করেন, আমাদের দেশে সবচাইতে পরিপাটি ও সুবেশী পুরুষ ছিলেন ওমর ইবনে আবদুল আজীজ। তিনি যেদিকে গমন করিতেন চারিদিক সুগন্ধে মোহিত হইয়া উঠিত।

কিন্তু যে দিন তিনি ইসলামের মহান খলিফা নির্বাচিত হইলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন শুরু হয়। খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিলাসদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বায়তুল মালে দাখিল করিয়া দেন। এর পরের দিন বাসস্থান হইতে শুরু করিয়া পূর্বেকার কোন ব্যবহার্য দ্রব্যই আর তাঁহার নিকট ছিল না। পরিধানের জন্য মাত্র একজোড়া সাধারণ কাপড় সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। যখন উহা অপরিষ্কার হইত, নিজ হাতে ধুইয়া আবার পরিধান করিতেন।

খলিফা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁহার এক শ্যালক বিবি ফাতেমাকে বলিয়াছিলেন, আমীরুল মোমেনীনের জামা অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, লোকজন তাঁহাকে দেখিতে আসে, উহা বদলাইয়া দেওয়া দরকার।

ফাতেমা এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভ্রাতা যখন পুনরায় এই কথা উত্থাপন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ, আমীরুল মোমেনীনের অন্য কোন কাপড় নাই, দ্বিতীয় জামা আমি কোথা হইতে আনিয়া দিব?

ঐ জামাটিও আবার আস্ত ছিল না। স্থানে স্থানে কয়েকটি তালি লাগানো ছিল।

একবার খলিফার এক কন্যার পরিধানের কাপড় ছিল না। খলিফার দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, এখন কাপড় কেনার মত সংস্থান আমার নাই। বিছানার কাপড় কাটিয়া উহার জন্য জামা প্রস্তুত করিয়া দাও। খলিফার ভগ্নী শুনিতে পাইয়া এক টুকরা কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন, খলিফা যেন এই কথা জানিতে না পারেন।

একদা খলিফার এক পুত্র পিতার নিকট কাপড় চাহিতে আসিলেন। খলিফা তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, আমার ব্যবস্থা নাই। খাইয়ার ইবনে রেবাহের নিকট আমার কাপড় রহিয়াছে, উহা আনিয়া ব্যবহার কর। খলিফা পুত্র আনন্দিত হইয়া খাইয়ারের নিকট গমন করিলেন, তিনি একখানা পুরাতন খদ্দরের জামা বাহির করিয়া দিলেন। খলিফা-পুত্র নিরাশ হইয়া পুনরায় পিতার নিকট আগমন করিলেন। পিতা বলিলেন, বৎস, আমার নিকট ইহার চাইতে ভাল কাপড় নাই। তুমি যদি একান্তই সহ্য করিতে না পার তবে নির্ধারিত বৃত্তি হইতে কিছু অর্থ আগাম নিয়া যাও। পরে বৃত্তি গ্রহণের সময় অবশ্যই উহা ফেরত দিতে হইবে।

একবার এক পরিচারিকা খলিফার বেগমের নিকট অভিযোগ করিল, প্রত্যহ কেবল ডাল আর শুকনা রুটি আমি খাইতে পারিব না। বেগম জওয়াব দিলেন, আমি কি করিব! খলিফা এই খাদ্যই তো গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাও আবার কোন দিন পেট ভরিয়া খাইতে পারেন না।

খলিফার একদিন আঙ্গুর খাইতে ইচ্ছা করিল। বেগমকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে কি একটি মুদ্রা হইবে, আঙ্গুর খাইতে বড্ড ইচ্ছা করিতেছিল।" জওয়াবে বেগম বলিলেন, "এই বিশাল মুসলিম দুনিয়ার খলিফা হইয়া আপনার কি একটি পয়সা খরচ করারও ক্ষমতা নাই?"

খলিফা বলিলেন, হাঁ, এর চাইতে দোযখের হাতকড়া পরিধান করা অবশ্য আমার জন্য আরও সহজ।

খেলাফতের জিম্মাদারী গ্রহণ করার পর হযরত ওমর দুনিয়ার সকল আরাম আয়েশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার-পরিজন হইতেও দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। সারাদিন রাষ্ট্র পরিচালনার কার্য করিয়া রাতভর মসজিদে বসিয়া আল্লাহর এবাদত করিতেন। মসজিদেই একটু চক্ষু মুদিয়া বিশ্রাম করিতেন। স্ত্রী ফাতেমা স্বামীর এই কৃচ্ছ্রসাধনায় অতীব মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন খলিফাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি জওয়াব দিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের অধিকার সম্পর্কে অনেকবার ভাবিয়া দেখিয়াছি। আরও ভাবিয়া দেখিয়াছি, এই জাতির ছোট-বড়, সবল-দুর্বল সকলের দায়িত্বও আমার স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। আমার রাজ্যের যত এতীম, বিধবা, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও অক্ষম লোক রহিয়াছে, তাহাদের দায়িত্বও আমার উপর ন্যস্ত। আগামীকাল আল্লাহ যখন আমাকে এই দায়িত্ব

সম্পর্কে প্রশ্ন করিবেন, আল্লাহর রসূল যখন তাঁহার উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে দায়ী করিবেন, তখন আমি আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের সম্মুখে যদি ঠিকমত জবাবদিহি করিতে না পারি, তখন আমার কি উপায় হইবে? যখন এই সব কথা ভাবি, তখন আমার শরীর ভাঙ্গিয়া আসে; সকল শক্তি যেন বিলীন হইয়া যায়। চক্ষু ফাটিয়া যেন অশ্রু গড়াইয়া আসে।"

ইসলামের এই মহান খলিফা রাতের পর রাত জাগিয়া শেষ বিচারের জওয়াবদিহির কথা ভাবিতেন। কখনও কখনও দারুণ মনোবেদনায় অশ্রু বর্ষণ করিতেন, সংজ্ঞাহীন হইয়া বিছানায় গড়াইয়া পড়িতেন। স্ত্রী ফাতেমা এই সব দুঃখ-রজনীর সঙ্গিনী হইয়া স্বামীকে সান্ত্বনা দিতেন, কিন্তু কিছুতেই খলিফার অন্তরে শান্তি আসিত না। এই অবস্থাতেই দীর্ঘ আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল।

১০১ হিজরী, রজব মাস। উমাইয়া বংশের প্রতিহিংসাপরায়ণ একদল লোক খলিফার এক গোলামকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া তাঁহাকে পানীয় জলের সহিত বিষ পান করাইল। দারুণ বিষের ক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বেই খলিফা এই কথা জানিয়া ফেলিলেন। গোলামকে কাছে ডাকিয়া তাহার নিকট হইতে উৎকোচের এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আদায় করতঃ বায়তুল মালে জমা করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিতেছি।"

চিকিৎসকগণ খলিফার বিষক্রিয়া বন্ধ করার জন্য যত্ন করিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি সকলকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "আমি আর এক মুহূর্তও দায়িত্বভার আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহি না। আমার পার্শ্বেও যদি রোগের ঔষধ থাকিত, তবুও তাহা আমি হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিতাম না।"

খলিফা সোলায়মান শেষ অসিয়তনামায় ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-এর পর ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালেককে খলিফা নিযুক্ত করার সুপারিশ করিয়াছিলেন; শেষ যাত্রার সময় তিনি তাঁহার পরবর্তী খলিফা ইয়াযিদের উদ্দেশে অসিয়তনামা লিখিয়াছিলেন ঃ

"এখন আমি আখেরাতের পথে যাত্রা করিতেছি। সেখানে আল্লাহ্ আমাকে প্রশ্ন করিবেন, হিসাব গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নিকট কোন কিছু গোপন করার ক্ষমতা আমার নাই। ইহার পর যদি তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তবে আমি কৃতকার্য হইলাম। আর যদি সন্তুষ্ট না হন, তবে ধিক আমার কর্মজীবনের উপর! আমার পর তুমি আল্লাহকে ভয় করিও। প্রজাসাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। আমার পর তুমিও বেশী দিন জীবিত থাকিবে না। এমন যেন না হয় যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি আত্মচেতনা হারাইয়া নিজের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতে থাকিবে। পরে কিন্তু প্রতিকারের সময়ও আর খুঁজিয়া পাইবে না।"

কোন কোন হিতাকাঙ্ক্ষী এইরূপ বলিতে লাগিলেন, এই শেষ মুহূর্তে হইলেও

পরিবার-পরিজনের জন্য কোন সুব্যবস্থা করিয়া যান। এই কথা শুনিয়া উত্তেজনায় খলিফা উঠিয়া বসিতে চাহিলেন। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থাতেই তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ

"আল্লাহর শপথ, আমি আমার পরিবার-পরিজনের কোন অধিকার বিনষ্ট করি নাই; হ্যাঁ, অন্যের হক মারিয়া তাহাদিগকে দেই নাই। এমতাবস্থায় আমার এবং আমার সন্তানদের অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ। আমি তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার হস্তেই অর্পণ করিয়া যাইতে চাই। আল্লাহকে যদি তাহারা ভয় করে, তবে আল্লাহও তাহাদের কোন না কোন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আর যদি আমার পর উহারা পাপে লিপ্ত হয়, তবে আমি ধন-সম্পদ দিয়া উহাদের পাপের হস্ত আরও দৃঢ় করিয়া যাইতে চাই না।"

অতঃপর সন্তানদিগকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রিয় বৎসগণ, দুইটি পথই তোমাদের পিতার ক্ষমতার মধ্যে ছিল। একটি হইতেছে, তোমরা সম্পদশালী হইতে এবং তোমার পিতা দোযখের আগুনে জ্বলিতেন। অন্যটি হইতেছে, আজ তোমরা নিঃস্ব রহিয়া গেলে আর তোমাদের পিতা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিলেন। আমি শেষের বিষয়টিই অবলম্বন করিয়াছি। এখন তোমাদিগকে কেবলমাত্র আল্লাহরই হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি।"

এক ব্যক্তি নিবেদন করিল, মদীনার রওজা মোবারকের সন্নিকটস্থ খালি জায়গায় আপনাকে দাফন করার ব্যবস্থা করিব কি? খলিফা জওয়াব দিলেন, আল্লাহর শপথ, আমি যে কোন আযাব সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমার এই নগণ্য দেহ আল্লাহর রসূলের (সা.) পবিত্র দেহের সহিত সমাহিত হোক, এই ধৃষ্টতা আমি কিছুতেই বরদশাত করিতে পারিব না।

অতঃপর জনৈক খৃষ্টানকে ডাকাইয়া সমাধির জন্য তাহার এক টুকরা ভূমি ক্রয় করার প্রস্তাব করিলেন। খৃষ্টান প্রজা নিবেদন করিল, "আপনার পবিত্র দেহ আমার ভূমিতে সমাধিস্থ হইবে, ইহার চাইতে গৌরবের বিষয় আমার আর কি হইতে পারে? আমি এই গৌরবের পরিবর্তে মূল্য গ্রহণ করিতে চাই না।"

সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টানের ভূমির মূল্য পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর এই মর্মে শেষ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন, আমার কাফনের সঙ্গে যেন রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নখ এবং দাড়ি মোবারকের এক টুকরা কেশ দিয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই ডাক আসিল ঃ

"ইহা শেষ মন্‌যিল, যাহারা প্রাধান্য এবং বিপর্যয় চাহেন না, তাহাদের জন্য এই মন্‌যিল। শুভ পরিণাম একমাত্র খোদাভীরুদের জন্যই।" কোরআনের এই আয়াত পাঠ করিতে করিতে মহান খলিফার যবান চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল।

সমাপ্ত